ডিরেক্টর মহোদয় কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত

গল্প-সঞ্চয়

পরিচয়-পত্র লিখিয়াছেন

রবীন্দ্রনাথ

—:০:—

সম্পাদক

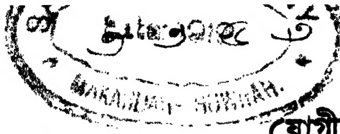
যোগীন্দ্রনাথ সরকার



সিটি বুক সোসাইটি

৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

তৃতীয় সংস্করণ] [৩৸০ আনা



যোগীন্দ্র বাবুর

বনেজঙ্গলে

লোমহর্ষণ শিকার-কাহিনী

সপ্তম সংস্করণ—৩৫০ আনা

:পরিশোধিত ও পরিবর্ধিত

পঞ্চম সংস্করণ

মূল্য ৪৲

জানোয়ারের কাণ্ড

পড়্‌তে পড়্‌তে

অবাক্ হবেন—চম্‌কে উঠ্‌বেন

৪র্থ সংস্করণ—মূল্য ১৸৵০ আনা।

ছোটদের

চিড়িয়াখানা

আলীপুরের

চিড়িয়াখানা লাগে কোথায়

৫ম সংস্করণ—মূল্য ১৸৵০ আনা

মুদ্রাকর—শ্রীপঞ্চানন দাস
সত্যনারায়ণ প্রেস
২৮।৪এ, বিডন রো, কলিকাতা

প্রকাশক :—শ্রীশমীন্দ্রনাথ সরকার,
সিটি বুক সোসাইটি
৬৪নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

ছেলেদের যেমন চাই দুধভাত, তেমনি চাই গল্প। যে মা মাসিরা তাদের খাইয়ে দাইয়ে মানুষ করেছে, এতকাল তারাই তাদের মিষ্টি গলায় গল্প শুনিয়ে এসেছে। ছেলেদের সেই সত্যযুগ গত হয়ে এসে ঠেকেছে কলিযুগে — আজকের দিনের মা মাসিরা গেছেন গল্প ভুলে — কিন্তু ছেলেরা তাদের ফরমাস ভোলে নি। ছেলেরা আজও চাচ্ছে, গল্প বলো। কিন্তু তাদের ঘরের মত সংস্থান নেই। এই গল্পের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্যে যাঁরা কোমর বেঁধেছেন, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য যোগীন্দ্রনাথ। তিনি নিজের সম্বল থেকেও কিছু দিয়েছেন, ভিক্ষে করেও কিছু সংগ্রহ করেছেন। ছেলেরা যে আশীর্বাদ করতে জানে না, সেই আশীর্বাদ করবার ভার নিলেন তাদের বন্ধু রবীন্দ্রনাথ।

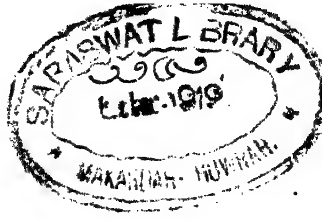
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪ সেপ্টেম্বর
১৯৩১

এই পুস্তক-প্রণয়নে যাঁহারা যে কোন ভাবে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

কলিকাতা
আশ্বিন ১৩৪৩

সম্পাদক



গল্প-সঞ্চয়

—: * :: * :—

ছিনাথ বউরূপী

সে দিনটা আমার খুব মনে পড়ে। সারাদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইয়াও শেষ হয় নাই। শ্রাবণের সমস্ত আকাশটা ঘন মেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে এবং সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই চারিদিক্ গাঢ় অন্ধকারে ছাইয়া গিয়াছে। সকাল সকাল খাইয়া লইয়া আমরা কয় ভাই নিত্যপ্রথামত বাহিরে বৈঠকখানায় ঢালা-বিছানার উপর রেড়ির তেলের সেজ জ্বালাইয়া বই খুলিয়া বসিয়া গিয়াছি। বাহিরের বারান্দার একদিকে পিসেমশায় ক্যাম্বিশের খাটের উপর শুইয়া তাঁহার সান্ধ্য তন্দ্রাটুকু উপভোগ করিতেছেন এবং অন্য দিকে বসিয়া বৃদ্ধ রামকমল ভট্চায আফিং খাইয়া অন্ধকারে চোখ বুজিয়া থেলো হুঁকায় ধুমপান করিতেছেন। দেউড়িতে হিন্দুস্থানী পেয়াদাদের তুলসীদাস সুর শুনা যাইতেছে এবং ভিতরে আমরা তিন ভাই মেজ'দার কঠোর তত্ত্বাবধানে নিঃশব্দে বিদ্যাভ্যাস করিতেছি। ছোড়দা', যতীনদা' ও আমি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি এবং গম্ভীর-প্রকৃতি মেজদা' বার দুই এন্ট্রান্স ফেল্ করিবার পর গভীর মনোযোগের সহিত তৃতীয় বারের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। তাঁহার প্রচণ্ড শাসনে এক মুহূর্ত্ত কাহারও সময় নষ্ট করিবার জো ছিল না। আমাদের পড়ার সময় ছিল ৭॥০টা হইতে ৯টা। এই সময়টুকুর মধ্যে কথাবার্ত্তা কহিয়া মেজদা'র 'পাশের' পড়ার বিঘ্ন না করি, এই জন্য তিনি নিজে প্রত্যহ পড়িতে বসিয়াই কাঁচি দিয়া কাগজ কাটিয়া ২০।৩০ খানি টিকিটের মত করিতেন। তাহার কোনটাতে লেখা থাকিত 'বাইরে', কোনটাতে

'থুথুফেলা', কোনটাতে 'নাকঝাড়া', কোনটাতে 'তেষ্টা পাওয়া' ইত্যাদি। যতীনদা' একটা 'নাকঝাড়া' টিকিট লইয়া মেজদা'র সুমুখে ধরিয়া দিলেন। মেজদা' তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া দিলেন—"হুঁ—৮টা তেত্রিশ মিনিট হইতে ৮টা সাড়ে চৌত্রিশ মিনিট পর্য্যন্ত" অর্থাৎ, এই সময়টুকুর জন্য সে নাক ঝাড়িতে যাইতে পারে। ছুটি পাইয়া যতীনদা' টিকিট হাতে উঠিয়া যাইতেই ছোড়দা' 'থুথুফেলা' টিকিট পেশ করিলেন। মেজদা' 'না' লিখিয়া দিলেন। কাজেই, ছোড়দা' মুখ ভারি করিয়া মিনিট দুই বসিয়া থাকিয়া 'তেষ্টা পাওয়া' আর্জ্জি দাখিল করিয়া দিলেন। এবার মঞ্জুর হইল। মেজদা' সই করিয়া লিখিলেন,—"হুঁ—৮টা ৪১ মিনিট হইতে ৮টা ৪৭ মিনিট পর্য্যন্ত।" পরওয়ানা লইয়া ছোড়দা' হাসিমুখে বাহির হইতেই যতীনদা' ফিরিয়া আসিয়া হাতের টিকিট দাখিল করিলেন। মেজদা' ঘড়ি দেখিয়া সময় মিলাইয়া একটা খাতা বাহির করিয়া সেই টিকিট গঁদ দিয়া আঁটিয়া রাখিলেন। সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম তাঁহার হাতের কাছে মজুদ থাকিত। সপ্তাহ পরে এই সব টিকিটের সময় ধরিয়া কৈফিয়ৎ তলব করা হইত।

এইরূপে মেজদা'র অত্যন্ত সতর্কতায় এবং সুশৃঙ্খলায় আমাদের এবং তাঁহার নিজের কাহারও এতটুকুও সময় নষ্ট হইতে পাইত না। প্রত্যহ এই দেড় ঘণ্টাকাল অতিশয় বিদ্যাভ্যাস করিয়া রাত্রি নয়টার সময় আমরা যখন বাড়ীর ভিতরে শুইতে আসিতাম, তখন মা-সরস্বতী নিশ্চয়ই ঘরের চৌকাঠ পর্য্যন্ত আমাদিগকে আগাইয়া দিয়া যাইতেন এবং পরদিন ইস্কুলে ক্লাসের মধ্যে যে সকল সম্মান-সৌভাগ্য লাভ করিয়া ঘরে ফিরিতাম, সে ত আপনারা বুঝিতেই পারিতেছেন। কিন্তু মেজদা'র দুর্ভাগ্য, তাঁহার নির্ব্বোধ পরীক্ষকগুলা তাঁহাকে কোনদিন চিনিতেই পারিল না। নিজের এবং পরের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি এরূপ প্রবল অনুরাগ, সময়ের মূল্য সম্বন্ধে এমন সূক্ষ্ম দায়িত্ববোধ থাকা সত্ত্বেও, তাঁহাকে বারংবার 'ফেল্' করিয়াই দিতে লাগিল। ইহাই অদৃষ্টের অন্ধ বিচার! যাক্—এখন আর সে দুঃখ জানিয়া কি হইবে!

সে রাত্রেও ঘরের বাহিরে ঐ জমাট অন্ধকার এবং বারান্দায় তন্দ্রাভিভূত সেই দুটো বুড়ো। ভিতরে মৃদু দীপালোকের সম্মুখে গভীর অধ্যয়ন-রত আমরা চারিটি প্রাণী।

ছোড়দা' ফিরিয়া আসায় তৃষ্ণায় আমার বুক একেবারে ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কাজেই, টিকিট পেশ করিয়া উন্মুখ হইয়া রহিলাম। মেজদা' তাঁহার সেই টিকিট-আঁটা খাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, তৃষ্ণা-পাওয়াটা আমার আইন-সঙ্গত, কি না, অর্থাৎ কাল-পরশু কি পরিমাণে জল খাইয়াছিলাম।

অকস্মাৎ আমার ঠিক পিঠের কাছে একটা 'হুম্' শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে ছোড়দা' ও যতীনদা'র সমবেত আর্ত্তকণ্ঠের গগনভেদী রৈ রৈ চীৎকার—"ওরে বাবা রে; খেয়ে ফেল্লে রে!" কিসে ইহাদিগকে খাইয়া ফেলিল, আমি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিবার পূর্ব্বেই, মেজদা' মুখ তুলিয়া একটা বিকট শব্দ করিয়া বিদ্যুদ্বেগে তাঁহার দুই পা



কাজেই, ছোড়দা'......'তেষ্টা পাওয়া' আর্জ্জি দাখিল করিয়া দিলেন।

সম্মুখে ছড়াইয়া দিয়া সেজ উল্টাইয়া দিলেন। তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে যেন দক্ষযজ্ঞ বাধিয়া গেল। মেজদা'র ছিল ফিটের ব্যামো; তিনি সেই যে 'আঁ আঁ' করিয়া প্রদীপ উল্টাইয়া চিৎ হইয়া পড়িলেন, আর খাড়া হইলেন না।

ঠেলাঠেলি করিয়া বাহির হইতেই দেখি, পিশেমশাই তার দুই ছেলেকে দুই বগলে চাপিয়া ধরিয়া তাহাদের অপেক্ষাও তেজে চেঁচাইয়া বাড়ী ফাটাইয়া

ফেলিতেছেন। এ যেন তিন বাপ-ব্যাটার কে কতখানি হ্যাঁ করিতে পারে, তারই লড়াই চলিতেছে।

এই সুযোগে একটা চোর না কি ছুটিয়া পলাইতেছিল, দেউড়ির সিপাহীরা তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে। পিসেমশাই প্রচণ্ড চীৎকারে হুকুম দিতেছেন,—"আউর মারো—শালাকো মার ডালো"—ইত্যাদি।

মুহূর্ত্তকালমধ্যে আলোয়, চাকর-বাকরে ও পাশের লোকজনে উঠান পরিপূর্ণ হইয়া গেল। দরওয়ানরা চাকরকে মারিতে মারিতে আধমরা করিয়া টানিয়া আলোর সম্মুখে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল। তখন চোরের মুখ দেখিয়া বাড়ীশুদ্ধ লোকের মুখ শুকাইয়া গেল! আরে, এ যে ভট্টাচায্যি মশাই।

তখন কেহ বা জল, কেহ বা পাখার বাতাস, কেহ বা তাঁহার চোখে মুখে হাত বুলাইয়া দেয়। ওদিকে ঘরের ভিতরে মেজদাকে লইয়া সেই ব্যাপার! পাখার বাতাস ও জলের ঝাপ্‌টা খাইয়া রামকমল প্রকৃতিস্থ হইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সবাই প্রশ্ন করিতে লাগিল, "আপনি অমন ক'রে ছুট্‌লেন কেন?" ভট্‌চায্যি মশাই কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "বাবা, বাঘ নয়, সে একটা মস্ত ভালুক--লাফ মেরে বৈটকখানা থেকে বেরিয়ে এলো।"

ছোড়'দা ও যতীনদা' বারংবার কহিতে লাগিল, "ভালুক নয় বাবা একটা নেক্‌ড়ে বাঘ। হুম্ করে ল্যাজ গুটিয়ে পা-পোষের উপর বসেছিল।"

মেজদা'র চৈতন্য হইলে তিনি নিমীলিত চক্ষে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সংক্ষেপে কহিলেন, "দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার।"

কিন্তু কোথা সে! মেজদা'র দি রয়েল বেঙ্গল'ই হৌক আর রামকমলের 'মস্ত ভালুকই' হৌক, সে আসিলই বা কিরূপে, গেলই বা কোথায়? এতগুলো লোক যখন দেখিয়াছে, তখন সে একটা কিছু বটেই!

তখন কেহ বা বিশ্বাস করিল, কেহ বা করিল না। কিন্তু সবাই লণ্ঠন লইয়া ভয়চকিতনেত্রে চারিদিকে খুঁজিতে লাগিল।

অকস্মাৎ পালোয়ান কিশোরী সিং 'উহ বয়ঠা' বলিয়াই একলাফে একেবারে বারান্দার উপর। তার পর সেও এক ঠেলাঠেলি কাণ্ড। এতগুলা লোক, সবাই একসঙ্গে বারান্দায় উঠিতে চায়, কাহারো মুহূর্ত্ত বিলম্ব সয় না। উঠানের এক প্রান্তে একটা ডালিম গাছ ছিল। দেখা গেল, তারই ঝোপের মধ্যে বসিয়া একটা বৃহৎ জানোয়ার। বাঘের মতই বটে। চক্ষের পলকে বারান্দা খালি হইয়া বৈঠকখানা ভরিয়া গেল—জনপ্রাণী আর সেখানে নাই। সেই ঘরের ভিড়ের মধ্য হইতে

পিশেমহাশয়ের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর আসিতে লাগিল—"সড়্কি লাও—বন্দুক লাও—" আমাদের পাশের বাড়ীর গগনবাবুদের একটা মুঙ্গেরীগাদা বন্দুক ছিল। লক্ষ্য সেই অস্ত্রটার উপর। 'লাও' ত বটে, কিন্তু আনে কে? ডালিমগাছটা যে দরজার কাছেই এবং তাহারই মধ্যে যে বাঘ বসিয়া। হিন্দুস্থানীরা সাড়া দেয় না, তামাসা দেখিতে যাহারা বাড়ী ঢুকিয়াছিল, তাহারাও নিস্তব্ধ।

এমনি বিপদের সময়ে হঠাৎ কোথা হইতে ইন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। সে বোধ করি, সুমুখের রাস্তা দিয়া চলিয়াছিল, হাঙ্গামা শুনিয়া বাড়ী ঢুকিয়াছে। নিমেষে শতকণ্ঠ চীৎকার করিয়া উঠিল—"ওরে বাঘ! বাঘ! পালিয়ে আয় রে ছোঁড়া, পালিয়ে আয়।"

প্রথমটা সে থতমত খাইয়া ছুটিয়া আসিয়া ভিতরে ঢুকিল। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই ব্যাপারটা শুনিয়া লইয়া একা নির্ভয়ে উঠানে নামিয়া গিয়া লণ্ঠন তুলিয়া বাঘ দেখিতে লাগিল।

দোতলার জানালা হইতে মেয়েরা রুদ্ধনিশ্বাসে এই ডাকাত ছেলেটার পানে চাহিয়া দুর্গানাম জপিতে লাগিল। পিসীমা ত ভয়ে কাঁদিয়াই ফেলিলেন! নীচে ভিড়ের মধ্যে গাদাগাদি দাঁড়াইয়া হিন্দুস্থানী সিপাহীরা তাহাকে সাহস দিতে লাগিল এবং এক একটা অস্ত্র পাইলেই নামিয়া আসে, এমন আভাসও দিল।

বেশ করিয়া দেখিয়া ইন্দ্র কহিল, "দ্বারিকবাবু এ বাঘ নয়, বোধ হয়।" তাহার কথাটা শেষ হইতে না হইতেই 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' দুই থাবা জোড় করিয়া মানুষের গলায় কাঁদিয়া উঠিল! পরিষ্কার বাঙ্গালা করিয়া বলিল, "না, বাবু মশাই, না! আমি বাঘ ভালুক নই—ছিনাথ বউরূপী।" ইন্দ্র হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ভটচায্যিমশাই খড়ম হাতে সর্ব্বাগ্রে ছুটিয়া আসিলেন,—"হারামজাদা! তুমি ভয় দেখাবার জায়গা পাও না!

পিসেমশাই মহাক্রোধে হুকুম দিলেন, "শালাকো কান পাকাড়কে লাও!"

কিশোরী সিং তাহাকে সর্ব্বাগ্রে দেখিয়াছিল, সুতরাং তাহারই দাবী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া সে-ই গিয়া তাহার কান ধরিয়া হিড়্‌হিড়্ করিয়া টানিয়া আনিল। ভট্‌চায্যিমশায় তাহার পিঠের উপর খড়মের এক ঘা বসাইয়া দিয়া রাগের মাথায় হিন্দী বলিতে লাগিলেন,—"এই হারামজাদা বজ্জাতকে বাস্তে আমার গতর চূর্ণ হো গিয়া। খোট্টা শালার ব্যাটারা আমাকে যেন কিলায়কে কাঁটাল পাকায় দিয়া—"

ছিনাথের বাড়ী বারাসতে। সে প্রতি বৎসর এই সময়টায় একবার করিয়া

রোজগার করিতে আসে। কালও এ বাড়ীতে সে নারদ সাজিয়া গান শুনাইয়া গিয়াছিল।

সে একবার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের, একবার পিসেমশায়ের পায়ে পড়িতে লাগিল। কহিল, ছেলেরা অমন করিয়া ভয় পাইয়া প্রদীপ উল্টাইয়া মহামারীকাণ্ড বাধাইয়া তোলায় সে নিজেও ভয় পাইয়া গাছের আড়ালে গিয়া লুকাইয়াছিল। ভাবিয়াছিল, একটু ঠাণ্ডা হইলেই বাহির হইয়া তাহার সাজ দেখাইয়া যাইবে। কিন্তু ব্যাপার উত্তরোত্তর এমন হইয়া উঠিল যে, তাহার আর সাহসে কুলাইল না।

ছিনাথ কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল; কিন্তু পিসেমশায়ের আর রাগ পড়ে না। পিসীমা নিজে উপর হইতে কহিলেন,—"তোমাদের ভাগ্যি ভাল যে, সত্যিকারের বাঘ-ভালুক বার হয় নি। যে বীরপুরুষ তোমরা আর তোমার দরওয়ানরা। ছেড়ে দাও বেচারীকে, আর দূর করে দাও দেউড়ির ঐ খোট্টাগুলোকে। একটা ছোট ছেলের যে সাহস, একবাড়ী লোকের তা নেই।" পিসেমশাই কোন কথাই শুনিলেন না, বরং পিসীমার এই অভিযোগে চোখ পাকাইয়া এমন একটা ভাব ধারণ করিলেন, যে, ইচ্ছা করিলেই তিনি এ সকল কথার যথেষ্ট সদুত্তর দিতে পারেন। কিন্তু স্ত্রীলোকের কথার উত্তর দিতে যাওয়াই পুরুষ-মানুষের পক্ষে অপমানকর। তাই, আরও গরম হইয়া হুকুম দিলেন, "উহার ল্যাজ কাটিয়া দাও।" তখন তাহার সেই রঙিন-কাপড়-জড়ান সুদীর্ঘ খড়ের ল্যাজ কাটিয়া লইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল। পিসীমা উপর হইতে রাগ করিয়া বলিলেন, "রেখে দাও; তোমার ওটা অনেক কাজে লাগ্‌বে।"

ভগবানের টাক্‌শাল

এক গরীব ব্রাহ্মণ ছিল। সে তাহার নিজ গ্রামের এক শিব-মন্দিরে পূজারি ব্রাহ্মণের কাজ করিত। ইহাতে সে দৈনিক যে কয়টি ভিজা আলো চাল পাইত, তাহাতেই কোন প্রকারে তাহার দিন চলিয়া যাইত। ব্রাহ্মণের একটি অতি 'ভালমানুষ' ব্রাহ্মণী ছিল। সে স্বামীর এত কষ্টের সংসারেও সর্ব্বদা হাসিমুখে দিন কাটাইত। ব্রাহ্মণ যখন শিব-পূজায় বাহির হইত, সেই সময় ব্রাহ্মণী সংসারের কতকগুলি কাজ সারিয়া পাড়ার পাঁচজনের গোয়াল হইতে গোবর কুড়াইয়া আনিত; তার পর, ব্রাহ্মণ পূজা হইতে ফিরিয়া আসিলে, স্বামীকে ভোজন করাইয়া, সেই গোবরের ঝুড়ি লইয়া তাহার কুঁড়ে ঘরের দেওয়ালের চারিদিকে ঘুঁটে দিত। শেষে অনেক বেলায় নিজে দু'টি খাইতে বসিত।

ব্রাহ্মণ এত গরীব হইয়াও কখনও অর্থের জন্য আক্ষেপ করিত না। সে বলিত, "দিন ত এক রকমে কেটে যাচ্ছে, তবে আমার টাকার কি দরকার? আমি বেশ মনের সুখে আছি!" গ্রামের সকলে ব্রাহ্মণকে শিরোমণি-ঠাকুর বলিয়া ডাকিত। আর তাহার স্ত্রীকে শিরোমণি-বউ বলিত। ব্রাহ্মণ যে যথার্থই কোন টোলে অথবা সংস্কৃত কলেজে পড়িয়া এই উপাধি লাভ করিয়াছিল, তাহা নহে; বোধ হয়, ব্রাহ্মণের বংশের কোন ব্যক্তির অদৃষ্টে এই উপাধি লাভ ঘটিয়াছিল, তাই উহারা শিরোমণি-বংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ; এবং পর্য্যায়ক্রমে সকলে বিনা আপত্তিতে উহা ভোগ করিয়া আসিতেছিল!

আহারাদির পর শিরোমণি-ঠাকুর বেশ অনেকক্ষণ ঘুমাইত! তারপর, বৈকালে চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় একটি ছোট মাদুর বিছাইয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণের যেখানে রামের অশ্বমেধ-যজ্ঞের বৃত্তান্তটা লিখিত আছে, সেই খানটা সুর করিয়া পড়িত। সেই সময় তাহার কিছুদূরে বসিয়া রামা চাষা, দামু গোয়ালা, পরাণে তাঁতি প্রভৃতি কতকগুলি নিরক্ষর নিরীহ ধর্ম্মভীরু প্রতিবাসী তদ্গতচিত্তে উহা শুনিত; এবং শিরোমণি-ঠাকুর যখন উহার ব্যাখ্যা করিবার সময় বলিত যে, আজকাল আর সে রাম-রাজত্বও নাই, আর সে যজ্ঞের ঘটা এবং ভূরিভোজনের ব্যাপারটাও একেবারে উঠিয়া গিয়াছে, এখন ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা কেহই রাখে না, সকলেই অনাচারী—অপব্যয়ী; তখন সেই শ্রোতৃ-মণ্ডলী সমস্বরে বলিত, "ঠাকুর, ঠিক ব'লেছ। এখন সব ব্যাটাই অনাহারী— সকলেই অল্প-আয়ী।"

সন্ধ্যার পর শিরোমণি-ঠাকুর পুনরায় শিব-মন্দিরে ঠাকুরের শীতল আরাত দিতে যাইত এবং আসিবার কালে একঘটি দুধ ও খানকতক বাতাসা লইয়া ঘরে ফিরিত।

ঘটনাক্রমে একদিন সকালে যখন শিরোমণি-ঠাকুর শিবের পূজা করিতে বসিয়াছে, সেই সময় শিবের স্ত্রী দুর্গাদেবী সেই মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন! শিরোমণি ঠাকুর যতক্ষণ পূজা করিতে লাগিল, দুর্গা ততক্ষণ মন্দিরের একধারে বসিয়া তাহা দেখিতে লাগিলেন। তার পর পূজা শেষ করিয়া ব্রাহ্মণ নিয়মিত মন্দিরের দরজায় শিকল দিয়া প্রস্থান করিল।

পূজারি চলিয়া গেলে, দুর্গা শিবকে বলিলেন, "ঠাকুর, লোকে তোমার 'শিব' নাম রেখে বড়ই অন্যায় ক'রেছে। শিব অর্থে শুভ; কিন্তু তুমি তোমার নামের মাহাত্ম্য কিছুই রাখ্‌ছো না!"

শিব বলিলেন, "দুর্গা, আজ তুমি এমন কথা ব'ল্‌ছ কেন? আমি এমন কি কাজ ক'রেছি, যাতে আমার এই সাধের 'শিব' নামের মাহাত্ম্য নষ্ট হয়েছে?"

দুর্গা। ঠাকুর, তার দৃষ্টান্তের অভাব কি? এই দেখ, তোমার এই পূজারি ব্রাহ্মণ প্রত্যহ দু'টি বেলা ভক্তিভরে তোমার পূজা-অর্চ্চনা যথানিয়মে ক'রে আসছে, অথচ ওর মত গরীব বুঝি আর দুটি নেই! যে তোমার এমন ভক্ত, সে যদি দুবেলা পেট ভ'রে খেতে না পেলে, তবে তোমাকে কোন হিসাবে 'শিব' 'শিব' ব'লে ডাক্‌বে?

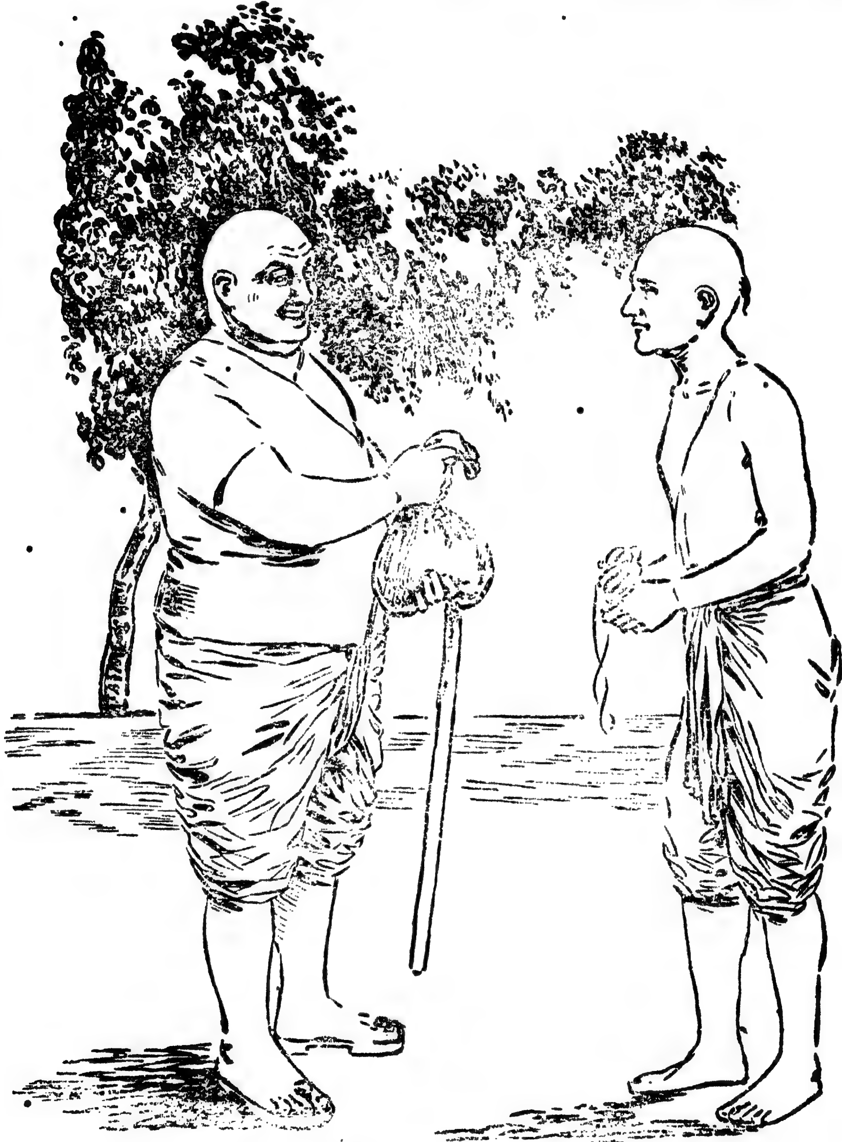
শিব। দেবি, এইজন্যে আমার 'শিব' নামে তুমি কলঙ্ক দিচ্ছ! কিন্তু দেখ এতে আমার কোন দোষ নেই। ব্রাহ্মণের অদৃষ্টে এতদিন দুঃখের ভোগ ছিল, কাজেই ওকে ভিজে আলো চাল খেয়ে দিন কাটাতে হ'য়েছে; এখন ওর অদৃষ্ট, সুপ্রসন্ন, সুতরাং আর ওকে কষ্টে সংসার চালাতে হবে না।

ইহা শুনিয়া দুর্গা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বটে! ভাগ্যিস্, আজ আমি এই সময় এখানে এসে পড়েছিলাম তাই ত বামুনের বরাৎটা ফিরে গেল! তা যা হোক্, তুমি আর দেরী ক'র্‌তে পাবে না, কালই ওকে কিছু পাইয়ে দাও।"

শিব বলিলেন, "আচ্ছা, তাই হবে। কালই ব্রাহ্মণকে সাত হাজার টাকা দেওয়াবো।"

মন্দিরের মধ্যে শিব-দুর্গার যখন এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, সেই সময় এক ব্যক্তি বিশ্রাম করিবার জন্য মন্দিরের রোয়াকে আসিয়া বসিয়াছিল! সে একে একে শিব-দুর্গার সমস্ত কথাগুলি শুনিল। লোকটা শিরোমণি-ঠাকুরকে বেশ চিনিত। পূজারি ব্রাহ্মণের অদৃষ্টে একেবারে এতগুলি টাকা জমা রহিয়াছে শুনিয়া, সে হিংসায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ শিরোমণির বাড়ীর দিকে ছুটিল।

এ ব্যক্তি একজন বিখ্যাত সুদখোর মহাজন, নাম গগন দাস। গগন শিরোমণি-ঠাকুরের বাড়ী গিয়া দেখিল, ব্রাহ্মণ পুইগাছের মাচা বাঁধিতেছে। গগন ব্রাহ্মণকে



"ঠাকুর আমি তোমাকে আজ এই তিন হাজার টাকা দিচ্ছি"—১৮ পৃষ্ঠা।

ডাকিল। শিরোমণি-ঠাকুর মহাজন গগনকে তাহার কুঁড়ে ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। সে জড়িতস্বরে বলিল, "বড়বাবু কি কিছু পুঁইয়ের ডাটার আবশ্যক হ'য়েছে? তা নেন না—কতটা চাই?"

গগন হাসিয়া বলিল, "না শিরোমণি-ঠাকুর, পুঁইশাকে দরকার নেই। আপনাকে আজ একটা কথা ব'লতে এসেছি।"

শিরোমণি। তা বলুন না, কথাটা বলে ফেলুন। কিছু পেসাদ চাই কি ?

গগন। হাঁ, অনেকটা তাই বটে! কিন্তু সেটা এখানে বলতে পারবো না। আপনাকে একবার চণ্ডীমণ্ডপে আসতে হবে।

শিরোমণি-ঠাকুর তৎক্ষণাৎ গগনের সহিত চণ্ডীমণ্ডপে গমন করিল। তখন গগন বলিল, "ঠাকুর, আমি তোমাকে আজ এই তিন হাজার টাকা দিচ্ছি, তার বদলে কাল সমস্ত দিনরাতের মধ্যে তোমার যা কিছু আয় হবে, তা আমাকে দিতে হবে। কেমন এতে রাজী আছ কিনা, বল ?"

শিরোমণি-ঠাকুর গগনের কথা শুনিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর গগন পুনরায় প্রশ্ন করাতে, ব্রাহ্মণ বলিল, "বলেন কি বড় বাবু! টাকার গরমে কি আপনার মাথাটাও তেতে উঠেছে ? আমায় তিন হাজার টাকা দিয়ে, আমার কালকের সকালের তিন পো আলো চাল এবং রাত্রের আধসের, দুধ, আর খান আষ্টেক বাতাসার বোঝা নিয়ে আপনি কি ক'রবেন ? সে গুলোর যে আট আনাও দাম হবে না। আপনি আজ তামাসা করেন, না কি ?"

গগন গোঁফে তা দিতে দিতে বলিল, "না ঠাকুর, তামাসা নয়। আমি সত্যিই তোমার কাছে এই প্রস্তাব ক'রবার জন্যে, এই দেখ, টাকা পর্য্যন্ত নিয়ে এসেছি। এখন কি বল, রাজী আছ ত ? তা হ'লে এই থলেশুদ্ধ টাকা নেও ; এতে পুরোপুরি তিন হাজার আছে।

শিরোমণি-ঠাকুর দুইবার টিকি টানিয়া, তার পর মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "আমার আর রাজী-গররাজী কি ? এখন আপনার যদি এমন খেয়ালই হ'য়ে থাকে, তা হ'লে থলেটা দিয়ে যান!"

গগন তিন হাজার টাকার থলেটা ব্রাহ্মণের হাতে দিয়া বলিল, "তা হ'লে কাল খুব ভোরেই আমি আসছি ; আমি না এলে তুমি বাড়ী থেকে বেরিও না, বুঝেছ ত ?"

শিরোমণি-ঠাকুর ঘন ঘন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হাঁ, তা খুব বুঝেছি। আপনি যদি আর না আসেন, তা হ'লে এ জন্মে আমি আর মন্দিরমুখো হচ্ছি না। বাবা, বাঁচা গেল—এখন ভুরি-ভোজন লাগিয়ে দেওয়া যাক্ গে!" এই বলিয়া শিরোমণি-ঠাকুর অন্দরমহলে প্রবেশ করিল। গগন দাসও সাত হাজার টাকার কথা ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী ফিরিল।

পরদিন খুব ভোরে দুইজন পাইক সঙ্গে লইয়া গগন শিরোমণি-ঠাকুরের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ তখনও টাকার স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে সুখে নিদ্রা যাইতেছিল। গগনের ডাকাডাকিতে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি চক্ষু মুছিয়া বাহিরে আসিয়া বলিল, "এই যে বড় বাবু এসেছেন! তা তামাক ইচ্ছে করেন কি?"

গগন বলিল, "না না, তামাকের প্রয়োজন নেই, তুমি শীগ্‌গির বেরিয়ে এস।"

শিরোমণি-ঠাকুর নিয়ম-মত নামাবলি, গামছা ও কোশাকুশি লইয়া 'দুর্গা, শ্রীহরি' বলিতে বলিতে বাড়ীর বাহির হইল। তার পর সকলে শিবমন্দিরের দিকে যাত্রা করিল।

মন্দিরে আসিয়া ব্রাহ্মণ শিবপূজা করিতে বসিল, আর গগন ও তাহার পাইক দুইটি দরজার দুই পাশে বসিয়া রহিল। আন্দাজ আধ ঘণ্টা পরে, পূজা শেষ হইলে শিরোমণি-ঠাকুর নৈবেদ্যের থালাখানি আনিয়া গগনের সম্মুখে ধরিল। গগন জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি হবে?"

শিরোমণি-ঠাকুর। আপনার আজ সকালের পাওনা।

গগন। না হে না, আমি ভিজে আলো চাল আর ছোলার জন্যে কাল তোমাকে তিন হাজার টাকা দিই নি। এ তুমি নেও, এর পর যা পাবে, আমার তাই চাই।

শিরোমণি-ঠাকুর। এর পর সেই সন্ধ্যার সময় আধ সের কাঁচা দুধ আর আধ পয়সার বাতাসা!

গগন। সেটাও তোমায় এখন থেকে দিয়ে রাখ্‌লুম। এ ছাড়া আর যা পাবে, আমার তাই চাই।

শিরোমণি। এ ছাড়া অষ্টরম্ভা!

গগন হাসিয়া বলিল, "বেশ, তাই হবে। এখন যতক্ষণ না আমি তোমায় যেতে ব'ল্‌ছি, ততক্ষণ তুমি এখানে বসো।"

শিরোমণি-ঠাকুর বসিল।

তার পর একটু একটু করিয়া সূর্য্য মাথার উপর উঠিল। চতুর্দ্দিক্ রোদে ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। ক্রমে পিপাসায় ব্রাহ্মণের গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া উঠিল। সে আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না; গগনকে বলিল, "বড় বাবু, আমি তবে এখন আসি; এর মধ্যে যদি কিছু এসে পড়ে, তা হ'লে আপনি একটা পাইক পাঠিয়ে আমাকে ডাকিয়ে আন্‌বেন। আমি আর থাক্‌তে পাচ্ছি না, তেষ্টায় প্রাণ ছট্‌ফট্ কচ্ছে।"

এই বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তার পর, যাইবার সময় বলিল, "বড় বাবু, আর কেন রোদে বেগুন-পোড়া হচ্ছেন? আপনিও এখন যান। বরং একটু রোদ প'ড়্‌লে ফের আসা যাবে।"

গগন সে কথায় কান না দিয়া পূর্ব্বের ন্যায় বসিয়াই রহিল। এদিকে বেলা বাড়িতে বাড়িতে সূর্য্য পশ্চিমদিকে ঢলিয়া পড়িল। ক্ষুধায় দেহ অবসন্ন, তৃষ্ণায় বুক ফাটিতেছে, মাথা টল্ টল্ করিতেছে, তথাপি গগনের উঠিবার নাম নাই। শেষে আর



কত টানাটানি ঝাঁকাঝাঁকি—কিছুতেই কিছু হইল না।

সহ্য করিতে না পারিয়া, সে—"ব্যাটা মিথ্যাবাদী দেবতা, তোমায় দেখাচ্ছি, দাঁড়াও!" এই বলিতে বলিতে মন্দিরের ভিতর ঢুকিল এবং পরক্ষণেই পাথরের শিবের মাথায় সজোরে এক চড় মারিল! তার পর আর একটা চড় মারিবার জন্য শিবের মাথা হইতে হাত তুলিতে যাইয়া দেখিল যে, শিবের মাথায় উহা বেশ ভাল রকমে আট্‌কাইয়া গিয়াছে। কত সাধ্য সাধনা, কত অনুনয়-বিনয়, কত টানাটানি ঝাঁকাঝাঁকি—কিছুতেই কিছু হইল না। পাইকেরা পর্য্যন্ত বিস্তর চেষ্টা করিল, কিন্তু কোন মতেই গগনকে

বন্ধন-মুক্ত করিতে পারিল না। অবশেষে হাতের যন্ত্রণায় সে ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মন্দিরের মধ্যে শুইয়া পড়িল। এই অবস্থায় কখন্ যে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই।

গগন নিদ্রা যাইবার সময় স্বপ্ন দেখিল, এক বিকটাকার রাক্ষস-মূর্ত্তি তাহার হাত ধরিয়া রহিয়াছে এবং তাহার পার্শ্বে মাথায় জটা, গায়ে ভস্মমাখা এক যোগী দাঁড়াইয়া আছেন! গগন বেশ বুঝিতে পারিল যে, ঐ রাক্ষস-মূর্ত্তিই শিবের সহচর—নন্দী আর যোগী স্বয়ং শিব। সে স্বপ্নে শিবের কাছে অনেক কান্নাকাটি করিল, কিন্তু শিব তাহার একটা কথাও শুনিলেন না। তিনি বলিলেন, "দেখ্, তোর মত লোভী, স্বার্থপর, হিংসুক মহাজন এ জেলায় আর দুটি নেই! তোর যা ধন-দৌলত আছে তা সাত পুরুষে ফুরোবে না। কিন্তু তবুও তোর লোভের শেষ নেই। কাল দুর্গার সঙ্গে আমার যে কথা হয়েছিল, তাই শুনে তুই তাড়াতাড়ি ব্রাহ্মণকে তিন হাজার টাকা দিয়ে, তার আজ্‌কের প্রাপ্য—সাত হাজার টাকা—আত্মসাৎ ক'রবার পথ ঠিক্ করে রেখে এসেছিস্। তোর প্রতি কাহারও দয়া হয় না। তবে যদি তুই ব্রাহ্মণকে এখনি আর চার হাজার টাকা দিতে পারিস্, তা হ'লে নন্দী তোর হাত ছেড়ে দেবে! নচেৎ আজ রাত্তিরে তোর শরীর থেকে ডান হাতখানা ছিঁড়ে ফেল্‌তে তাকে ব'লে দেব!"

গগন শিবের কথা শুনিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, দোহাই ঠাকুর, আমি এখনই চার হাজার টাকা দিচ্ছি, তুমি আমায় ছেড়ে দাও।"

শিব বলিলেন, "আচ্ছা আজ তোকে ক্ষমা ক'র্‌লাম; কিন্তু ছাড়া পেয়ে যদি ব্রাহ্মণকে ফাঁকি দিস, তা হ'লে তুই তিন দিনের মধ্যে মারা যাবি। আর দেখ, কাল আমি ব্রাহ্মণকে যে সাত হাজার টাকা দেবার কথা বলেছিলাম, সে কি আমি ঘর থেকে এনে দিতাম? মূর্খ, তুই কি ভেবেছিস যে, আমার একটা মস্ত টাঁক্‌শাল আছে, সেইখানে থলে থলে টাকা তয়ের হচ্ছে? ওরে বোকা, তোর মত যারা পরের ধন হরণ ক'রে নিজের ঘরে পুঁজি করে, তারাই আমার এক একটা জীবন্ত টাঁক্‌শাল! দেখ্, লোভের বশে অন্ধ হ'য়ে 'হা টাকা—যো টাকা' ক'রে চারিদিক হাত্‌ড়ে বেড়ালে; এই রকম বিপদে পড়্‌তে হয়। এখন থেকে যাতে গরীবের দুঃখ দূর হয়, লোকে যাতে না খেতে পেয়ে মারা না যায়,—তার পথ কর্‌গে যা।"

গগন তাহাতেই স্বীকৃত হইল। অমনি তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে জাগিয়া উঠিয়া দেখে যে, তাহার হাত সত্য সত্যই শিবের মাথা হইতে খুলিয়া গিয়াছে। সে তখন শিবকে প্রণাম করিয়া একজন পাইককে শিরোমণি-ঠাকুরের বাড়ী পাঠাইয়া দিল। ব্রাহ্মণ আসিলে, গগন তাহাকে নিজের বাটিতে আনিয়া, সাত হাজারের বাকী

চার হাজার টাকা গুণিয়া দিয়া, মন্দিরের সমস্ত কথা বলিল! ব্রাহ্মণ ত অবাক্! কিছুক্ষণ পরে সে ধীরে ধীরে বলিল, "বড়বাবু, তবে তুমি ভগবানের টাঁক্‌শাল! তা হ'লে এখন থেকে যার যা দরকার হ'বে, সকলকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব, কেমন ত ?"

গগন বলিল, "হাঁ, ঠাকুর তাই দিও। আজ থেকে আমার যা কিছু সব পাঁচ-জনের! আমি ভগবানের টাঁকশাল!"

সেইদিন হইতে সুদখোর কৃপণ গগন দাসের নবজীবনের সূত্রপাত হইল! সে প্রত্যহ দীনদরিদ্রকে নিয়মিতরূপে দান না করিয়া জলস্পর্শ করিত না! ক্রমে সে দানবীর গগন দাস নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

—স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী

ডাকাতের হাতে

(১)

আমার দাদামশাই কল্‌কাতার ভবানীপুরে থাকতেন। তিনি ছিলেন হাইকোর্টের উকিল। আমার এক মাসীর বিয়ে হবে, তাই মাকে এবং আমাকে নিয়ে মামা নৌকায় কল্‌কাতা যাচ্ছিলেন। নৌকা যখন সুন্দর বনের নদীর ভিতর দিয়ে চল্‌তে লাগলো, তখন সেখানকার দৃশ্য বড়ই সুন্দর বলে মনে হলো। কিন্তু তা মনে হ'লে কি হবে ? রাত্রি হ'লেই যে, ভয়ে আমাদের বুকে কাঁপুনি ধরে যেত। আমরা দিনের বেলায় দেখ্‌তে পেতুম, বড় বড় কুমীরগুলি নদীর ধারে মাটির উপরে নিশ্চিন্ত মনে পড়ে আছে। তারপরে আমাদের নৌকা যখন কুমীরের কাছে যেত তখনি ঝুপ্‌ঝাপ্ করে কুমীরগুলি লাফিয়ে পড়ে ডুবে যেত, আবার দূরে গিয়েই মাথা উঁচু করে নদীতে ভেসে বেড়াত। এক একটা এমন বড় বড় কাঁক্‌ড়া দেখা যেত যে, একটিবার চিম্‌টি কেটে ধরলে আর রক্ষে থাক্‌ত না। একদিন দেখ্‌লুম, গায়ে চক্কোর চক্কোর প্রকাণ্ড এক সাপ একটি ছোট বাছুরের দুখানি পা জড়িয়ে ধরেছে। মা নৌকার মাঝিদের বল্লেন, "আহা, সুন্দর বাছুরটিকে মেরেই ফেল্‌বে, ও মাঝি, তোমরা নৌকাটা লাগিয়ে, সাপটাকে তাড়িয়ে বাছুরটির প্রাণ রক্ষে কর।"

মাঝিরা বল্লে, "মা, অমন কথা বল্‌বেন না, ডাঙ্গায় নৌকা লাগালেই মানুষের গন্ধ পেয়ে বাঘ এসে তাড়া কর্‌বে, তখন বাছুরের প্রাণ বাঁচাব, না আপনার প্রাণ রক্ষে কর্‌ব ?"

মা বল্লেন, "মিথ্যে কথা, দিনে-দুপুরে এখানে বাঘ এলে ত এই বাছুরের উপরেই এসে পড়্‌ত।"

মাঝিরা বল্লে, "বাঘ এসে পড়্‌তে কতকক্ষণ ? বাঘ নেই বা এল, অমন প্রকাণ্ড সাপের হাতে কি রক্ষে আছে ?"

আর একদিন সন্ধ্যার একটু আগে, নৌকার মাঝিরা নদীর ধারে গাছে সুন্দর বড় বড় সব মৌচাক দেখ্‌তে পেল। তখন মধুর লোভে তাদের আর বাঘের ভয় রইল না। তারা মামাকে বল্লে, "বাবু আপনি আপনার বন্দুকটা নিয়ে নৌকার উপরে দাঁড়িয়ে থাকুন। আমরা শুক্‌নো কাঠ আর পাতা কুড়িয়ে এখনই আগুনের কুণ্ড তৈরী কর্‌ছি। তা হলে বাঘ আগুন দেখে আর এদিকে আসতে সাহস পাবে না, মৌমাছিগুলোও উড়ে যাবে। আমরা দুখানা মৌচাক কেটে নিয়ে আসতে পার্‌ব। কিছু বলা ত যায় না, যদি বা কোন বাঘ আগুনে ভয় না পেয়ে এসে পড়ে, তা হলে আপনি গুলি কর্‌বেন।"

নদীর ধারেই গাছের বিস্তর শুক্‌নো ডাল ও পাতা পড়ে ছিল। মাঝিরা সেই সকল সংগ্রহ করে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড তৈরি কর্‌ল। আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো, তার লক্‌-লকে শিখা উপ্‌রে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। তখন মৌমাছি আর মৌচাকের উপর রইল না, সবগুলি পালিয়ে গেল। মাঝিরা গাছের উপরে উঠে বড় বড় দুখানা মৌচাক কেটে হাতে নিতে নিতেই বাঘের গর্জ্জন। বাপ্‌রে! চেয়ে দেখি কি, প্রকাণ্ড এক বাঘিনী আর তার এক বাচ্ছা! মাঝিদের আগুন জ্বালার আগেই তারা হয়ত স্বীকার খুঁজ্‌তে খুঁজতে নদীর ধারে এসেছিল। এখন মানুষ দেখ্‌তে পেয়েই রক্ত খাবার লোভ জেগে উঠলো। কিন্তু উপায় নেই, সামনেই দুটি বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড, মাঝিরাও গাছের উপরে, আমরাও নৌকার ভিতরে। কাজেই বাঘিনী রাগে জ্বলে উঠে গর্জ্জন করতে লাগ্‌লো। আমি জন্মে কখনো জ্যান্ত বাঘ দেখি নি, আজ হঠাৎ বাঘিনীকে দেখে, ভয়ে মার গলা জড়িয়ে ধরে বল্লুম, "ওমা, ঐ যে বাঘ এসেছে, এখন কি হবে ?"

মামাবাবু বন্দুকের আওয়াজ করতেই বাঘ পালিয়ে গেল, মাঝিরা মৌচাক নিয়ে নৌকায় এসেই নৌকা খুলে দিল। সবগুলি মৌচাকই মধুতে ভরা।

মাঝিরা খুব জোরে নৌকা বেয়ে রাত ন'টার সময়ে একটি ভাল জায়গায় এসে

নৌকা বাঁধ্‌লো। সেখানে জঙ্গল নেই, একটি ছোট হাট। দিনের বেলায় দোকানদার আর সব লোকজন এসে হাটটি বেশ জাঁকিয়ে তোলে, কিন্তু সন্ধ্যা হলেই যে যার ঘরে চলে যায়। সমস্ত হাটে শুধুই দুখানি মুদির দোকানে দিনরাত কয়েকজন মানুষ থাকে। তারা চোর ডাকাতের সঙ্গে এই রকম বন্দোবস্ত করে নিয়েছে—চোর ডাকাতেরাও তাদের কোন অনিষ্ট কর্‌বে না, তারাও চোর ডাকাতের বিরুদ্ধে চল্‌বে না। কিন্তু এ কথা আমরা পরে শুনেছি, তখন কে জান্‌ত? দুখানা দোকানের মানুষগুলির ভরসায় মামাবাবু সেই হাটটি নিরাপদ জায়গা মনে করে, সেখানেই রাত কাটাবার বন্দোবস্ত করলেন। মাঝিরাও বল্লে, 'এখানে ভয় নেই।'

সুন্দরবনের নদীতে খুব বড় বড় ভেট্‌কী মাছ। আমরা জেলেদের কাছে একটি ভেট্‌কি মাছ কিনেছিলুম। মা নিজের হাতে সেই মাছ রান্না কর্‌লেন। মামাবাবু মাছ খেয়ে বল্লেন, "বা! কি চমৎকার মাছ। খুব বড় দেখে একটা মাছ কিনে ভবানীপুরের বাসায় নিয়ে যাব।"

মাঝিরা সমস্ত দিন অত্যন্ত পরিশ্রম করেছিল, তারা শুয়েই নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগ্‌ল, আমিও ঘুমিয়ে পড়্‌লুম, কিন্তু মামাবাবু আর মায়ের চোখে ঘুম কোথায়? নানা রকম বিপদের আশঙ্কায় তাঁরা জেগেই রইলেন। তারপরে রাত যখন দুটো তখন হঠাৎ কদর্য্য চেহারার একটি লোক কল্‌কে হাতে করে এসে বল্লো। "মাঝির পো, ও মাঝির পো, জাগো?"

মাঝি। কে রে এত রাত্তিরে ডাকাডাকি করে?

মানুষটি। আরে ভাই, আমি এই ধানের জমিতে পাহারা দিয়ে থাকি। রাত্তিরে বুনো শুয়োর এসে ধান নষ্ট করে, কি না তাই আমি রাত জেগে শূয়োর তাড়াই। বয়স হয়েছে, কি না, তাই ঘণ্টায় ঘণ্টায় তামাক খেতে হয়। তা, আগুন নিভে গিয়েছে। ভাই মাঝি, একটিবার উঠে আমার এই কল্কেটায় একটু আগুন দাও ত।

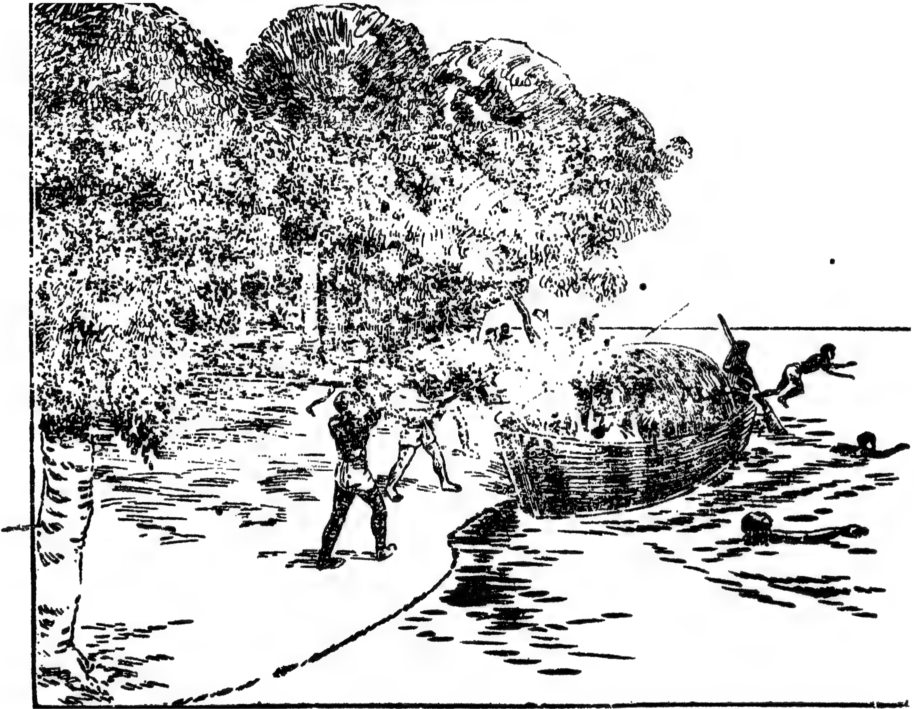
মাঝি। আমরা সমস্ত দিন খেটে এই দুপুর রাত্তিরে ঘুমুচ্ছি, এখন দেব তোকে আগুন! আব্দারও ত দেখ্‌ছি বিলক্ষণ।

মানুষটি। আগুন দিতেই হবে, জোর করে আমি আগুন নেব।

মাঝি। বটে জোর করে তুই আগুন নিবি? দাঁড়া ত লগি দিয়ে পিঠে কয়েক ঘা লাগিয়ে বেশ করে তোকে আগুন দিয়ে দিচ্ছি।

যেমনি এই কথা বলা, আর যায় কোথায়? সেই মানুষটি ডাকাতদেরই গোয়েন্দা। সে 'মার মার' করে হাঁক দিতেই আট দশ জন ডাকাত লাঠি, বল্লম ও

খাঁড়া নিয়ে এসে পড়্‌লো। কি ভয়ানক তাদের চেহারা। এক একটা কালো ভূতের মতন ; সমস্ত শরীর যেন লোহা দিয়ে গড়া। আমাদের মাঝিরা ডাকাতদের দেখেই যে যার প্রাণ নিয়ে নদীর ভিতরে ঝুপ্‌ঝাপ্‌ করে লাফিয়ে পড়্‌লো। তারা নৌকার মাঝি কি না, খুব সাঁতার জানে। সকলেই ডুব মেরে সাঁতার কেটে



মামাবাবু বন্দুক হাতে নিতেই কয়েকজন ডাকাত মস্ত বড় বাঁশের লাঠি দিয়ে তাঁর হাতের উপরে, পিঠের উপরে কয়েক ঘা লাগালো।

চল্লো। মামাবাবু বন্দুক হাতে নিতেই কয়েকজন ডাকাত মস্ত বড় বাঁশের লাঠি দিয়ে তাঁর হাতের উপরে, পিঠের উপরে কয়েক ঘা লাগালো, হাতের বন্দুক ত নীচেই পড়ে গেল, তিনিও অজ্ঞান হয়ে পড়্‌লেন। একজন ডাকাত খাঁড়া নিয়ে তাঁকে কাটতে যেতেই মা কেঁদে বল্লেন, "তোমাদের পায়ে পড়ি, তোমরা আমার ভাইকে আর আমার এই ছোট মেয়েটিকে কেটো না, এদের কেটে লাভ কি? ভাই ত অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, মেয়েটিও ছোট। আমাদের সঙ্গে টাকা, গয়না, ভাল কাপড়, যা কিছু, তোমরা নিয়ে যাও। আমি মোটেই বাধা দেব না। তাতেও যদি খুসি না হও, তবে আমাকেই কেটে ফেল।"

আমি মাকে জড়িয়ে ধরে বল্লুম, "ওগো, তোমরা আমার মাকে কেটো না। ও মা, তোমাকে না দেখে আমি থাক্‌ব কি করে ?"

মা মনে মনে ঈশ্বরের নাম করছিলেন। যেন ঈশ্বরের করুণাতেই এক বুড়ো ডাকাতের পাষাণ-প্রাণ গলে গেল। সেই বুড়োই ডাকাতের সর্দ্দার। সে বল্লো, "খবরদার! তোরা কারো গায়ে হাত দিস্‌নে। গায়ে হাত দেবার ত কোন দরকার নেই—তাড়াতাড়ি গয়না, টাকা-কড়ি আর জিনিষগুলি নিয়ে চল্। কে বল্‌বে, নদীর কোন্ বাঁকে পুলিশের নৌকা আছে, এখানে এসে পড়্‌লেই বিপদ্।"

ডাকাতেরা আমার মার আর আমার গায়ের সমস্ত গয়না এক একখানি করে খুলে নিলে। তারপরে, গয়না, কাপড় ও টাকা-কড়িভরা বাক্সগুলি নিয়ে উপরে উঠে নৌকার বাঁধন কেটে দিলে। নৌকা ভাস্‌তে ভাস্‌তে চল্‌তে লাগ্‌লো। মা দুই চোখের জলে ভাস্‌তে লাগ্‌লেন। এখন উপায় কি হবে ? নৌকা ভাস্‌তে ভাস্‌তে কোথায় চলে যাবে ? ভাইকে কেমন করে বাঁচাবেন ? এখানে কোথায়ই বা ডাক্তার, কোথায়ই বা ওষুধ ?

একটু পরে মাঝিরা সাঁতার কেটে নৌকায় এসে উঠ্‌লো। তার পরের দিন একটি গাঁয়ে ডাক্তারের সন্ধান পাওয়া গেল। ডাক্তার এসে মামার গায়ে ওষুধ লাগিয়ে দিলেন। তিনি মামাকে বল্লেন, "কোন ভয় নেই, শীগ্‌গিরই ভাল হয়ে যাবেন।"

(২)

আমরা ভবানীপুরে দাদামশায়ের বাসায় এসে পৌঁছুলুম। মাসীর বিয়ের তারিখ বদ্‌লে গেল। মামাবাবু যখন সেরে উঠ্‌লেন, তখন মাসীর বিয়ের দিন ঠিক হল। মাকে দিদিমার কয়েকখানি গয়না পর্‌তে দেওয়া হয়ে ছিল। আমি যে ছোট, কারো গয়না আমার গায়ে লাগে না; তাই মাসীর বিয়ের আগেই আমার কয়েকখানা গয়না গড়াবার জন্যে দাদামশাই আমাকে নিয়ে ভবানীপুরে এক স্যাক্‌রার দোকানে গেলেন। আমরা দুজনেই স্যাক্‌রার সাম্‌নে একটি মাদুরের উপরে বস্‌লুম। কি আশ্চর্য্য! চেয়ে দেখি, স্যাক্‌রার পাশেই আমার অতি যত্নের সোনার হার পড়ে রয়েছে। এ হার যে ডাকাতেরা নিজের হাতে আমার গলা থেকে খুলে নিয়েছিল, স্যাক্‌রা তা পেলে কি করে ? আমি তখন খুব ছোট মেয়ে কি না, তাই কিছুই না ভেবে বল্লুম, "দাদামশাই, ঐ দেখ, ওযে আমারই সোনার হার।"

স্যাক্‌রা আমার কথা শুনেই সোনার হার বাক্সের ভেতরে রেখে দিলে। দাদা-মশাই উকিলের কাজ করে চুল পাকিয়েছিলেন। কোন একটা বিষয় বুঝে নিতে তাঁর এতটুকুও দেরী হত না। তিনি স্যাক্‌রার রকম-সকম দেখেই বুঝলেন, এই হারের ভেতর কিছু রহস্য লুকানো আছে, নইলে স্যাক্‌রা তাড়াতাড়ি সে হার লুকোবে কেন? দাদামশাই স্যাক্‌রাকে বল্লেন, "তোমার সোনার হারের গড়ন ত বড় সুন্দর, বের কর না, একবার দেখি। আমারও যে ঐ রকমেরই একটি হার গড়াতে হবে।"

স্যাক্‌রা কি কম চালাক? সে বল্লে, "এক বাবু ঐ হার আমার কাছে রেখে গিয়েছেন, ঐ হারের নমুনায় তাঁকে একটি হার তৈরি করে দিতে হবে। পরের হার বাক্সের ভিতরেই থাকুক, ও আর আপনি দেখ্‌তে চাচ্ছেন কেন?"

দাদামশাই যতই হার দেখবার জন্যে জেদ কর্‌তে লাগ্‌লেন, স্যাক্‌রা ততই শক্ত হয়ে বল্‌তে লাগ্‌লো, "ও পরের হার আমি কিছুতেই দেখাতে পারি নে।" দাদামশাই উত্তেজিত হয়ে বল্লেন, "হার দেখাবে না? তুমি আমাকে জান? আমি হাইকোর্টের উকিল। আমার হার চুরি গিয়াছে, মনে হচ্ছে, সেই হার কেউ তোমার কাছে অল্প টাকায় বিক্রি করেছে। ভাল চাও ত হার দেখাও, নইলে এখনি থানায় খবর পাঠাব, পুলিশ এসে তোমাকে নাস্তানাবুদ কর্‌বে।"

ভবানীপুর অঞ্চলে দাদামশাইকে কোন্ ভদ্রলোকই বা না জানে? তাঁকে উত্তেজিত হয়ে কথা বল্‌তে দেখে, রাস্তার অনেক ভদ্রলোক দোকানের কাছে এসে ভিড় করে দাঁড়ালেন। দাদামশায়ের মুখে সমস্ত কথা শুনে তাঁরা বল্লেন, "বলি স্যাক্‌রা, তুমি হার দেখাবে না কেন?" ঠিক তখনি দাদামশায়ের পরিচিত পুলিশের বড় দারোগা এসে উপস্থিত হলেন। তখন স্যাক্‌রার বড় মুখ ছোট হয়ে গেল। দারোগা সব কথা শুনে, তখনি কয়েকজন পুলিশ ডেকে স্যাক্‌রার বাক্সের ভিতর থেকে সোনার হার বের করলেন। আমি সেই হার হাতে নিয়েই বল্লুম, "বা! এযে সত্যিই আমার হার, এই ত ছোট অক্ষরে 'নীরু' লেখা রয়েছে।"

নীরু আমারই নাম। পুলিশ তখনি স্যাক্‌রার দোকান খানাতল্লাস করে লোহার সিন্দুকের ভিতর থেকে বিস্তর গয়না বের কর্‌লো। ডাকাতির প্রায় সব গয়নাই তার ভেতরে পাওয়া গেল। স্যাক্‌রা বল্লে, "একটি লোক ঐ সব গয়না আমার কাছে বিক্রী করে টাকা নিয়ে চলে গিয়েছে; কে সে লোক, আমি তা জানি নে।"

দারোগা বল্লেন, "মিথ্যে কথা। ডাকাতদের তুমি বেশ ভাল করেই জান।

তাদের সঙ্গে তোমার খুব ভাব আছে। অনেকদিন থেকেই ডাকাতের সঙ্গে তোমার কারবার চলেছে। তুমি অতি অল্পটাকায় এই সব জিনিষ কিনেছ, এখন এইগুলিতে একটু রং করে খদ্দেরের কাছে বেশী টাকায় বিক্রী কর্‌বে। কিন্তু সহজে ত এ সব কথা স্বীকার কর্‌তে চাইবে না; এস বাপু, তোমাকে থানায় নিয়ে যাই। থানার মানুষগুলি যাদুবিদ্যে জানে, তোমার পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি নেড়ে তারা সব কথাই বের করে নেবে।

হলোও তাই, থানায় নিয়ে যাবার পর পুলিশের কড়া শাসনে কিছুক্ষণের মধ্যেই স্যাক্‌রা বল্লে, যথার্থই তার ডাকাতের সঙ্গে কারবার আছে, ও গয়নাগুলি সে ডাকাতের কাছে অল্প দামে কিনেছে। সুন্দরবনের এক পুরানো ভাঙ্গা বাড়ীর মধ্যে ডাকাতদের আড্ডা, সে কথাও তার কাছে শোনা গেল।

পুলিশের বড় সাহেব নিজেই কয়েকজন পুলিশ আর একদল গুর্খা সৈন্য নিয়ে ষ্টিমারে সুন্দরবনে গেলেন। কে জানে কোন্ সময়ে কে সুন্দরবনে দালান তৈরী করেছিলেন। তখন হয়ত এমন জঙ্গল ছিল না। যা হো'ক, পুলিশ সাহেব বাড়ী ঘিরে ফেলে ডাকাতদের ধরে ফেল্লেন। ডাকাতদের আড্ডায় টাকাকড়ি আর যথেষ্ট সোনার গয়না এবং ভাল ভাল কাপড় জামা পাওয়া গেল। সব চেয়ে শোন্‌বার কথা এই যে সেখান থেকে পুলিশ একটি ছোট মেয়েকে উদ্ধার করলে। ডাকাতেরা মেয়েটির বাপ-মাকে কেটে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে, তাকে নিজেদের কাছে রেখে মানুষ করেছিল। মেয়েটি চার বছর বয়সের সময়ে ডাকাতদের আড্ডায় আসে, এখন তার বয়স এগার বছর। সে-ই ত সকালে ও সন্ধ্যা বেলা রান্না করে ডাকাতদের খাওয়াত।

পুলিশ মেয়েটিকে কিছুদিন আমাদের বাড়ীতে রেখেছিল। আমি তাকে আপনার বোনের মতন ভালবাসতুম। মা তাকে অনেক জামা ও কাপড় দিয়েছিলেন। কি সুন্দর মেয়েটি। তাকে দেখ্‌লেই ভালবাসতে ইচ্ছে হতো। মেয়েটি বুড়ো ডাকাতকে দেখ্‌তে চাইত। বুড়ো ডাকাত তাকে বড় ভালবাস্‌ত। একটা নিষ্ঠুর ডাকাত এক এক সময়ে নাকি তাকে খুব মার্‌ত। রান্না কর্‌তে একটু দেরী হলেই মেয়েটির আর রক্ষে থাক্‌ত না। সাপ, বাঘ দেখে দেখে—সে তাদের অতি অল্পই ভয় করতো। মেয়েটি ডাকাতদের কাছে বেশ তীরছুড়্‌তে শিখেছিল; সে না কি তীর-ধনুক দিয়ে অনেকবার বাঘ আর বুনো মোষ মেরেছে। মেয়েটির কাছে নানা রকম গল্প শুনে আমরা অবাক্ হয়ে যেতুম।

হাকিমের বিচারে ডাকাতদের দ্বীপান্তর আর স্যাক্‌রার জেল হয়ে গেল।

অনেক কষ্টে মেয়েটির ভাইদের খবর পাওয়া গেল। তাঁরা এসে বোন্‌টিকে নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। তখন যে তাদের কি আনন্দ, তা আর কি বল্‌ব? আমার বোধ হয়, মেয়েটি বড় হয়ে খুব সুখীই হয়েছিল।

—স্বর্গীয় অমৃতলাল গুপ্ত

অবাক্ জলপান

[ছাতা মাথায় এক পথিকের প্রবেশ—পিঠে লাঠির আগায় লোটা-বাঁধা পুঁটুলি—উস্কোখুস্কো চুল—শ্রান্ত চেহারা]

নাঃ—একটু জল না পেলে আর চল্‌ছে না। সেই সকাল থেকে হেঁটে আস্‌ছি, এখনও প্রায় এক ঘণ্টার পথ বাকী। তেষ্টায় মগজের ঘিলু পর্য্যন্ত শুকিয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু জল চাই কার কাছে? গেরস্তের বাড়ী দুপুর রোদে দরজা এঁটে সব ঘুম দিচ্ছে, ডাক্‌লে সাড়া দেয় না। বেশী চেঁচাতে গেলে হয়ত লাঠি নিয়ে তেড়ে আস্‌বে। পথেও ত লোকজন দেখ্‌ছি নে!—ঐ একজন আস্‌ছে! ওকেই জিজ্ঞেস্ করা যাক্। [ঝুড়ি মাথায় এক ব্যক্তির প্রবেশ]

পথিক—মশাই, একটু জল পাই কোথায় বল্‌তে পারেন?

ঝুড়িওয়ালা—জলপাই? জলপাই এখন কোথায় পাবেন? এ ত জলপাইয়ের সময় নয়। কাঁচা আম চান, দিতে পারি—

পথিক— না না, আমি তা বলি নি—

ঝুড়ি—না, কাঁচা আম আপনি বলেন নি, কিন্তু জলপাই চাচ্ছিলেন কি না, তা ত আর এখন পাওয়া যাবে না, তাই বল্‌ছিলুম—

পথিক—না হে, আমি জলপাই চাচ্ছি নে—

ঝুড়ি—চাচ্ছেন না ত "কোথায় পাব" "কোথায় পাব" কচ্ছেন কেন? খামাখা এ রকম কর্‌বার মানে কি?

পথিক—আপনি ভুল বুঝেছেন—আমি জল চাচ্ছিলুম—

ঝুড়ি—জল চাচ্ছেন ত 'জল' বল্‌লেই হয়—'জলপাই' বল্‌বার দরকার কি?

'জল' আর 'জলপাই' কি এক হ'ল? 'আলু' আর 'আলুবোখরা' কি সমান? 'মাছও' যা আর 'মাছরাঙ্গাও' তাই? 'বরকে' কি আপনি 'বরকন্দাজ' বলেন? 'চাল' কিনতে গেলে কি 'চাল্‌তার' খোঁজ করেন?

পথিক—ঘাট হ'য়েছে মশাই। আপনার সঙ্গে কথা বলাই আমার অন্যায় হ'য়েছে।

ঝুড়ি—অন্যায় ত হ'য়েছেই। দেখ্‌ছেন ঝুড়ি নিয়ে যাচ্ছি—তবে জলই বা চাচ্ছেন কেন? ঝুড়িতে ক'রে কি জল নেয়?—লোকের সঙ্গে কথা কইতে গেলে একটু বিবেচনা ক'রে বল্‌তে হয়। প্রস্থান]

পথিক—দেখ্‌লে! কি কথায় কি বানিয়ে ফেল্লে! যাক্‌, ঐ বুড়ো আসছে, ওকে একবার ব'লে দেখি। [লাঠি হাতে, চটি পায়ে, চাদর গায়ে, এক বৃদ্ধের প্রবেশ]

বৃদ্ধ—কে ও? গোপ্‌লা নাকি?

পথিক—আজ্ঞে না—আমি পূবগাঁয়ের লোক—একটু জলের খোঁজ কচ্ছিলুম—

বৃদ্ধ—বল কিহে? পূবগাঁও ছেড়ে এখানে এয়েছ জলের খোঁজ কর্‌তে?—হাঃ, হাঃ, হাঃ।—তা, যাই বল বাপু—অমন জল কিন্তু কোথাও পাবে না। খাসা জল, তোফা জল, চমৎকার জল।

পথিক—আজ্ঞে হ্যাঁ—সেই সকাল থেকে হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে বেজায় তেষ্টা পেয়ে গেছে।

বৃদ্ধ—তা ত পাবেই। ভাল জল যদি হয়, তা দেখ্‌লে তেষ্টা পায়, নাম কর্‌লে তেষ্টা পায়, ভাব্‌তে গেলে তেষ্টা পায়। তেমন তেমন জল ত খাও নি কখন!—বলি ঘুম্‌ড়ির জল খেয়েছ কোন দিন?

পথিক—আজ্ঞে না, তা খাই নি—

বৃদ্ধ—খাও নি? অ্যাঃ! ঘুম্‌ড়ি হচ্ছে আমার মামাবাড়ী—আদৎ জলের জায়গা। সেখানকার যে জল, সে কি বল্‌ব তোমায়? কত জল খেলাম—কলের জল, নদীর জল, ঝরণার জল, পুকুরের জল,—কিন্তু মামাবাড়ীর কুয়োর যে জল, অমনটি আর কোথাও খেলাম না। ঠিক যেন চিনির পানা, ঠিক যেন ক্যাওড়া-দেওয়া সরবৎ!

পথিক—তা মশাই আপনার জল আপনি মাথায় ক'রে রাখুন—আপাততঃ এখন এই তেষ্টার সময়, যা হয় একটু জল আমার গলায় পড়্‌লেই চল্‌বে—

বৃদ্ধ—তা হ'লে বাপু তোমার গাঁয়ে ব'সে জল খেলেই ত পার্‌তে? পাঁচ ক্রোশ পথ হেঁটে জল খেতে আসবার দরকার কি ছিল? 'যা হয় একটা হ'লেই হ'ল, ও আবার কি রকম কথা? আর অমন তাচ্ছিল্য ক'রে বল্‌বারই বা দরকার কি?

আমাদের জল পছন্দ না হয়, খেও না—বাস্। গায়ে প'ড়ে নিন্দে কর্‌বার দরকার কি? আমি ওরকম ভাল বাসিনে। হ্যাঃ— [রাগে গজ্‌ গজ্‌ করিতে করিতে প্রস্থান]

[পাশের এক বাড়ীর জানালা খুলিয়া আর এক বৃদ্ধের হাসিমুখ বাহির করণ]

বৃদ্ধ—কিহে? এত তর্কাতর্কি কিসের?

F—আজ্ঞে না, তর্ক নয়। আমি জল চাইছিলুম, তা উনি সে কথা কানেই



বল কিহে? পূবগাঁও ছেড়ে এখেনে এয়েছ জলের খোঁজ কর্‌তে?—৩০ পৃষ্ঠা।

নেন্ না—কেবলই সাত পাঁচ গপ্প কর্‌তে লেগেছেন। তাই বল্‌তে গেলুম ত রেগে মেগে অস্থির!

বৃদ্ধ—আরে দূর দূর! তুমিও যেমন! জিজ্ঞেস কর্‌বার লোক পাও নি? ও হতভাগা জানেই বা কি, আর বল্‌বেই বা কি? ওর যে দাদা আছে, আলিপুরে চাক্‌রি করে, সেটা ত একটা আস্ত গাধা। ও মুখ্যুটা কি বল্লে তোমায়?

পথিক—কি জানি মশাই—জলের কথা বল্‌তেই, কুয়োর জল, নদীর জল, পুকুরের জল, কলের জল, মামাবাড়ীর জল, ব'লে পাঁচরকম ফর্দ্দ শুনিয়ে দিল—

বৃদ্ধ—হুঁঃ—ভাব্‌লে খুব বাহাদুরী করেছি! তোমায় বোকামতন দেখে খুব চাল চেলে নিয়েছে। ভারি ত ফর্দ্দ করেছেন! আমি লিখে দিতে পারি, ও যদি পাঁচটা জল বলে থাকে, তা আমি এক্ষুনি পঁচিশটা বলে দেব—

পথিক—আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু আমি বল্‌ছিলুম কি একটু খাবার জল—

বৃদ্ধ—কি বল্‌ছ? বিশ্বাস্‌ হ'চ্ছে না? আচ্ছা শুনে যাও। বৃষ্টির জল, ডাবের জল, নাকের জল, চোখের জল, জিবের জল, হুঁকোর জল, শান্তি জল, ফটিক্‌ জল——রোদে ঘেমে জ—ল, আহ্লাদে গ'লে জ—ল, গায়ের রক্ত জ—ল, বুঝিয়ে দিল যেন জ—ল,—কটা হ'ল? গোণ নি বুঝি?

পথিক—না মশাই গুণি নি—আমার আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই—

বৃদ্ধ—তোমার কাজ না থাক্‌লেও আমাদের কাজ থাক্‌তে পারে ত? যাও যাও, মেলা বকিও না—একেবারে অপদার্থের একশেষ। [সশব্দে জানালা বন্ধ]

পথিক—নাঃ, আর জলটল চেয়ে কাজ নেই—এগিয়ে যাই, দেখি কোথাও পুকুর টুকুর পাই কি না। [লম্বা লম্বা চুল, চোখে সোনার চশমা, হাতে খাতা পেন্সিল, পায়ে চুট্‌কি জুতা, একটি ছোক্‌রার প্রবেশ]

—লোকটা নেহাৎ এসে পড়েছে যখন, একটু জিজ্ঞেস করেই দেখি। মশাই, আমি অনেক দূর থেকে আস্‌ছি. এখানে একটু জল মিল্‌বে না কোথাও?

ছোক্‌রা—কি বল্‌ছেন? 'জল' মিল্‌বে না? খুব মিল্‌বে। একশোবার মিল্‌বে। দাঁড়ান, এক্ষুনি মিলিয়ে দিচ্ছি—জল চল তল বল কল ফল—মিলের অভাব কি? কাজল-সজল-উজ্জ্বল জ্বল্‌জ্বল্‌—চঞ্চল চল্‌ চল্‌, আঁখিজল ছল্‌ছল্‌, নদীজল কল্‌কল্‌, হাসি শুনি খলখল—অ্যাকানল ব্যাঁকানল—আগল ছাগল পাগল—কত চান?

পথিক—এ দেখি আরেক পাগল! মশাই, আমি সে রকম মিল্‌বার কথা বলি নি।

ছোক্‌রা—তবে কোন্‌ রকম মিল চাচ্ছেন বলুন? কি রকম কোন্‌ ছন্দ, সব বলে দিন—যেমনটি চাইবেন, তেমনিটি ক'রে মিলিয়ে দেব।

পথিক—ভাল বিপদেই পড়া গেল দেখ্‌ছি—[জোরে] মশাই! আর কিছু চাইনে,—[আরো জোরে] শুধু একটু জল খেতে চাই!

ছোক্‌রা—ও, বুঝেছি। শুধু—একটু—জল—খেতে—চাই। এই ত? আচ্ছা বেশ। এ আর মিল্‌বে না কেন?—

শুধু একটু জল খেতে চাই—ভারি তেষ্টা প্রাণ আই ঢাই।

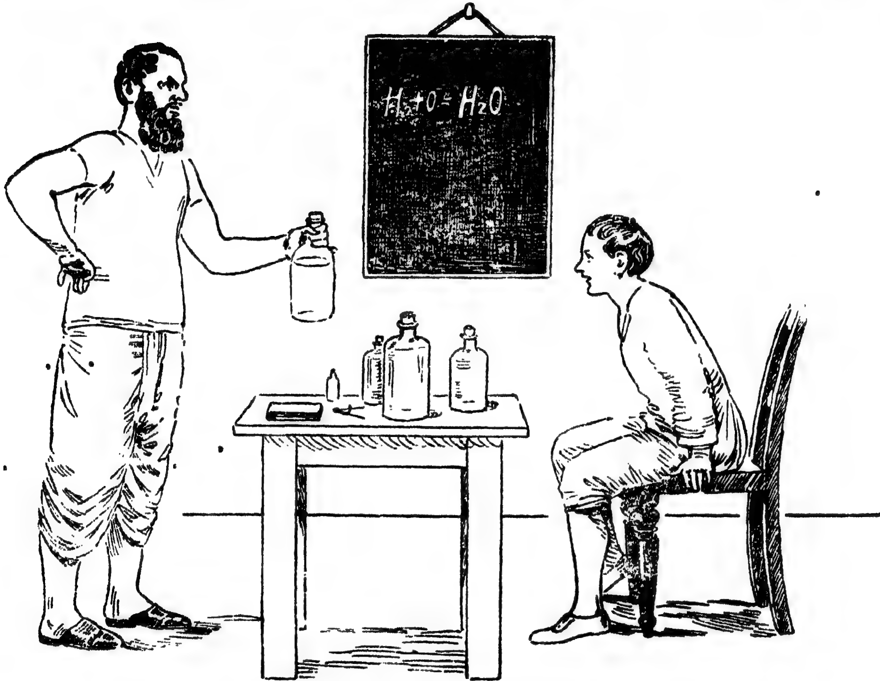
চাই কিন্তু কোথা গেলে পাই? বল্‌ শীঘ্র বল্‌ নারে ভাই।

কেমন? ঠিক মিল্‌ছে ত?

পথিক—আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব মিল্‌ছে—খাসা মিল্‌ছে—নমস্কার। [সরিয়া গিয়া]—নাঃ—ব'কে ব'কে মাথা ধরিয়ে দিলে—একটু ছায়ায় ব'সে মাথাটা ঠাণ্ডা ক'রে নি।

[একটা বাড়ীর ছায়ায় গিয়া বসিল]

ছোক্‌রা—[খুসী হইয়া লিখিতে লিখিতে] মিল্‌বে না? বলি, মেলাচ্ছে কে? সেবার যখন বিষ্টুদাদা 'বৈকাল' কিসের সঙ্গে মিল দেবে খুঁজে পাচ্ছিল না, তখন 'নৈপাল' ব'লে দিয়েছিল কে?—নৈপাল কা'কে বলে জানেন ত? নেপালের লোক হ'ল



জল হ'চ্ছে দুই ভাগ হাইড্রোজেন আর একভাগ অক্সিজেন—৩৪ পৃষ্ঠা।

নৈপাল বলিল।—[পথিককে না দেখিয়া] লোকটা গেল কোথায়? দুত্তেরি! [প্রস্থান]

[বাড়ীর ভিতরে বালকের পাঠ—পৃথিবীর তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল। সমুদ্রের জল লবণাক্ত, অতি বিস্বাদ]

পথিক—ওহে খোকা! একটু এদিকে শুনে যাও ত!

[রুক্ষমূর্ত্তি, মাথায় টাক, লম্বা দাড়ি, খোকার মামা বাড়ী হইতে বাহির হইলেন]

মামা। কে হে? পড়ার সময় ডাকাডাকি কর্‌তে এয়েছ?—[পথিককে দেখিয়া] ও! আমি মনে করেছিলুম পাড়ার কোন ছোক্‌রা বুঝি। আপনার কি দরকার?

পথিক—আজ্ঞে, জল তেষ্টায় বড় কষ্ট পাচ্ছি—তা একটু জলের খবর কেউ বল্‌তে পার্‌লে না।

মামা—[তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা খুলিয়া] কেউ বল্‌তে পার্‌লে না? আসুন, আসুন। কি খবর চান, কি জান্‌তে চান, বলুন দেখি? সব আমায় জিজ্ঞেস্‌ করুন, আমি বলে দিচ্ছি! [ঘরের মধ্যে টানিয়া লওন—ভিতরে নানারকম যন্ত্র, নক্সা, রাশি রাশি বই] কি বল্‌ছিলেন? জলের কথা জিজ্ঞেস্‌ কর্‌ছিলেন না?

পথিক—আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই সকাল থেকে হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে আস্‌ছি—

মামা—আহাহা! কি উৎসাহ! কি আগ্রহ! শুনেও সুখ হয়। এ রকম জান্‌বার আকাঙ্ক্ষা ক'জনের আছে, বলুন ত? বসুন! বসুন!—[কতগুলি ছবি আর বই আর এক টুক্‌রা খড়ি বাহির করিয়া] জলের কথা জান্‌তে গেলে প্রথমে জানা দরকার জল কা'কে বলে, জলের কি গুণ—

পথিক—আজ্ঞে, একটু খাবার জল যদি—

মামা—আস্‌ছে—ব্যস্ত হবেন না। একে একে সব কথা আস্‌বে। জল হ'চ্ছে দুই ভাগ হাইড্রোজেন আর একভাগ অক্সিজেন—

[বোর্ডে খড়ি দিয়া লিখিলেন—$H_2 + O = H_2O$]

পথিক—এই মাটি করেছে!

মামা—বুঝ্‌লেন? রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জলকে বিশ্লেষণ কর্‌লে হয়—হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন। আর হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ হ'লেই হ'ল জল! শুন্‌ছেন ত?

পথিক—আজ্ঞে হ্যাঁ, সব শুন্‌ছি। কিন্তু একটু খাবার জল যদি দেন্‌, তাহ'লে আরও মন দিয়ে শুন্‌তে পারি।

মামা—বেশ ত!—খাবার জলের কথাই নেওয়া যাক্‌ না! খাবার জল কা'কে বলে? না, যে জল পরিষ্কার, স্বাস্থ্যকর, যাতে দুর্গন্ধ নেই, রোগের বীজ নেই,—কেমন? এই দেখুন্‌ একশিশি জল, আহা, ব্যস্ত হবেন না।—দেখতে মনে হয় বেশ পরিষ্কার, কিন্তু অনুবীক্ষণ দিয়ে যদি দেখেন, দেখবেন পোকা সব কিল্‌বিল্‌ কর্‌ছে। কেঁচোর মত কৃমির মত সব পোকা—এমনি চোখে দেখা যায় না, কিন্তু অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখায় ঠিক এত্তো বড় বড়। এই বোতলের মধ্যে দেখুন, ও বাড়ীর পুকুরের জল; আমি এই মাত্র পরীক্ষা ক'রে দেখলুম, ওর মধ্যে রোগের বীজ সব গিজগিজ করছে—প্লেগ, টাইফয়েড, ওলাউঠা, ঘেয়োজ্বর,—ও জল খেয়েছেন কি মরেছেন! এই ছবি দেখুন—এইগুলো হচ্ছে কলেরার বীজ, এই ডিপথেরিয়া, এই নিউমোনিয়া,

ম্যালেরিয়া—সব আছে। আর এই সব হ'চ্ছে জলের পোকা—জলের মধ্যে শ্যাওলা ময়লা যা কিছু থাকে, ওরা সেইগুলো খায়। আর এই জলটার কি দুর্গন্ধ দেখুন! পচা পুকুরের জল—ছেঁকে নিয়েছি, তবু গন্ধ!

পথিক—উহুঁহুঁহুঁ! করেন কি মশাই? ওসব জান্‌বার আমার কিচ্ছু দরকার নেই—

মামা—খুব দরকার আছে। এসব জান্‌তে হয়—অত্যন্ত দরকারী কথা।

পথিক—হোক্ দরকারী—আমি জান্‌তে চাইনে—এখন আমার সময় নেই!

মামা—এই ত জান্‌বার সময়। আর দুদিন বাদে যখন বুড়ো হ'য়ে মর্‌তে বস্‌বেন, তখন জেনে লাভ কি? জলে কি কি দোষ থাকে, কি ক'রে সে সব ধ'র্‌তে হয়, কি ক'রে তার শোধন হয়, এসব কি জানবার মত কথা নয়? এই যে নদীর জল সব সমুদ্রে যাচ্ছে, সমুদ্রের জল বাষ্প হ'য়ে উঠ্‌ছে, মেঘ হ'চ্ছে, বৃষ্টি পড়্‌ছে—এ রকম কেন হয়, কিসে হয়, তাও ত জানা দরকার?

পথিক—দেখুন মশাই। কি ক'রে যে কথাটা আপনাদের মাথায় ঢোকাব ত ত ভেবে পাইনে। বলি, বারবার ক'রে যে বল্‌ছি—তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেল, সেটা ত কেউ কানে নিচ্ছেন না দেখি! একটা লোক তেষ্টায় 'জল জল' কর্‌ছে, তবু জল খেতে পায় না, এরকম কোথাও শুনেছেন?

মামা—শুনেছি বই কি—চোখেও দেখেছি। বদ্যিনাথকে কুকুরে কাম্‌ড়াল, বদ্যিনাথের হ'ল হাইড্রোফোবিয়া—যাকে বলে জলাতঙ্ক। আর জল খেতে পারে না—যেই জল খেতে যায় অমনি গলায় খিঁচ ধরে যায়। মহা মুস্কিল!—শেষটায় ওঝা ডেকে, ধুতুরো দিয়ে ওষুধ মেখে খাওয়ালে, মন্তর চালিয়ে বিষ ঝাড়াল—তারপর সে জল খেয়ে বাঁচ্‌ল।—ওরকম হয়।

পথিক—নাঃ—এদের সঙ্গে আর পেরে ওঠা গেল না। কেনই বা মর্‌তে এসেছিলাম এখানে? বলি, মশাই, আপনার এখানে নোংরা জল আর দুর্গন্ধ জল ছাড়া ভাল খাঁটি জল কিছু নেই?

মামা—আছে বৈকি। এই দেখুন না বোতল ভরা টাট্‌কা খাঁটি 'ডিষ্টিল ওয়াটার'—যাকে বলে 'পরিস্রুত জল'।

পথিক—(ব্যস্ত হইয়া) এ জল কি খায়?

মামা—না, ও জল খায় না—ওতে ত স্বাদ নেই—একেবারে বোবা জল কি না, এইমাত্র তৈরী ক'রে আন্‌ল—এখনও গরম রয়েছে। [পথিকের হতাশভাব] তারপর যা বল্‌ছিলাম শুনুন—এই যে দেখ্‌ছেন গন্ধওয়ালা নোংরা জল—এর মধ্যে

দেখুন এই গোলাপি জল ঢেলে দিলুম বাস্, গোলাপি রং উড়ে সাদা হ'য়ে গেল। দেখ্‌লেন ত ?

পথিক—না মশাই, কিচ্ছু দেখিনি—কিচ্ছু বুঝ্‌তে পারিনি—কিচ্ছু মানি না—কিচ্ছু বিশ্বাস করি না।—

মামা—কি বল্লেন ! আমার কথা বিশ্বেস করেন না ?

পথিক—না, করি না। আমি যা চাই, তা যতক্ষণ দেখাতে না পার্‌বেন, ততক্ষণ কিচ্ছু শুন্‌ব না, কিচ্ছু বিশ্বাস কর্‌ব না।

মামা—বটে ! কোন্‌টা দেখ্‌তে চান একবার বলুন দেখি—আমি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি—

পথিক—তাহ'লে দেখান দেখি। সাদা, খাঁটি চমৎকার ঠাণ্ডা, এক গেলাস খাবার জল নিয়ে দেখান দেখি। যাতে গন্ধ পোকা নেই, কলেরার পোকা নেই, ময়লাটয়লা কিচ্ছু নেই, তা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখান্ দেখি। খুব বড় এক গেলাস ভর্ত্তি জল নিয়ে দেখান্ ত।

মামা—এক্ষুণি দেখিয়ে দিচ্ছি—ওরে ট্যাপা দৌড়ে আমার কুঁজো থেকে এক গেলাস জল নিয়ে আয় ত।—[পাশের ঘরে দুপ্‌দাপ্ শব্দে খোকার দৌড়] নিয়ে আসুক্ তারপর দেখিয়ে দিচ্ছি। ঐ জলে কি রকম হয়, আর এই নোংরা জলে কি রকম তফাৎ হয়, সব আমি এক্‌স্পেরিমেণ্ট ক'রে দেখিয়ে দিচ্ছি। [জল লইয়া ট্যাপার প্রবেশ] রা, এইখানে রাখ্।

[জল রাখিবামাত্র পথিকের আক্রমণ—মামার হাত হইতে জল কাড়িয়া এক নিঃশ্বাসে চুমুক দিয়া শেষ]

পথিক—আঃ ! বাচা গেল।

মামা—[চটিয়া] এটা কি রকম হ'ল মশাই ?

পথিক—পরীক্ষা হ'ল এক্‌স্পেরিমেণ্ট্। এবার আপনি নোংরা জলটা একবার খেয়ে দেখান ত, কি রকম হয় ?

মামা—(ভীষণ রাগিয়া) কি বল্লেন !

পথিক—আচ্ছা থাক্, এখন নাই বা খেলেন—পরে খাবেন অখন। আর এই গাঁয়ের মধ্যে আপনার মত আন্‌কোরা পাগল আর যতগুলো আছে, সব ক'টাকে খানিকটে করে খাইয়ে দেবেন। তারপর খাটিয়া তোল্‌বার দরকার হ'লে আমায় খবর দেবেন—আমি খুসী হয়ে ছুটে আস্‌ব—হতভাগা জোচ্চোর কোথাকার !

[পাশের গলিতে কে সুর করিয়া হাঁকিতে লাগিল—"অবাক জলপান"]

—স্বর্গীয় সুকুমার রায়

শিলাদিত্য

শিলাদিত্যের যখন জন্ম হয়নি, যে-সময় বল্লভীপুরে রাজা কনকসেনের বংশের শেষ-রাজা রাজত্ব করছিলেন, সেই সময় বল্লভীপুরে সূর্য্যকুণ্ড-নামে একটি অতি পবিত্র কুণ্ড ছিল। সেই কুণ্ডের একধারে প্রকাণ্ড সূর্য্য-মন্দিরে এক অতিবৃদ্ধ পুরোহিত বাস করতেন। তাঁর একটিও পুত্রকন্যা কিম্বা বন্ধুবান্ধব ছিল না। অনন্ত আকাশে সূর্য্যদেব যেমন একা, তেমনি আকাশের মতো নীল প্রকাণ্ড সূর্য্যকুণ্ডের তীরে আদিত্য-মন্দিরে সূর্য্য-পুরোহিত তেজস্বী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বড়ই একাকী, বড়ই সঙ্গীহীন ছিলেন: মন্দিরে দীপ-দান, ঘণ্টাধ্বনি, উদয়-অস্ত দুই সন্ধ্যা আরতি, সকল ভারই তাঁর উপর;—ভৃত্য নেই, অনুচর নেই, একটি শিষ্যও নেই। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একাই প্রতিদিন ত্রিশ সের ওজনের পিতলের প্রদীপে দুই সন্ধ্যা সূর্য্যদেবের আরতি করতেন; প্রতিদিনই সেই শীর্ণ হাতে রাক্ষস-রাজার রাজ-মুকুটের মতো মন্দিরের প্রকাণ্ড ঘণ্টা বাজাতেন; আর মনে মনে ভাবতেন যদি একটি সঙ্গী পাই, তবেই এই বৃদ্ধ বয়সে তার হাতে সমস্ত ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হই!

সূর্য্যদেব ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। একদিন পৌষ মাসের প্রথমে ঘন কুয়াশায় চারিদিক অন্ধকার ছিল, সূর্য্যদেব অস্ত গেছেন, বৃদ্ধ পুরোহিত সন্ধ্যার আরতি শেষ কোরে ভীমের বুকপাটাখানার মতো প্রকাণ্ড মন্দিরের লোহার কপাট বহুকষ্টে বন্ধ করছেন, এমন সময় ম্লানমুখে একটি ব্রাহ্মণ-কন্যা তার সম্মুখে উপস্থিত হল;—পরণে ছিন্নবাস, কিন্তু অপূর্ব্ব সুন্দরী! বোধ হল, যেন শীতের ভয়ে একটি সন্ধ্যাতারা সূর্য্যমন্দিরে আশ্রয় চায়! ব্রাহ্মণ দেখলেন কন্যাটি সুলক্ষণা, অথচ তার বিধবার বেশ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"কে তুমি? কি চাও?" তখন সেই ব্রাহ্মণ-বালিকা কমলকলির মতো ছোট দুইখানি হাত জোড় কোরে বল্লে—"প্রভু, আমি আশ্রয় চাই; ব্রাহ্মণ-কন্যা, গুর্জ্জর দেশের বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ দেবাদিত্যের একমাত্র কন্যা আমি, নাম সুভাগা; বিয়ের রাত্রে বিধবা হয়েছি, সেই দোষে দুর্ভাগী বোলে সকলে মিলে, আমায় আমাদের দেশের বার করেছে! প্রভু, আমার মা ছিলেন, এখন মাও নেই, আমায় আশ্রয় দাও। ব্রাহ্মণ বল্লেন—"আরে অনাথিনী, এখানে কোন্ সুখের আশায় আশ্রয় চাস্? আমার অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, আমি যে নিতান্ত দরিদ্র, বন্ধুহীন্!"

ব্রাহ্মণ মনে-মনে এই কথা বল্লেন বটে, কিন্তু কে যেন তাঁর মনের ভিতর বল্‌তে

লাগল—'হে দরিদ্র, হে বন্ধুহীন, এই বালিকাকে তোমার বন্ধু কর, আশ্রয় দাও।' ব্রাহ্মণ একবার মনে করলেন, আশ্রয় দিই; আবার ভাবলেন,—যে মন্দিরে আশি বৎসর ধরে একা এই সূর্য্যদেবের পুজা কল্লেম, আজ শেষ-দশায় আবার কার হাতে তাঁর পূজার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হই! ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। তখন সহসা সন্ধ্যার সমস্ত অন্ধকার ভেদ কোরে পৃথিবীর পশ্চিম পার থেকে এক-বিন্দু সূর্য্যের আলো সেই দুঃখিনী বালিকার মুখখানিতে এসে পড়ল। ভগবান্ আদিত্যদেব যেন নিজের হাতে দেখিয়ে দিলেন—এই আমার সেবাদাসী! হে আমার প্রিয়ভক্ত, এই বালিকাকে আশ্রয় দাও, যেন চিরদিন এই দুঃখিনী বিধবা আমার সেবায় নিযুক্ত থাকে। ব্রাহ্মণ জোড়হস্তে সূর্যদেবকে প্রণাম কোরে, দেবাদিত্য ব্রাহ্মণের কন্যা সুভাগাকে সূর্য্য-মন্দিরে আশ্রয় দিলেন।

তারপর কতদিন কেটে গেল, সুভাগা তখন মন্দিরের সমস্ত কাজই শিখেছেন, কেবল ননীর মতো কোমল হাতে ত্রিশ সের ওজনের সেই আরতির প্রদীপটা কিছুতেই তুলতে পাল্লেন না বোলে আরতির কাজটা বৃদ্ধকেই করতে হত। একদিন সুভাগা দেখলেন, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের জীর্ণ শরীর যেন ভেঙে পড়েছে,—আরতির প্রদীপ শীর্ণ হাতে টলে পড়েছে। সেইদিন সুভাগা বল্লভীপুরের বাজারে গিয়ে এক সের ওজনের একটি ছোট প্রদীপ নিয়ে এসে বল্লেন—"পিতা, আজ সন্ধ্যার সময় এই প্রদীপে সূর্য্যদেবের আরতি করুন।" ব্রাহ্মণ একটু হেসে বল্লেন—"সকালে যে প্রদীপে দেবতার আরতি আরম্ভ করেছি, সন্ধ্যাতেও সেই প্রদীপে দেবতার আরতি করা চাই! নূতন প্রদীপ তুলে রাখ, কাল নূতন দিনে নূতন প্রদীপে সূর্য্যদেবের আরতি হবে।" সেই দিন ঠিক দ্বিপ্রহরে সূর্য্যের আলোয় তখন সমস্ত পৃথিবী আলোময় হয়ে গেছে, সেই সময় ব্রাহ্মণ সুভাগাকে সূর্য্যমন্ত্র শিক্ষা দিলেন;—যে মন্ত্রের গুণে সূর্য্যদেব স্বয়ং এসে ভক্তকে দর্শন দেন, যে মন্ত্র জীবনে একবার ছাড়া দুইবার উচ্চারণে নিশ্চয় মৃত্যু। তারপর সন্ধিক্ষণে সন্ধ্যার অন্ধকারে আরতি-শেষে নিভন্ত প্রদীপের মতো ব্রাহ্মণের জীবন-প্রদীপ ধীরে ধীরে নিভে গেল; সূর্য্যদেব সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার কোরে অস্ত গেলেন। সুভাগা একলা পড়লেন!

প্রথম দিনকতক সুভাগা বৃদ্ধের জন্য কেঁদে-কেঁদে কাটালেন। তারপর দিন-কতক নিজের হাতে জঙ্গল পরিষ্কার কোরে মন্দিরের চারিদিকে ফলের গাছ, ফুলের গাছ লাগাতে কেটে গেল। আরও কতকদিন মন্দিরের পাথরের দেওয়া মেজে-ঘসে পরিষ্কার কোরে তার গায়ে লতা, ফুল, পাখী, হাতী, ঘোড়া, পুরাণ ইতিহাসের পট লিখিতে চলে গেল। শেষে সুভাগার হাতে আর কোনো কাজ রইল না। তখন

তিনি সেই ফলের বাগানে, ফুলের মালঞ্চে একা-একাই ঘুরে বেড়াতেন। ক্রমে যখন সেই নূতন বাগানে দুটি-একটি ফল পাকতে আরম্ভ হল, দুটি-একটি ফুল ফুটতে লাগল, তখন ক্রমে দু-একটি ছোট পাখী, গুটিকতক রঙিন প্রজাপতি, সেই সঙ্গে একপাল ছোট-বড় ছেলে মেয়ে দেখা দিলে। প্রজাপতি শুধু একটুখানি ফুলের মধু খেয়ে সন্তুষ্ট ছিল, পাখী শুধু দু-একটা পাকা ফল ঠোকরাত মাত্র; কিন্তু সেই ছেলের পাল ফুল ছিঁড়ে, ফল পেড়ে, ডাল ভেঙে চুরমার করত। সুভাগা কিন্তু কাকেও কিছু বলতেন না, হাসিমুখে সকল উৎপাত সহ্য করতেন। গাছের তলায় সবুজ ঘাসে নানা রঙের কাপড় পরে' ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে খেলে বেড়াত, দেখতে-দেখতে সুভাগার দিনগুলো আন্‌মনে কেটে যেত। ক্রমে বর্ষা এসে পড়ল;—চারিদিকে কালো মেঘের ঘটা, বিদ্যুতের ছটা, আর গুরু-গুরু গর্জ্জন। সেই সময় একদিন ক্ষুরের মতো পূবের হাওয়া সুভাগার নূতন বাগানে ফুলের বোঁটা কেটে গাছের পাতা ঝরিয়ে, তার সাধের মালঞ্চ শূন্য-প্রায় কোরে শন্‌-শন্‌-শব্দে চলে গেল। পাখীর ঝাঁক হাওয়ার মুখে উড়ে গেল, প্রজাপতির ভাঙা ডানা ফুলের পাপ্‌ড়ির মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল, ছেলের পাল কোথায় অদৃশ্য হল। সুভাগা তখন সেই ধারা-শ্রাবণে একা বসে-বসে বাপ-মায়ের কথা, শ্বশুর-শাশুড়ীর নিষ্ঠুরতা, আর বিয়ের রাত্রের সুন্দর বরের হাসিমুখের কথা মনে কোরে কাঁদতে লাগলেন; আর মনে-মনে ভাবতে লাগলেন—"হায়, এই নির্জ্জনে সঙ্গীহীন বিদেশে কেমন কোরে সারাজীবন একা কাটাব।" হরিণের চোখের মতো সুভাগার কালো-কালো দুটি বড়-বড় চোখ অশ্রুজলে ভরে উঠল। তিনি পূবে দেখলেন অন্ধকার, পশ্চিমে অন্ধকার, উত্তরে, দক্ষিণে, চারিদিকে অন্ধকার; মনে পড়ল, এমনি অন্ধকারে একদিন তিনি সেই মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আজও সেই দিনের মতো অন্ধকার—সেই বাদলার হাওয়া, সেই নিঃশব্দ প্রকাণ্ড সূর্য্যমন্দির; কিন্তু হায়, কোথায় আজ সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, যিনি সেই দুর্দ্দিনে অনাথিনী অভাগিনী সুভাগাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। সুভাগার কালো চোখ থেকে দুটি ফোঁটা জল দুই বিন্দু বৃষ্টির মতো অন্ধকারে ঝরে পড়ল। সুভাগা মন্দিরের সমস্ত দুয়ার বন্ধ কোরে প্রদীপ জ্বালিয়ে ঠাকুরের আরতি করলেন; তারপর কি জানি কি মনে করে সুভাগা সেই সূর্য্যমূর্ত্তির সম্মুখে ধ্যানে বসলেন। ক্রমে সুভাগার দুটি চক্ষু স্থির হয়ে এল, চারিদিক থেকে ঝড়ের ঝন্‌ঝনা, মেঘের কড়মড়ি, ক্রমে যেন দূর হতে বহুদূরে সরে গেল! সুভাগার মনে আর কোনো শোক নেই, কোনো দুঃখ নেই। তাঁর মনের অন্ধকার যেন সূর্য্যের তেজে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। সুভাগা ধীরে ধীরে, ভয়ে ভয়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাছে শেখা সেই সূর্য্য-

মন্ত্র উচ্চারণ করলেন; তখন সমস্ত পৃথিবী যেন জেগে উঠল, সুভাগা যেন শুনতে পেলেন, চারিদিকে পাখীর গান, বাঁশীর তান, আনন্দের কোলাহল! তারপর গুরুগুরু গভীর গর্জ্জনে সমস্ত আকাশ কাঁপিয়ে, চারিদিক আলোয় আলোময় কোরে, সেই মন্দিরের পাথরের দেয়াল, লোহার দরজা যেন আগুনে আগুনে গলিয়ে দিয়ে, সাতটা সবুজ ঘোড়ার পিঠে আলোর রথে কোটি-কোটি আগুনের সমান জ্যোতির্ম্ময় আলোময় সূর্য্যদেব দর্শন দিলেন। সে আলো, সে জ্যোতি মানুষের চোখে সহ্য হয় না। সুভাগা দুই হাতে মুখ ঢেকে বল্লেন—"হে দেব, রক্ষা কর, ক্ষমা কর, সমস্ত পৃথিবী জ্বলে যায়!" সূর্য্যদেব বল্লেন—"ভয় নেই, ভয় নেই। বৎসে, বর প্রার্থনা কর।" বল্‌তে-বল্‌তে সূর্য্যদেবের আলো ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে এল, শুধু একটুখানি রাঙা আভা সধবার সিঁদূরের মতো সুভাগার সিঁথি আলো কোরে রইল! তখন সুভাগা বল্লেন—"প্রভু, আমি পতিপুত্রহীনা বিধবা অনাথিনী, বড়ই একাকিনী, আমাকে এই বর দাও, যেন এই পৃথিবীতে আমায় আর না থাকতে হয়; সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা থেকে-মুক্ত হয়ে আজই তোমার চরণতলে আমার মরণ হোক।" সূর্য্যদেব বল্লেন—"বৎসে, দেবতার বরে মৃত্যু হয় না! দেবতার অভিশাপে মৃত্যু হয়। তুমি বর প্রার্থনা কর! তখন সুভাগা সূর্য্যদেবকে প্রণাম কোরে বল্লেন—"প্রভু, যদি বর দিলে, তবে আমাকে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে দাও, আমি তাদের মানুষ করি। ছেলেটি তোমারি মতো তেজস্বী হবে, মেয়েটি হবে যেন চাঁদের কোণার মতো সুন্দরী।"

সূর্য্যদেব 'তথাস্তু' বোলে অন্তর্দ্ধান করলেন। ধীরে-ধীরে সুভাগার চোখে ঘুম এল, সুভাগা পাষাণের উপর আঁচল পেতে শুয়ে পড়লেন। চারিদিকে ঝম্‌ঝম্‌ কোরে বৃষ্টি নাবল। তখন ভোর হয়ে এসেছে, সুভাগা ঘুমের ঘোরে শুনতে লাগলেন, তাঁর সেই ভাঙা মালঞ্চে দুটি ছোট পাখী কি সুন্দর গান ধরেছে! ক্রমে সকাল বেলার একটুখানি সোনার আলো সুভাগার চোখে পড়ল; তিনি তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন, আঁচলে টান পড়ল, চেয়ে দেখলেন, কচি দুটি ছেলেমেয়ে কোলের কাছে ঘুমিয়ে আছে। সূর্য্যদেবের বর সফল হল;—সুভাগা দেবতার মতো সুন্দর সন্তান দুটি কোলে নিলেন। সকল লোকের চোখের আড়ালে নির্জ্জন মন্দিরে জন্ম হল বলে, সুভাগা দুজনের নাম দিলেন 'গায়েব', 'গায়েবী'।

সুভাগা গায়েব আর গায়েবীকে বুকে নিয়ে মন্দিরের বাইরে এলেন; তখন পূবে সূর্য্যদেব উদয় হচ্ছিলেন, পশ্চিমে চাঁদ অস্ত যাচ্ছিলেন। সুভাগা দেখলেন, গায়েবের মুখে সূর্য্যের আলো ক্রমেই ফুটে উঠতে লাগল, আর গায়েবীর কালো

চুলে চাঁদের জ্যোৎস্না ধীরে ধীরে নিভে গেল। তিনি মনে মনে বুঝলেন, গায়েবীকে এই পৃথিবীতে বেশী দিন ধরে রাখা যাবে না। গায়েব ক্রমশ যখন বড় হয়ে পাঠশালায় যেতে আরম্ভ করলেন, সেই সময় গায়েবী মায়ের কাছে বোসে মন্দিরে কাজকর্ম্ম শিখতে লাগলেন। গায়েব যেমন দুরন্ত দুর্দ্দান্ত, গায়েবী তেমনি শিষ্ট-শান্ত। গায়েবীর সঙ্গে কত ছোট ছোট মেয়ে সেধে সেধে খেলা করতে আসত, কিন্তু গায়েবের উৎপাতে পাঠশালার সকল ছেলে অস্থির হয়ে উঠেছিল। শেষে তারা সকলে মিলে একদিন পরামর্শ করলে—গায়েব আমাদের চেয়ে লেখায়, পড়ায়, গায়ের জোরে সকল বিষয়ে বড়; এস আমরা সকলে মিলে গায়েবকে রাজা করি, আর আমরা তার প্রজা হই; তাহলে গায়েব আর আমাদের উপর অত্যাচার করতে পারবে না। এই বোলে সকলে মিলে গায়েবকে রাজা বোলে কাঁধে কোরে নৃত্য আরম্ভ করলে। গায়েব হাসিখুসিতে সেই সকল ছোট ছোট ছেলের কাঁধে বসে আছেন, এমন সময় একটি খুব ছোট ছেলে বোলে উঠল—"আমি রাজার পুজারী। মন্ত্র পড়ে' গায়েবকে রাজটীকা দেব।" তখন সেই ছেলের পাল গায়েবকে একটা মাটির ঢিপির উপর বসিয়ে দিলে। গায়েব সত্যি রাজার মতো সেই মাটির সিংহাসনে বসে আছেন, এমন সময়, সেই ছোট ছেলেটি তার কপালে তিলক টেনে দিয়ে বল্লে—"গায়েব, তোমার নাম জানি, বল তোমার মায়ের নাম কি? বাপের নাম কি?" গায়েব বল্লেন—"আমার নাম গায়েব, আমার বোনের নাম গায়েবী,—মায়ের নাম সুভাগা। আমার বাপের নাম—কি?" গায়েব জানেন না যে তিনি সূর্য্যদেবের বরপুত্র। নাম বলতে পাল্লেন না, লজ্জায় অধোবদন হলেন, চারিদিকে ছেলের পাল হো-হো হাততালি দিতে লাগল, লজ্জায় গায়েবের মুখ লাল হয়ে উঠল। তখন এক পদাঘাতে সেই মাটির সিংহাসন চূর্ণ কোরে চড়-চাপড়ে ছোট ছেলেদের ফোলাগাল বেশী কোরে ফুলিয়ে, রাগে কাঁপতে-কাঁপতে গায়েব একেবারে দেবমন্দিরে উপস্থিত হলেন। সুভাগা গায়েবীর হাতে পিতলের একটি ছোট প্রদীপ দিয়ে কেমন কোরে সূর্য্যদেবের আরতি করতে হয় শিখিয়ে দিচ্ছিলেন; এমন সময় ঝড়ের মতো গায়েব এসে পিতলের সেই প্রদীপটা কেড়ে নিয়ে টান মেরে ফেলে দিলেন। 'নিরেট পিতলের প্রদীপ পাথরের দেয়ালে লেগে ঝন্-ঝন্ শব্দে চূরমার হয়ে গেল, সেই সঙ্গে সূর্য্যদেবের মূর্ত্তি-লেখা একখানা কালো পাথর সেই দেওয়াল থেকে খসে পড়ল। সুভাগা বল্লেন—"আরে উন্মাদ, কি করলি? সূর্য্যদেবের মঙ্গল-

আরতি ছারখার করে দেবতার অপমান করলি?" গায়েব বল্লেন—"দেবতাও বুঝিনে, সূর্য্যও বুঝিনে; বল, আমি কার ছেলে? না হলে, আজ তোমার সূর্য্যমূর্ত্তি কুণ্ডের জলে ডুবিয়ে দেব।" যদিও প্রকাণ্ড সেই সূর্য্যমূর্ত্তি ভীম এলেও তুলতে পারতেন না, তবু গায়েবের বীরদর্প দেখে সুভাগার মনে হল—কি জানি কি করে! তিনি তাড়াতাড়ি গায়েবের দুটি হাত ধরে বল্লেন—"বাছা, শান্ত হ, স্থির হ, আর সূর্য্যদেবের অপমান করিস নে; পিতার নামে কাজ কি? আমি তোর মা আছি, গায়েবী তোর বোন, আর তোর কিসের অভাব?" গায়েব তখন কাঁদতে-কাঁদতে বল্লেন—"তবে কি মা, আমি নীচ, জঘন্য, অপবিত্র, পথের ধূলো, ভিখারীর অধম?" কথাগুলো তীরের মতো সুভাগার বুকে বাজল, তিনি দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়লেন; মনে মনে ভাবলেন—হায় ভগবান্, কি করলে? এ দুরন্ত ছেলেকে কেমন কোরে বোঝাই, কি বোলে প্রবোধ দিই? গায়েব-গায়েবী নীচ নয়, অপবিত্র নয়, সূর্য্যের সন্তান সকলের চেয়ে পবিত্র, এ কথায় কে বিশ্বাস করবে? সুভাগার সূর্য্যমন্ত্রের কথা একবার মনে হ'ল, কিন্তু যখন ভাবলেন যে, দুইবার মন্ত্র উচ্চারণ করলে নিশ্চয় মৃত্যু—এই কচি বয়সে গায়েব-গায়েবীকে একা ফেলে পৃথিবী ছেড়ে চিরকালের মতো চলে যেতে হবে, তখন তাঁর মায়ের প্রাণ কেঁদে উঠল। সুভাগা বল্লেন—"বাছা, কথা রাখ্, ক্ষান্ত দে, চল্ আমরা অন্য দেশে চলে যাই, সূর্য্যদেবকেই তোদের পিতা বোলে জেনে রাখ্।" গায়েব ঘাড় নাড়লেন, বিশ্বাস হয় না। তখন সুভাগা বল্লেন, "তবে মন্দিরের সমস্ত দরজা বন্ধ কর্ এখনি তোদের পিতাকে দেখতে পাবি, কিন্তু হায়, আমাকে আর ফিরে পাবি না!" সুভাগার দুই চক্ষে জল পড়তে লাগল। গায়েবী বল্লে, "ভাই, মাকে কেন কষ্ট দাও?" গায়েব উত্তর না দিয়ে মন্দিরের সমস্ত দরজা বন্ধ কোরে দিলেন। সুভাগ দুজনের হাত ধোরে সূর্য্যমূর্ত্তির সম্মুখে গিয়ে ধ্যানে বসলেন। এই মন্দিরে একাকিনী সুভাগা একদিন মৃত্যু ইচ্ছা কোরে যে-মন্ত্র নির্ভয়ে উচ্চারণ করেছিলেন, কালসর্পের মতো সেই সূর্য্যমন্ত্র আজ উচ্চারণ করতে তাঁর মায়ের প্রাণে কতই ভয়, কতই ব্যথা! সূর্য্যদেব দর্শন দিলেন, সমস্ত মন্দির যেন রক্তের স্রোতে ভাসিয়ে প্রচণ্ড মূর্ত্তিতে দর্শন দিলেন। সুভাগা বল্লেন—"প্রভু গায়েব গায়েবী কার সন্তান? সূর্য্যদেব একটিও কথা কইলেন না। দেখতে দেখতে সূর্য্যের প্রচণ্ড তেজে ভিখারিণী সুভাগার সুন্দর শরীর জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেল। গায়েবী কেঁদে উঠল, "মা, মা!" গায়েব জিজ্ঞাসা করলেন—



গায়েব সত্যি রাজার মতো সেই মাটির সিংহাসনে বসে আছেন।

"মা কোথায় ?" সূর্য্যদেব কোনই উত্তর করলেন না, কেবল পাষাণের উপর সেই রাশীকৃত ছাই দেখিয়ে দিলেন। গায়েব বুঝলেন—মা আর নেই। রাগে দুঃখে তাঁর চোখে আগুন ছুটল। গায়েব মন্দিরের কোণ থেকে সূর্য্যমূর্ত্তি-লেখা সেই পাথরখানা কুড়িয়ে সূর্য্যদেবকে ফেলে মারলেন। যমরাজের মহিষের মাথাটার মতো সেই কালো পাথর সূর্য্যদেবের মুকুটে লেগে জ্বলন্ত কয়লার মতো একদিকে ঠিকরে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে গায়েব মূর্চ্ছিত হলেন।

অনেকক্ষণ পরে গায়েব যখন জেগে উঠলেন, তখন সূর্য্যদেব অন্তর্দ্ধান করেছেন, মাথার কাছে শুধু গায়েবী বসে আছে। গায়েব জিজ্ঞাসা করলেন—"সূর্য্যদেব কোথায় ?" গায়েবী তখন সেই কালো পাথরখানা দেখিয়ে বল্লে—"ওই লও ভাই আদিত্যশিলা। এই পাথর তুমি যার ওপর ফেলবে, তার নিশ্চয় মৃত্যু। সূর্য্যদেব এটি তোমায় দিয়ে গেছেন, আর বলেছেন তুমি তাঁরই ছেলে, আজ থেকে তোমার নাম হল শিলাদিত্য। তোমার বংশ সূর্য্যবংশ নাম নিয়ে পৃথিবী শাসন করবে, আর তুমি মনে মনে ডাকলেই ওই সূর্য্যকুণ্ড থেকে, সাতটা ঘোড়ার পিঠে সূর্য্যের রথ তোমার জন্যে উঠে আসবে। রথের নাম সপ্তাশ্বরথ! যাও ভাই, সপ্তাশ্বরথে আদিত্যশিলা হাতে পৃথিবী জয় কেরো এস।" গায়েব বল্লেন—"তোকে কোথা রেখে যাব, বোন্ ?" গায়েবী বল্লেন, "ভাই আমাকে এই মন্দিরে বন্ধ রেখে যাও, আমি বাগানের ফল, কুণ্ডের জল খেয়ে জীবন কাটাব। তারপর তুমি যখন রাজা হবে, আমাকে এই মন্দির থেকে রাজবাড়ীতে নিয়ে যেও।"

গায়েব মহা আনন্দে গায়েবীকে সেই মন্দিরে বন্ধ রেখে সাত ঘোড়ার রথে পৃথিবী জয় করতে চলে গেলেন। আর গায়েবী সেই রাশীকৃত ছাই সূর্য্যকুণ্ডের জলে ঢেলে দিয়ে "মা রে! ভাই রে!" বোলে পাষাণের উপর আছাড় খেয়ে পড়ল।

সেইদিন গভীর রাত্রে যখন আকাশে তারা ছিল না, পৃথিবীতে আলো ছিল না, সেই সময় হঠাৎ সেই সূর্য্যমন্দির ঝন্-ঝন্ শব্দে একবার কেঁপে উঠল। তারপর আশি মন কালো পাথরের প্রকাণ্ড সূর্য্যমূর্ত্তিকে নিয়ে, আর ননীর পুতুলের মতো সুন্দরী গায়েবীকে নিয়ে আধখানা মন্দির ক্রমে মাটির নীচে চলে যেতে লাগল। গায়েবী প্রাণভয়ে পালাবার চেষ্টা কল্লে। বৃথা চেষ্টা। গায়েবী দেয়াল ধরে ওঠবার চেষ্টা কল্লে, পাথরের দেয়ালে পা রাখা যায় না, কাচের সমান। তখন গায়েবী "ভাই রে!" বোলে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। তারপর সব শেষ, সব অন্ধকার!

কতদিন চলে গেছে, গায়েব সেই সপ্তাশ্বরথে পৃথিবী ঘুরে দেশবিদেশ থেকে

সৈন্য সংগ্রহ করে রাজ্যের পর রাজ্য জয় কোরে, শেষে বল্লভীপুরের রাজাকে সেই আদিত্যশিলা দিয়ে সম্মুখযুদ্ধে সংহার কোরে শিলাদিত্য নাম নিয়ে, রাজ-সিংহাসনে বোসে, পাঠশালার সঙ্গীদের কাউকে মন্ত্রী, কাউকে বা সেনাপতি কোরে, যত নিষ্কর্ম্মা বুড়ো কর্ম্মচারীদের তাড়িয়ে দিলেন। তারপর হুলুধ্বনি শঙ্খধ্বনির মাঝখানে শিলাদিত্য, চন্দ্রাবতী-নগরের রাজকন্যা পুষ্পবতীকে বিয়ে কোরে, শ্বেতপাথরের শয়ন-মন্দিরে বিশ্রাম করতে গেলেন। ক্রমে রাত্রি যখন গভীর হল, কোনো দিকে সাড়া-শব্দ নেই, পায়ের কাছে চামরধারিণী চামর হাতে ঢুলে পড়েছে, মাথার শিয়রে সোনার প্রদীপ নিভ-নিভ হয়েছে, সেই সময় শিলাদিত্য তাঁর সেই ছোট বোন গায়েবীর কচি মুখখানি স্বপ্নে দেখলেন;—তাঁর মনে হোল যেন অনেক, অনেক দূর থেকে সেই মুখখানি তাঁর দিকে চেয়ে আছে; আর যেন সেই সূর্য্য-মন্দিরের দিকে থেকে কে যেন ডাকছে—"ভাই রে, ভাই রে, ভাই রে!"

শিলাদিত্য চীৎকার কোরে জেগে উঠ্‌লেন। তখন ভোর হয়েছে, তিনি তৎক্ষণাৎ রথে চড়ে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সূর্য্য-মন্দিরে উপস্থিত হলেন; দেখলেন, ভীমের বর্ম্ম-দুখানার মতো মন্দিরের দুখানা কপাট একেবারে বন্ধ;—কতকালের লতাপাতা সেই মন্দিরের দুয়ার যেন লোহার শিকলে বেঁধে রেখেছে। শিলাদিত্য নিজের হাতের সেই লতাপাতা সরিয়ে মন্দিরের দুয়ার খুলে ফেল্লেন;—দিনের আলো পেয়ে একঝাঁক বাদুড় ঝটাপট্ কোরে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। শিলাদিত্য মন্দিরে প্রবেশ কল্লেন; চেয়ে দেখলেন, যেখানে সূর্য্যদেবের মূর্ত্তি ছিল, সেখানে প্রকাণ্ড একখানা অন্ধকার, কালো পর্দ্দার মতো সমস্ত ঢেকে রেখেছে। শিলাদিত্য ডাকলেন—"গায়েবী! গায়েবী! কোথায় গায়েবী?" অন্ধকার থেকে উত্তর এলো—"হায় গায়েবী, কোথা গায়েবী!" শিলাদিত্য মশাল আনতে হুকুম দিলেন; সেই মশালের আলোয় শিলাদিত্য দেখলেন,—উত্তর-দিকটা শূন্য কোরে সূর্য্যমূর্ত্তির সঙ্গে-সঙ্গে মন্দিরের আধখানা যেন পাতালে চলে গেছে; কেবল কালো পাথরের সাতটা ঘোড়ার মুণ্ড বাসুকির ফণার মতো মাটির উপর জেগে আছে। যে ঘরে শিলাদিত্য গায়েবীর সঙ্গে খেলা করেছেন, যে-ঘরে সারাদিন খেলার পর দুই ভাই-বোন্ গুর্জ্জর দেশের গল্প শুন্‌তে-শুন্‌তে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়তেন, যেখানে দেবদারু গাছের মতো পিতলের সেই আরতি প্রদীপ ছিল, সে সকল ঘরের চিহ্নমাত্র নেই; শিলাদিত্য সেই প্রকাণ্ড গহ্বরের মুখে দাঁড়িয়ে ডাকলেন—"গায়েবী! গায়েবী!" তাঁর সেই করুণ সুর, সেই অন্ধকার গহ্বরে ঘুরে-ফিরে ক্রমে দূরে থেকে দূরে, পাতালের মুখে চলে গেল। গায়েব নিঃশ্বাস ফেলে রাজ-মন্দিরে ফিরে এলেন।

সেই দিন রাজ-আজ্ঞায় রাজকর্ম্মকারেরা পুরু সোনার পাত দিয়ে সেই প্রকাণ্ড মন্দির আগাগোড়া মুড়ে দিতে লাগল। শিলাদিত্য সে-মন্দিরে আর অন্য মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করলেন না। সেই অন্ধকার গহ্বর থেকে সূর্য্যের ঘোড়াগুলি যেমন আধখানা জেগেছিল, তেমনিই রইল। তারপর শিলাদিত্য পাহাড় কেটে শ্বেতপাথর আনিয়ে, সূর্য্যকুণ্ডের চারিদিক সুন্দর কোরে বাঁধিয়ে দিলেন! যখনি কোনো যুদ্ধ উপস্থিত হত, শিলাদিত্য সেই সূর্য্যকুণ্ডের তীরে সূর্য্যের উপাসনা করতেন; তখনি তাঁর জন্য সপ্তাশ্বরথ জল থেকে উঠে আসত। শিলাদিত্য সেই রথে যখন যে-যুদ্ধে গিয়েছেন, সেই যুদ্ধেই তাঁর জয় হয়েছে। শেষে একজন বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী, যাকে তিনি সব চেয়ে বিশ্বাস করতেন, সব চেয়ে ভালোবাসতেন, সে-ই তাঁর সর্ব্বনাশ করলে। সেই মন্ত্রী ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ জানত না যে, শিলাদিত্যের জন্য সূর্য্যকুণ্ড থেকে সপ্তাশ্বরথ উঠে আসে।

সিন্ধু-পারে শ্যামনগর থেকে পারদ নামে অসভ্য একদল যবন যখন বল্লভীপুর আক্রমণ করলে, তখন সেই বিশ্বাসঘাতক, তুচ্ছ পয়সার লোভে সেই অসভ্যদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র কোরে গো-রক্তে সেই পবিত্র কুণ্ড অপবিত্র করলে। শিলাদিত্য যুদ্ধের দিন যখন সেই সূর্য্যকুণ্ডের তীরে সূর্য্যের উপাসনা করতে লাগলেন, তখন আগেকার মতো নীল জল ভেদ করে দেবরথ উঠে এল না; শিলাদিত্য সাতটা ঘোড়ার সাতটা নাম ধরে বার-বার ডাকলেন, কিন্তু হায়, কুণ্ডের জল যেমন স্থির তেমনই রইল! শিলাদিত্য হতাশ হয়ে রাজ-রথে শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হলেন, কিন্তু সেই যুদ্ধেই তাঁর প্রাণ গেল! সমস্ত দিন যুদ্ধের পর সূর্য্যদেবের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যের বরপুত্র শিলাদিত্য অস্ত গেলেন। বিধর্ম্মী শত্রু সোনার মন্দির চূর্ণ করে, বল্লভীপুর ছারখার কোরে চলে গেল।

— শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

করুণার জয়

(১)

আমাদের দেশে বীরত্বের আদর্শ খুঁজিতে হইলে, রাজপুতানায় যাইতে হয়। দেশের জন্য, সম্মানের জন্য, স্বাধীনতার জন্য রাজপুতগণ যেমন যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এদেশে তেমন আর কেহ করে নাই। আবার রাজপুতদিগের ইতিহাসে চিতোরের মহারাণা প্রতাপ সিংহের বীরত্বের তুলনা নাই।

দিল্লীর মুসলমান বাদশাহগণ রাজপুতদিগকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদিগের দেশ দখল করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের চেষ্টা প্রথমে ব্যর্থ হইয়াছিল। শেষে সম্রাট্ আকবর ছলে, বলে, কৌশলে রাজপুতদিগকে অধীন করিয়া তাঁহাদিগের সহিত নানা সম্বন্ধ স্থাপন করেন। কেবল চিতোরের মহারাণা প্রতাপসিংহকে তিনি জয় করিতে পারেন নাই; প্রতাপসিংহ রাজধানী ত্যাগ করিয়া অনাহারে অনিদ্রায় সপরিবারে বনে বনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইয়াছিলেন, তথাপি আকবরের অধীনতা স্বীকার করেন নাই।

পর্ব্বতে পর্ব্বতে জঙ্গলে জঙ্গলে প্রতাপ সিংহের সন্ধান করিয়া ও তাঁহার সেনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া, সম্রাট্ আকবরের সেনাগণ যখন ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেছিল, তখন আকবরের এক নূতন শত্রু জুটিল। রঘুপতি সিংহ নামক একজন রাজপুত কতকগুলি লোক লইয়া একটি দল গঠন করিল। তাহারা সম্মুখ সংগ্রামে মোগল সেনাদিগের সহিত পারিয়া উঠিত না বটে; কিন্তু সুবিধা পাইলেই তাহাদিগকে নানাপ্রকারে জ্বালাতন করিতে ছাড়িত না।

আকবর অনেক চেষ্টা করিয়াও রঘুপতিকে ধরিতে পারিলেন না। যে গ্রামে রঘুপতির গৃহ, সে গ্রামে মোগল-সেনার ঘাটি বসিল, একজন সৈনিক সর্ব্বদাই রঘুপতির গৃহদ্বারে বসিয়া থাকিত,—যদি কোন দিন রঘুপতি গৃহে আসে, তবে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে।

রঘুপতি এ সংবাদ পাইল। সে আর গৃহে আসিত না। অন্যান্য লোকের নিকট বাড়ীর সকলের সংবাদ লইত ও তাহাদিগকে দিয়া আপনার সংবাদ পাঠাইত। সে পর্ব্বতে পর্ব্বতে বনে বনে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য মোগল-সেনাদের যথাসম্ভব অনিষ্ট করিতে লাগিল।

এমনই ভাবে দুই তিন মাস গেল। এমন সময় রঘুপতির একমাত্র পুত্রের বড় পীড়া হইল।

(২)

লোকমুখে রঘুপতি পুত্রের পীড়ার সংবাদ পাইল, ভাবিল, সামান্য পীড়া দুদিনে সারিয়া যাইবে। কিন্তু রঘুপতি পুত্রকে বড় ভালবাসিত—তাহাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হইল। রঘুপতি মনের ইচ্ছা মনেই রাখিল।

এদিকে রঘুপতির পুত্রের পীড়া সারিল না। সে সংবাদ পাইতে লাগিল,—পুত্র ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। এমনই অবস্থায় প্রায় একমাস কাটিয়া গেল। শেষে রঘুপতি আর স্থির থাকিতে পারিল না—ভাবিল, "যাহা হয় হউক, আমি পুত্রকে দেখিতে যাইব।"

সেইদিন সন্ধ্যাকালে রঘুপতি ধীরে ধীরে আপনার গ্রামে প্রবেশ করিল। দূর হইতে আপনার গৃহের আলোক দেখিয়া তাহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

রঘুপতি আপনার গৃহদ্বারে উপনীত হইল। দ্বারেই প্রহরী বসিয়াছিল, রঘুপতিকে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?" রঘুপতি উত্তর দিল, "আমি রঘুপতি।" প্রহরী বলিল, "তোমাকে গ্রেপ্তার করিবার হুকুম আছে।" রঘুপতি বলিল, "আমি তাহা জানিয়াই আসিয়াছি। আমার পুত্রের বড় পীড়া, আমি একবার তাহাকে দেখিয়া আসিব। তুমি আমার কথায় বিশ্বাস কর, আমি আসিয়া ধরা দিব।"

কেন জানি না, প্রহরী তাহাকে যাইতে দিল।

রঘুপতি দ্রুতপদে গিয়া পুত্রের ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরে মিট্‌মিট্ করিয়া একটা দীপ জ্বলিতেছে, আর পীড়িত পুত্রের শিয়রে বসিয়া তাহার মাতা তাহার মস্তকে হাত বুলাইয়া দিতেছেন। সহসা পিতাকে দেখিয়া পুত্র উঠিয়া বসিল। রঘুপতি তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার মুখ-চুম্বন করিল।

তাহার পর পুত্রের চিকিৎসা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া রঘুপতি আবার পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

রঘুপতির পত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কোথায় যাইবে?" রঘুপতি বলিল, "প্রহরীকে বলিয়া আসিয়াছি যে, পুত্রকে দেখিয়া যাইয়া ধরা দিব। আমি ধরা দিতে যাইতেছি।"

রঘুপতির পত্নী বলিলেন, "তুমি পশ্চাতের দ্বার দিয়া পালাও। প্রহরীর নিকট ধরা দিলে তোমাকে নিশ্চয়ই হত্যা করিবে।"

রঘুপতি স্থিরস্বরে উত্তর করিল,—"রাজপুত কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না। মৃত্যুতে এত ভয় থাকিলে, দেশের স্বাধীনতার জন্য এত যুদ্ধ করিতে যাইতাম না। আমি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিব।"

রঘুপতি চলিয়া গেল। রঘুপতির পত্নী অঞ্চলে চক্ষের জল মুছিলেন।

(৩)

রঘুপতি আসিয়া দেখিল, প্রহরী কাঁদিতেছে। রঘুপতি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আমি আসিয়াছি, আমাকে ধর।"

প্রহরী মুখ তুলিল—বলিল, "পলাও! পলাও! আমারও পুত্র আছে। আমিও গৃহে পীড়িত পুত্র রাখিয়া এই ছয় মাস এখানে আসিয়াছি। সন্তানের জন্য পিতার মন কিরূপ ব্যাকুল হয়, আমি তাহা জানি। আমি তোমাকে ধরিব না, পলাও!"

প্রহরীর কথা শুনিয়া রঘুপতির নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। কম্পিত কণ্ঠে সে বলিল, "তুমি আমাকে লৌহ-শৃঙ্খলে বন্দী করিলে না বটে, কিন্তু স্নেহে বন্দী করিলে। তোমার এ করুণার ঋণ কখনও ভুলিতে পারিব না। যদি কখনও আবশ্যক হয়, তবে এ রাজপুতকে স্মরণ করিও।"

সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে রঘুপতি অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন পাহারা বদলের সময়। অপর প্রহরী আসিয়া নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল, অন্ধকারে রঘুপতি বা প্রহরী কেহই তাহাকে লক্ষ্য করে নাই।

সে ঘাটিতে ফিরিয়া অধ্যক্ষকে সকল কথা বলিয়া দিল। কর্ত্তব্য অবহেলার জন্য প্রহরী বন্দী হইল। সকলে আশঙ্কা করিতে লাগিল যে, প্রহরীর প্রাণদণ্ড হইবে।

(৪)

প্রহরী বন্দী হইয়াছে শুনিয়া রঘুপতি আপনি মোগল-সেনার ঘাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। অধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সে বলিল, "আমি রঘুপতি সিংহ। আমাকে না ধরাতেই প্রহরী বন্দী হইয়াছে, আমি ধরা দিতে আসিয়াছি, আমাকে বন্দী করিয়া প্রহরীকে ক্ষমা করুন।"

তাহাকে বন্দী করিয়া অধ্যক্ষ বলিলেন, "প্রহরী নির্ব্বোধ, তাই সেদিন সে তোমাকে না ধরিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল, আর তুমি তাহার অপেক্ষাও নির্ব্বোধ, তাই

তুমি আজ শত্রু-শিবিরে ধরা দিতে আসিয়াছ। তাহার অপরাধের জন্য প্রহরী ত শাস্তি পাইবেই, অধিকন্তু তুমিও দণ্ড পাইবে।"

রঘুপতি হাসিমুখে কারাগৃহে গেল।

*   *   *   *   *

ইহার পর রঘুপতি ও প্রহরীর বিচার হইল; বিচারে উভয়েরই প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। যে দিন তাহাদের প্রাণদণ্ডের কথা ছিল, সেই দিন প্রভাতে অধ্যক্ষের আদেশে দুইজন করিয়া প্রহরী রঘুপতিকে ও সেই প্রহরীকে শিবিরের সম্মুখে খোলা ময়দানে আনিয়া দাঁড় করাইল। সেনাগণ সেই বধ্যভূমি ঘিরিয়া দাঁড়াইল; তাহাদের কাহারও মুখে হাসি নাই। প্রহরীর মুখ বিবর্ণ, রঘুপতি স্থির।

সকলে নিয়মিত স্থানে দাঁড়াইলে, ভেরী বাজিয়া উঠিল; তাহার পর রণবাদ্য বাজিল। জাঁকাল পোষাকে সজ্জিত হইয়া সেনাধ্যক্ষ বধ্যভূমিতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ পোষাক যাহাতে ভূমিতে না লুটায়, সেইজন্য দুই জন ভৃত্য তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে পোষাক ধরিয়া আসিতেছিল। সৈনিকগণ তরবারী তুলিয়া অধ্যক্ষকে সেলাম করিল।

সেনাগণকে সম্বোধন করিয়া অধ্যক্ষ বলিলেন, "সেনাগণ তোমরা বাদশাহের কার্য্য করিয়া থাক। যে তাঁহার নুন খাইয়া নিমক হারামি করে, তাহার কি শাস্তি?" পার্শ্বে কাজি দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "প্রাণদণ্ড।" অধ্যক্ষ বলিলেন, "প্রাণদণ্ডই তাহার উপযুক্ত দণ্ড। এই প্রহরী শত্রুকে হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। এখানে আমিই ভারত-সম্রাট্ দিল্লীশ্বর আকবর শাহের প্রতিনিধি। আমার আদেশে আজ প্রহরীর মাথা কাটা যাইবে। ইহার স্বপক্ষে তোমাদের কাহারও কিছু বলিবার আছে?"

কেহ কোন কথা কহিল না, সকলে নত-দৃষ্টি হইয়া রহিল। একজন ঘাতুক যাইয়া প্রহরীর পশ্চাতে দাঁড়াইল। প্রহরী কাঁপিতে লাগিল।

তাহার পর অধ্যক্ষ বলিলেন, "এদেশ ভারত-সম্রাট্ আকবর শাহের; যে তাঁহার অধিকার অস্বীকার করে, তাঁহার সেনাদিগের সহিত যুদ্ধ করে, তাঁহার দেশ-মধ্যে ডাকাতি করে, সে অপরাধীর উপযুক্ত দণ্ড কি?" কাজি কহিলেন, "প্রাণদণ্ড।" অধ্যক্ষ কহিলেন, "প্রাণদণ্ডই তাহার উপযুক্ত দণ্ড। রঘুপতি সেই সকল অপরাধে অপরাধী। এখানে আমিই ভারত-সম্রাট্ দিল্লীশ্বর আকবর শাহের প্রতিনিধি। আমার আদেশে আজ রঘুপতি সিংহের মাথা কাটা যাইবে। ইহার স্বপক্ষে তোমাদের কাহারও কিছু বলিবার আছে?"

কেহ কোন কথা কহিল না। একজন ঘাতুক যাইয়া রঘুপতির পশ্চাতে দাঁড়াইল। রঘুপতি স্থির।

আবার রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। অপরাধী দুইজনের মাথা কাটিবার জন্য ঘাতুকদ্বয় তরবারি তুলিল, নবোদিত সূর্য্যের আলোকে তাহাদের তরবারি ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল।

(৫)

এমন সময় দূরে অশ্ব-ক্ষুরোত্থিত শব্দ শ্রুত হইল। সকলে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, একজন অশ্বারোহী ঝড়-বেগে অশ্ব ছুটাইয়া সেইদিকে আসিতেছে। দূরে অশ্বারোহীকে চেনা যাইতেছে না, কিন্তু দেখা যাইতেছে, তাহার উষ্ণীষে রত্নরাজি রবিকরে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে।

দেখিতে দেখিতে অশ্বারোহী সেখানে আসিয়া উপনীত হইলেন। অশ্ব বধ্যভূমিতে প্রবেশ করিতে না করিতে, অশ্বারোহী লাফাইয়া পড়িলেন। সকলে দেখিল—আকবর শাহ; সেনাগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। অশ্ব বহুদূর হইতে ঝড়-বেগে আসিয়াছিল। ভূমিতলে পতিত হইয়া, দুইবার কাতর ভাবে চীৎকার করিয়া অশ্ব প্রাণত্যাগ করিল।

আকবর শাহ ঘাতুকদ্বয়কে সরিয়া যাইতে আজ্ঞা করিলেন, তাহারা সরিয়া গেল। তখন প্রহরীকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, "তোমার ভয় নাই, আমি মানুষ দেখিয়া সৈনিক করি। যাহার স্নেহ, মমতা, দয়া নাই, সে মানুষ নহে, রাক্ষস। যে মানুষ নহে, সে ভাল সৈনিক হইতে পারে না। দয়াই সৈনিকের প্রধান ধর্ম্ম। তোমার দলের সকলে তোমাকে ভালবাসে। তাহারাই আমার নিকট তোমার সকল কথা জানাইয়াছে। আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। তোমার চাকরী বাহাল রহিল।"

আনন্দে প্রহরী আর কথা কহিতে পারিল না। সে ভূমিতলে পড়িয়া বাদশাহের মণিমুক্তা খচিত পাদুকা চুম্বন করিল।

তখন রঘুপতিকে সম্বোধন করিয়া বাদশাহ বলিলেন, "রাজপুত, তুমি প্রকৃত বীর। আকবর শাহ বীরত্বের আদর করিতে জানেন। আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। যদি আমার সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে দস্যুদল গঠন না করিয়া প্রতাপসিংহের সেনাদলে প্রবেশ করিও।"

রঘুপতি ভূমিতলে জানু পাতিয়া বলিল, "বাদশাহ, আজ আপনারই জয় হইল।

আপনার মত উদার-হৃদয় শত্রুর বিরুদ্ধে আর আমি অস্ত্র ধারণ করিব না। আপনার সেনাদল আমাকে পরাভূত করিতে পারে নাই, আপনার করুণা আমাকে জয় করিল। আজ আপনার করুণারই জয় হইল।

—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

আয় আয় চাঁদামামা

রতনের মনটা আজ ভারী খারাপ হোয়ে আছে। সকাল বেলা সে পাড়ায় খেলতে গিয়েছিল, সেখান থেকে ফিরে এসে অবধি সে আর মাকে দেখতে পাচ্ছে না। ঠাকুরমা বলছেন—মা মামার বাড়ীতে গিয়েছে—দু-দিন বাদেই ফিরে আসবে মা।

কথাটা কিন্তু রতনের মোটেই ভাল লাগছে না। মা তো তাকে ফেলে কোথাও যায় না। মায়ের উপর অভিমানে তার চোখে জল এসে গেল। ঠাকুরমার পিঠে দুম্ দুম্ কোরে দুই কীল বসিয়ে দিয়ে সে বল্লে—কেন তুমি যেতে দিলে?

ঠাকুরমা কোনো রকমে চোখের জল চেপে বল্লেন—পাগ্‌লা ছেলে, দু-ঘণ্টা মাকে ছেড়ে থাকতে পারিস্ না—

রতন চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল—আমাকে মামার বাড়ী নিয়ে চল।

কান্না শুনে রতনের বাবা এসে জিজ্ঞেসা করলেন—কি হয়েছে, বাবা?

রতন কাঁদতে কাঁদতে বল্লে—আমি মার কাছে যাব!

বাবা কোনো কথা না বোলে মুখ গম্ভীর কোরে চলে গেলেন।

দু দিন পরে- তিন দিনের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই রতন জিজ্ঞাসা করলে—মা এসেছে?

ঠাকুরমা বল্লেন—এতদিন পরে বাপের বাড়ী গেছে; বোধ হয়, ও-বেলা আসবে।

রতন চেঁচিয়ে-মেচিয়ে বাড়ী মাথায় কোরে তুল্লে—আমি খাব না—নাখো

না—কিচ্ছু করব না। ঠাকুরমা বল্লেন—লক্ষ্মী বাবা, ও-রকম করে না ও-বেলা দেখো সে ঠিক এসে হাজির হবে; তোমাকে কত আদর করবে।

রতন বল্লে—আমি তোমার সঙ্গে কথা ক'ব না।

ঠাকুরমা বল্লেন—সেই ঠিক—তা হোলেই সে বেশ জব্দ হবে।



ঠাকুরমা ও রতন

কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে রতন আবার বল্লে—ও-বেলা যদি না আসে?

ঠাকুরমা বল্লেন—ঠিক আসবে রে পাগ্‌লা—ঠিক আসবে।

ও-বেলা খেলা শেষ কোরে বাড়ী ফিরে যখন দেখলে মা তখনো আসে নি, তখন রতন মহা হাঙ্গামা সুরু কোরে দিলে। খাবারের থালা ছুঁড়ে, কাপড় ছিঁড়ে সে চীৎকার কোরে কাঁদতে লাগল। তার বাবা, ঠাকুরমা, পুরোনো দাস-দাসী কেউ থামাতে পারে না।

ঠাকুরমা বল্লেন—চল রতন, আমরা আজ ছাতে গিয়ে শুই।

ছাতটা ছিল রতনের কল্পরাজ্য। তার মা গ্রীষ্মের সময় মাঝে মাঝে ছাতে গিয়ে শুতেন। নিঃসীম নীল আকাশের নীচে শুয়ে ওপরের তারাগুলো সম্বন্ধে কত রকমের অদ্ভুত প্রশ্ন তুলে মাকে সে ব্যতিব্যস্ত কোরে তুলত। মা বিরক্ত হোয়ে বলতেন—আর পারি না বাপু তোর সঙ্গে বকতে—এবার ঘুমো। তার পরে তার মাথা চাপড়ে গান ধরতেন—আয় আয় চাঁদামামা আয় আয় আয়রে—।

রতনের শিশু-মন তারার দেশের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা করতে লেগে যেত—তারপরে কখন্ ঘুমের কোলে ঢলে পড়ত জানতেও পারত না।

কিন্তু রতনের বাবা তাদের এই ছাতে শোওয়া মোটেই পছন্দ করতেন না বোলে ইচ্ছে থাকলেও রোজ সেখানে যাওয়া চলত না। ঠাকুরমা সেদিন ছাতে শোবার কথা তুলতেই রতন মার কথা ভুলে গিয়ে বল্লে—চল তা হোলে—এক্ষুনি চল।

ছাতে গিয়ে মাদুরে শোবার একটু পরেই রতন আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে—মা কেন এল না ঠাকুরমা? রতনের গলায় কান্নার সুর তখনো জড়িয়ে রয়েছে।

ঠাকুরমা কোনো উত্তর দিলেন না দেখে রতন চুপ কোরে কি ভাবতে লাগল। টপ্ কোরে এক ফোঁটা ঠাণ্ডা জল তার হাতে পড়তেই সে মুখ তুলে দেখলে ঠাকুরমার চোখে জল টল্‌টল্ করছে। তাঁর চোখে রতনের চোখ পড়তেই তিনি মুখটা ফিরিয়ে চোখের জল মুছে বল্লেন—ঘুমোও তো লক্ষ্মী—

রতন কোনো কথা না বোলে চোখ দুটো বুজিয়ে ফেল্ল। ঠাকুরমা তার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে গুণ গুণ কোরে গাইতে আরম্ভ করলেন—আয় আয় চাঁদামামা—

ঠাকুরমার মুখে এই ঘুমপাড়ানি গান সে আজন্ম শুনে আসছে কিন্তু আজ তাঁর কণ্ঠের করুণ সুর তার শিশু-হৃদয় যেন তোলপাড় কোরে তুলতে লাগল। তার মনে হোতে লাগল, এই সুরের সঙ্গে তার মার চলে যাওয়ার যেন অতি নিকট সম্বন্ধ আছে। সে তাড়াতাড়ি উঠে বসে বল্লে—চাঁদামামার গান গেও না ঠাকুমা—ভারী দুষ্টু ও—মাকে আসতে দেয় না।

ঠাকুরমা হট্টমালার গান সুরু করলেন। হট্টমালার পর ঘুমপাড়ানি; তারপর কখন্ যে আবার চাঁদামামার গান ধরে ফেলেছেন তা নিজেই জানতে পারেন নি। হঠাৎ রতনের কথা মনে পড়তেই তিনি মাথা নীচু কোরে দেখলেন, সে ঘুমিয়ে পড়েছে—তার চোখের এককোঁটা জল গাল বেয়ে ধীরে ধীরে বালিশের দিকে গড়িয়ে চলেছে।

রতনের মা তার পরের দিনও এলেন না, তার পরের দিনও না। মোট

কথা, তিনি আর কোনো দিনই এলেন না। রতন বড় হোতে লাগল। মাতৃহীন এই পৃথিবীকে সে মনে মনে স্বীকার না করলেও সেটা তার সহ্য হোয়ে গেল। ক্রমে সে বুঝতে পারলে, তার মা যে-মামার বাড়ীতে গিয়েছেন সে-মামার বাড়ীতে একবার গেলে আর কোনো মা-ই ফিরে আসেন না। মার কথা তুলে আর সে ঠাকুরমাকে মারে না, জ্বালাতন করে না। প্রতিবেশিনীরা ঠাকুরমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। সেখানে মার কথা উঠলেই সেখান থেকে সে সরে যায়। তারপরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গ্রামের ধারে যে প্রকাণ্ড বিল আছে তারই ধারে গিয়ে বসে। মন তার চলে যায় বিলের ওপারে সেই না-জানা না-দেখা পল্লীর মধ্যে। সন্ধ্যা অবধি সেখানে বসে থেকে বাড়ীতে ফিরে আসে। ঠাকুরমা জিজ্ঞাসা করলে কিছু বলে না।

এমনি কোরে রতনের দিন কাটে। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সংসারে অনেক পরিবর্ত্তন হোতে লাগল। তার ঠাকুরমা মারা গেলেন। তার মায়ের বদলে একজন নতুন মা এলেন। তাকে ইস্কুলে গিয়ে ভর্ত্তি হোতে হোল। সেখানে সে অনেক বন্ধু পেলে। কিন্তু সব সুখ-দুঃখ হাসি-অশ্রুর মধ্যে সেই তার ছেলে-বেলার হঠাৎ পালিয়ে যাওয়া মার কথা মাঝে মাঝে তাকে আকুল কোরে তুলত।

ইস্কুলে রতন পড়াশুনা ভাল পারে না, সেখানে মাষ্টারেরা মারে। বাড়ীতে পড়ার জন্য বাবার কাছে বকুনি আর নতুন মার গঞ্জনা সইতে হয়। সে এত চেষ্টা করে কিন্তু পড়া দেবার সময় কিছু মনে থাকে না। এই দুঃখের মধ্যে থেকে থেকে সে যেন হারিয়ে যাওয়া মায়ের আহ্বান শুনতে পায়। কোথায় কোন্ অজানা দেশ থেকে মা যেন ডাকছে—সেখানে গেলে আর কোনো কষ্টই থাকবে না।

একদিন, সেদিন ইস্কুলে ও বাড়ীতে পড়ার জন্য রতনকে খুব মারধর করায়, তার মনটা ভারী খারাপ হোয়ে আছে। বিকেলে সে খেলতে না গিয়ে গ্রামের পারে সেই বড় বিলের ধারে গিয়ে বসল। এইখানে বসে নানা কথা ভাবতে ভাবতে তার মাথায় এক খেয়াল চাপল। সে ভাবতে লাগল কারুকে না জানিয়ে যদি এখান থেকে সোজা কলকাতায় চলে যায় তাহোলে কেমন হয়। সেখানে পড়ার জন্য তাড়া দেবার কেউ নেই, ইস্কুলের মাষ্টারদের তাড়া নেই। বাবার প্রহার কিংবা নতুন মার গঞ্জনা নেই। এই মুক্তির কল্পনাতেই সে বর্ত্তমানের সব দুঃখ ভুলে গেল। কিছুদিন আগে পৈতের সময় সে গোটা কয়েক টাকা পেয়েছিল। টাকাগুলো পাছে হারিয়ে যায় এই ভয়ে সেগুলো সে সঙ্গেই রাখত। একবার পকেট থেকে টাকাগুলো বের কোরে দেখে নিয়ে সে সোজা ষ্টেশনের দিকে ছুটল। তারপর একখানা কলকাতার টিকিট কিনে একেবারে গাড়ীতে চেপে বসল।

হুস্ হুস্ শব্দ কোরে রেলগাড়ী ষ্টেশন ছেড়ে দিতেই রতনের বুকের মধ্যে কে যেন হাততালি দিয়ে উঠল—মুক্তি—মুক্তি।

কলকাতায় রতনের প্রায় দশ বছর কেটে গেল। এর মধ্যে কত জায়গায় সে কাজ করলে, কত দিন তার না খেয়ে কাটল, কত বার কত বিপদের মধ্যে পড়ে আবার সে বেঁচে গেল। শেষকালে একটি দয়ালু লোক তাকে রাস্তা থেকে ডেকে নিয়ে তাঁর বাড়ীতে আশ্রয় দিয়ে তাঁর আফিসে একটা চাকরী দিয়েছিলেন। অতি সামান্য কাজ থেকে উন্নতি কোরে এখন তার ত্রিশ টাকা মাইনে হয়েছে। সে আলাদা একটা ঘর ভাড়া কোরে থাকে, নিজেই রান্না কোরে খায়। এর মধ্যে একবারও সে বাড়ী যায় নি, বাড়ীর কোন খোঁজই সে রাখে না, বাড়ীতেও তার কোন খোঁজ করে না। দশ বছর আগেকার পাড়াগেঁয়ে সেই কিশোর রতন আজ যুবক।

একদিন রতন আফিস থেকে দিন কয়েকের ছুটি নিয়ে তাদের বাড়ীমুখো রেলগাড়ীতে চেপে বসল। কলকাতা থেকে তাদের বাড়ী বেশী দূরে নয়। ঘণ্টা কয়েক পরেই গ্রামের কাছে স্টেশনে সে গাড়ী থেকে নেমে বাড়ীর দিকে পা চালিয়ে দিলে। বাড়ীর কাছে এক জায়গায় তাদের ছেলেবেলাকার বিজয়-কাকা গাছের তলায় বসে ডাব কাটছিলেন। তাকে দেখে রতন ডাক দিলে—বিজয়-কা—

বিজয়-কাকা মুখ তুলে অবাক্ হোয়ে রতনকে দেখতে লাগলেন। রতন বল্লে—চিনতে পাচ্ছেন না! আমি রতন।

বিজয়-কাকা অবাক্ হোয়ে বল্লেন—আরে রতন! এতদিন কোথায় ছিলি? চ' চ' বাড়ীর ভেতরে—।

রতনকে ধোরে বিজয়-কাকা বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গেলেন। রতন বল্লে—আর এক সময় আসব কাকা—এখনো বাড়ী যাই নি—আগে দেখাটা কোরে আসি।

বিজয়-কাকা রতনের হাত ধোরে জোর কোরে বসিয়ে বল্লেন—কার সঙ্গে দেখা করবি?

রতন শুনলে তাদের বাড়ীর কেউ আর নেই। কয়েক বছর উপরি উপরি ম্যালেরিয়ার মড়কে তার বাপ-মা দুজনেই মারা গিয়েছেন। গ্রামের অধিকাংশ লোকই নেই। তার একটি বোন আছে। তুলসী মুখুজ্জেরা তাকে নিয়ে গিয়ে রেখেছে। পিতৃমাতৃহীনা নিরাশ্রয়া সেই মেয়েটাকে ভারী কষ্ট দেয় ওরা ইত্যাদি।

না জানা, না দেখা, এই নিরাশ্রয়া বোনটির প্রতি মমতায় রতনের মন পূর্ণ হোয়ে উঠল। সে বল্লে—আমার বোন! কি নাম তার বিজয়-কা—?

বিজয় কাকা বল্লেন—তাকে খেন্তি বলে ডাকে। নামটাম হয় নি বোধ হয়।

বিজয়-কাকার ওখান থেকে রতন তখুনি তুলসী মুখুজ্জেদের বাড়ীতে ছুটল। তারা রতনকে চিনতে পেরে বল্লে, তোমার বোনকে তুমি নিয়ে যাও বাবা—তুমি পয়সা রোজগার করছ, বোনটিকে পরের বাড়ীতে ফেলে রাখা উচিত হয় না।

রতন বল্লে—কোথায় সে, তাকে একবার ডাকুন না।

মুখুজ্জে-বাড়ীর মধ্যে সোরগোল পড়ে গেল—খেন্তি—খেন্তি—ওরে খেন্তি তোর দাদা এসেছে—

খেন্তি এসে তার দাদাকে প্রণাম করলে। রতন মুখ তুলে দেখলে বছর ছয় সাত বয়স তার, রংটা ফর্সা বটে কিন্তু অযত্নে ও রোগে সে রং ফ্যাকাশে হোয়ে গেছে। চোখ দুটো অত্যন্ত করুণ। পরণে একখানা শত তালি দেওয়া ময়লা শাড়ী; হাত দুটো হলুদ বাটায় হলদে হোয়ে আছে।

রতনকে দেখবার জন্য মুখুজ্জেবাড়ীর লোকেরা তার চারিদিকে ভীড় কোরে এসে দাঁড়িয়েছিল। তারা সবাই সরে যেতে রতন বোনটিকে কাছে ডাকলে। খেন্তি অতি সন্তর্পণে এগিয়ে এসে তার কাছে বসল। রতন জিজ্ঞাসা করলে—আমি তোমার কে হই, জান?

খেন্তি ঘাড় নেড়ে জানালে যে সে জানে।

রতন তাকে কি প্রশ্ন করবে ভাবছে এমন সময় খেন্তি তার ম্লান করুণ চোখ দুটি তুলে বল্লে, দাদাভাই, আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যাবে?

সংসারে স্নেহের আহ্বান কাকে বলে সে কথা রতন এক রকম ভুলেই গিয়েছিল। হঠাৎ এতদিন পরে তার এই দুঃখী অচেনা বোনটির মুখে 'দাদাভাই' ডাক শুনে তার চোখে জল এসে গেল। তার মনে পড়ল এই রকম বয়সেই সে তার মাকে হারিয়েছিল। মাকে হারালেও সে স্নেহ থেকে একেবারে বঞ্চিত হয় নি। তার ঠাকুরমা ছিলেন, তার বাবা ছিলেন—কিন্তু এ বেচারীর কেউ নেই।

বোনটিকে সে সস্নেহে জড়িয়ে ধোরে বল্লে—নিয়ে যাব বৈকি ভাই। আমার বোন তুমি—তুমি কেন পরের বাড়ীতে থাকবে। এরা তোমায় বড় কষ্ট দেয়—না?

খেন্তি চারিদিক্ চেয়ে আস্তে আস্তে বল্লে—হ্যাঁ।

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় রতন খেন্তিকে নিয়ে কলকাতায় চলে এল।

রতনের একলার অ-গোছাল সংসার খেন্তি দু-দিনেই ধুয়ে-মুছে ঝক্‌ঝকে কোরে তুল্লে। রতন বল্লে—খেন্তি কি বিচ্ছিরি নাম, তোমাকে রেবা বলে ডাকব।

রেবা নামটা খেন্তির অদ্ভুত লাগল। সে জিজ্ঞাসা করলে—রেবা মানে কি দাদাভাই?

ও একটা নদীর নাম। পছন্দ হয়েছে নামটা ?

খেন্তি ঘাড় নেড়ে জানালে—হয়েছে।

এতদিন পরে রতনের একটা অবলম্বন জুটল। আফিস থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে রেবাকে নিয়ে সে পড়তে বসে। রেবা কি খেতে ভালবাসে, কোন জিনিষ তার সহ্য হয় না—কি পাড়ের শাড়ী তার পছন্দ। রতনের মনে হয় বোনটিকে অনেক রকমের গয়না দিয়ে সাজায় কিন্তু অল্প মাইনে, বাড়ী ভাড়া আর খেতেই কুলোয় না। তবুও সে ওরি মধ্যে পয়সা জমিয়ে দু-একখানা গয়না রেবাকে কোরে দিলে। ছুটির দিনে তাকে নিয়ে সে বেড়াতে বেরোয়। কোন দিন যাদুঘর, কোন দিন চিড়িয়াখানা। তাকে কত রকমের গল্প বলে।

রেবা রান্না করে, কাপড় কাচে। রতন একটু কম খেলে সে মুখ ফুলিয়ে বলে, এমন করলে ক'দিন শরীর টেঁকবে! রতন তার কথা শোনে আর মনে মনে হাসে, ভাবে, যেদিন না খেতে পেয়ে পথে পথে ঘুরে মরছিলুম সেদিন কোথায় ছিলি রে পাগ্‌লী! সবার অগোচরে এই দুটি ভাই-বোনের মনের সুখে দিন কাটতে লাগল।

যাঁদের বাড়ীতে রতন ঘর ভাড়া কোরে থাকত তাঁরা বড় ভাল লোক। দুটি ভাই-বোনকে তাঁরা নিজের ছেলেমেয়ের মত স্নেহ করতেন। একদিন বাড়ীর কর্ত্তা রতনকে ডেকে বল্লেন—এবার রেবা-মা'র বিয়ের ব্যবস্থা কর—কত দিন আর বিয়ে না দিয়ে রাখবে ?

তাই ত! তাকে ছেড়ে রেবাকে যে আর একজনের সংসার করতে চলে যেতে হবে—এ কথা রতনের কল্পনাতে কখনো উদয় হয় নি। কথাটা ভেবে রতন একেবারে দমে গেল।

রেবার বিয়ে হোয়ে গেল। বিদেশে চাকরী করে সে, বেশ জোয়ান ছেলে। বিয়ের পরে কাঁদতে কাঁদতে রেবা স্বামীর ঘর করতে চলে গেল। রতন অতি কষ্টে চোখের জল চেপে তাকে বিদায় দিয়ে ফিরে এসে বিছানার ওপরে লুটিয়ে পড়ল।

আবার সেই পুরোনো দিনের মত অ-গোছাল সংসার ঠেলে রতনের দিন কাটতে লাগল। খাওয়া দাওয়া, নাওয়া শোওয়া, আফিসে যাওয়া আসা কোনো কাজেই তার উৎসাহ নেই, প্রতিপদেই রেবার অভাব। কাজের ফাঁকে থেকে থেকে যেন সে রেবার ডাক শুনে চম্‌কে ওঠে—দাদাভাই। তখুনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে হতাশ হয়ে ভাবে—কোথায় কত দূরে সে স্বামীর ঘর করছে, এখানে সে আসবে কি কোরে!

রেবা চলে যাবার পর প্রথম প্রথম তাকে সপ্তাহে দু-খানা কোরে চিঠি লিখত।

তার পরে মাসে একখানা, তার পরে তাও কমে এল—এখন দুই মাসেও একখানা আসে না। রতন ভাবে চিঠি না লিখুক—সে ভাল থাকুক, সুখে থাকুক—আহা বেচারা বড় কষ্ট পেয়েছে!

সেদিন কিসের একটা ছুটি ছিল। সকাল বেলা শরীরটা ম্যাজ্ ম্যাজ্ করছিল বোলে রতনের আর বিছানা থেকে উঠতে ইচ্ছা করছিল না। আফিসে যাবার তাড়া নেই, তাই আরও কিছুক্ষণ গড়িয়ে নেওয়া যাক মনে কোরে সে এপাশ ওপাশ করতে করতে ভাবছিল—রেবা থাকলে এতক্ষণ সে কত তাড়াই না লাগাতো। শরীর খারাপ লাগছে শুনলে তো আর কথাই নেই। কবে কি অনাচার করার ফলে শরীর খারাপ হয়েছে তাই নিয়ে সে বকাবকি সুরু কোরে দিত। রেবার সেই আদর আব্দার ও শাসনের কথা ভাবতে ভাবতে রতনের একটু তন্দ্রা এসেছে এমন সময় একটা অতি পরিচিত সুর যেন তার কানে ভেসে এল—দাদাভাই।

রতন ধড়মড় কোরে বিছানা ছেড়ে উঠে বসল। একবার মনে হোলো হয় ত ভুল শুনেছে। কিন্তু তখুনি আবার সেই ডাক—দাদাভাই।

—কে রে রেবা!—বোলে রতন বিছানা ছেড়ে দরজার দিকে ছুটে গিয়ে রেবাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল!

রতন অবাক্ হোয়ে দেখতে লাগল নিরাভরণা রেবা তার ছোট্ট ছেলেটিকে কোলে নিয়ে দরজা ধোরে দাঁড়িয়ে আছে। তার অঙ্গে একখানা নরুণ পেড়ে শাড়ী, মাথায় সিঁদুর নেই, চুলগুলি রুক্ষ।

রতনকে দেখে এগিয়ে এসে সে প্রণাম করলো, তারপরে তার মুখের দিকে একবার চেয়ে ঘাড় নীচু কোরে রইল। রতনও কোনো কথা তাকে জিজ্ঞাসা করলে না। শুধু ছেলেটিকে তার কোলে থেকে নিজের কোলে নিয়ে বল্লে—চল, ভেতরে চল্।

সমস্ত দিন দুই ভাই-বোনে কোনো কথাই হোলো না। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসবার পর রেবা সেই আগেকার মতন যখন রতনের কাছটিতে এসে চুপ কোরে বসল তখন রতন জিজ্ঞাসা করলে—কি হয়েছিল রে?

রেবা বল্লে—কিছু হয় নি তার। কদিন থেকে সেখানে ভয়ানক মারপিট চলছিল। সেদিন বিকেলে আফিসের কাজ সেরে সে বেচারী বাড়ী ফিরছে—কোথা থেকে একটা গুলি এসে তার বুকে বিঁধল—

রেবা ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। রতন আর কোনো প্রশ্ন করলে না।

খোকা তার মায়ের দেখাদেখি রতনকেও দাদাভাই বোলে ডাকতে সুরু কোরে দিলে। রতনের অ-গোছাল ঘরদোর আবার পরিষ্কার তক্‌তকে হোয়ে উঠল।

আবার সময় মত খাওয়া, সন্ধ্যার সময় খোকাকে নিয়ে খেলা সুরু হোলো। তার হারিয়ে যাওয়া ছেলেবেলা খোকার মূর্ত্তিতে আবার তার কাছে ফিরে এল।

একদিন অসময়ে রেবাকে শুয়ে থাকতে দেখে রতন জিজ্ঞাসা করলে—কি হয়েছে রে?



রতন রেবাকে দেখে থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল—৫৯ পৃষ্ঠা

রেবা বল্লে—কিছু না, এমনি।

কথাটা রতনের বিশ্বাস হোলো না। সে রেবার কপালে হাত দিয়ে দেখলে জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা কোরে জানতে পারলে এ রকম তার প্রায়ই হয়।

রতন তখুনি ডাক্তার ডাকলে। ডাক্তার এসে অনেকক্ষণ ধোরে পরীক্ষা কোরে মুখ বাঁকিয়ে চলে গেলেন—এ রোগ সারবার নয়।

কৃষ্ণ পক্ষের চাঁদের মতন রেবা দিনে দিনে মিলিয়ে যেতে লাগল। তার-পরে একদিন সকাল বেলা খোকাকে দাদাভাইয়ের হাতে সঁপে দিয়ে সবার কাছে বিদায় নিয়ে সে চলে গেল।

শ্মশান থেকে সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরে রতন দেখলে খোকা তার মার কাছে যাবার জন্য ভয়ানক কান্না জুড়ে দিয়েছে, কেউ তাকে ঠাণ্ডা করতে পারছে না। রতন তাকে কোলে নিতেই সে তার গলা জড়িয়ে ধোরে বল্লে—দাদাভাই, আমার মার কাছে নিয়ে চল।

রতন খোকাকে নিয়ে ছাতে উঠল। চাঁদের আলোতে ছাত ভেসে যাচ্ছিল। খোকা কিছুতেই থামে না। রতন তাকে কোলে শুইয়ে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল। খোকার কান্নার সঙ্গে সুর মিলিয়ে সে গান ধরলে—আয় আয় চাঁদামামা—

গান গাইতে গাইতে বহুদিন বিস্মৃত আর এক রাত্রির কথা রতনের মনে পড়ে গেল। সে রাত্রেও জ্যোৎস্নায় এমনি কোরে তাদের ছাত ভেসে যাচ্ছিল। সদ্যমাতৃহারা রুদ্যমান রতনকে ঘুম পাড়াবার জন্য ঠাকুরমা এই গানই ধরেছিলেন— ভাবতে ভাবতে রতন বর্ত্তমান হারিয়ে ফেল্লে। তার কোলে যে খোকা শুয়ে আছে সে কথা পর্য্যন্ত সে ভুলে গেল। খোকার একটা হেঁচ্‌কীর আওয়াজ তার কানে যেতেই সে চমকে উঠে মাথা নীচু কোরে দেখলে খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে—তার চোখের এক ফোঁটা জল গালের ওপরে চাঁদের আলোতে ঝক্ ঝক্ করছে—।

—শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

ভুতের রাজা

ক

সরকারি কাজে বিদেশে থাকি। ছুটি নিয়ে দেশে ফিরছি।

সাঁওতাল পরগণার যে-জায়গায় আমার কর্ম্মস্থল ছিল, সেখান থেকে রেল ষ্টেশনে যেতে হ'লে প্রায় ত্রিশ মাইলেরও উপর পথ পার হ'তে হবে। পাহাড়ে পথ,—এক এক মাইল হচ্ছে দু-তিন মাইলের ধাক্কা। তার উপরে রাতের বেলায় পথে বাঘ-ভাল্লুকের সঙ্গেও আলাপ হওয়ার সম্ভাবনা কম নয়। সকাল বেলায় বেরুলেও মাঝ-পথে সন্ধ্যা হবেই। তখন একটা আশ্রয়ের দরকার।

মাঝ-পথের কাছাকাছি স্থানীয় রাজার একটি শিকার-কুঠি ছিল। রাজা বা তাঁর বন্ধুরা শিকারে বেরুলে এই কুঠি হ'ত তাঁদের প্রধান আস্তানা।

রাজার ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ ছিল। তাঁকে গিয়ে অনুরোধ জানালুম, শিকার-কুঠিতে একটা রাতের জন্যে আমাকে মাথা গোঁজ্‌বার জায়গা দিতে হবে।

ম্যানেজার বললেন, "এখন শিকারের সময় নয়, কুঠি খালি প'ড়ে আছে। আপনি এক রাত কেন, এক মাস থাকতে পারেন। এখানকার পুলিশ-সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট টেলর সাহেবও আজ রাতটা সেখানে বিশ্রাম করবেন। কুঠিতে আরো ঘর আছে, আপনারও থাকবার অসুবিধা হবে না। কিন্তু—"

—"কিন্তু কি ?"

—কিন্তু আপনি সেখানে রাত কাটাতে পারবেন কি ?"

—"কেন পারব না ?"

—"লোকের মুখে শুনি, কুঠিতে না কি অপদেবতার ভয় আছে।"

—"অপদেবতা ?"

—"হাঁ, অপদেবতা ছাড়া আর কি বলব ? কুঠির পাশেই শালবনের ভেতরে সাঁওতালীদের এক ভূতুড়ে দেবতা আছে। সেই দেবতা না কি ভূতের রাজা। তার ভয়ে সাঁওতালীরা পর্য্যন্ত সন্ধ্যার পর ও-পাড়া মাড়ায় না। তারা বলে, তাদের দেব্‌তা না কি রাতের বেলায় কুঠির ভেতরে ঘুমোতে আসে।"

আমি হো হো ক'রে হেসে উঠে বললুম, "বেশ তো, মানুষ হ'য়ে দেবতার সঙ্গে রাত্রিবাস করব, এটা তো মস্ত পুণ্যের কথা। আমি রাজি!"

ম্যানেজার বললেন, "আমি অবশ্য ও-সব ছেলেমানুষী কথায় ততটা বিশ্বাস করি না, তবু বলা তো যায় না—"

যথাসময়ে ডুলিতে চ'ড়ে রওনা হ'য়ে, সন্ধ্যার কিছু আগেই শিকার-কুঠিতে পৌঁছলুম।

ডুলি বেয়ারারা ব'লে গেল, মাইল তিনেক তফাতে একটা গাঁয়ে গিয়ে তারা আজকের রাতটা কাটাবে; কাল সকালে আবার ডুলি নিয়ে আসবে।

কুঠির বারান্দায় একখানা বেতের চেয়ারে ব'সে টেলর সাহেব তামাকের পাইপ টানছিলেন। সাহেবের সঙ্গে আমারও বেশ পরিচয় ছিল।

আমাকে দেখে সাহেব বললেন, "এই যে, গুপ্ত যে! তুমি কোথায় যাচ্ছ ?"

—"ছুটি নিয়ে দেশে ফিরছি।......তুমি ?

—"আমি 'হোমে' যাচ্ছি। তুমি কি আজ এখানে থাকবে ?"

—"হাঁ, সায়েব।"

—"বেশ, বেশ, দুজনে এক সঙ্গে রাত কাটানো যাবে, এ ভালোই হ'ল।"

—"দুজন কেন সাহেব, তিন জন।"

—তিন জন আবার কে? তুমি কি আমার আর্দ্দালির কথা বলচ? ও, তাকে আমি মানুষের মধ্যেই গণ্য করি না।"

—"না সায়েব, তোমার আর্দ্দালির কথা বলচি না।"

—"তবে কি কুঠির দ্বারবানের কথা ভাবচ? না, সে রাত্রে এখানে থাকে না।"

—"না না, আমি দ্বারবানের কথাও বলচি না।......তুমি কি শোনো-নি সায়েব, সাঁওতালীদের এক দেবতা রাত্রে আমাদের সঙ্গী হ'তে পারেন?"

টেলর হেসে বললে, "ওহো, শুনেচি বটে! তা সে রূপকথার এক বর্ণও বিশ্বাস করি না।...তুমি কর না কি?"

—"করলে, এক্‌লা এখানে রাত কাটাতে আসি?"

টেলর পাইপে তিন-চারটে টান মেরে বললে, "দেখ গুপ্ত, সাঁওতালীদের এই দেবতাটিকে আমি দেখেছি। এমন বীভৎস দেবতা পৃথিবীতে আর দুটি নেই। তাকে দেখে আমার ভারি পছন্দ হয়েচে।

—"পছন্দ হয়েচে?"

—"হ্যাঁ। তাই ঠিক করেচি, কাল যাবার সময়ে তাকে আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব। ইংল্যাণ্ডে আমার বাড়ীর বৈঠকখানায় তাকে সাজিয়ে রেখে দেব। আমার বন্ধুরা তাকে দেখলে খুব তারিফ করবেন।"

আমি হেসে বললুম, "তাহ'লে বোঝা যাচ্চে, কাল থেকে দেবতা আর কুঠির ভেতরে শুতে আসবেন না। তবে এই বেলা তাঁকে একবার দর্শন ক'রে আসি।... তাঁর আড্ডা কোথায়?"

টেলর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে, বললে "ঐ যে, ঐখানে! মিনিটখানেকের পথ।"

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলুম। কুঠির পাশেই অনেকগুলো শালগাছ দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। তাদেরই ছায়ায় একটা পাথুরে ঢিবির উপরে মানুষের মত উঁচু একটা মূর্ত্তিকে দেখতে পেলুম।

মূর্ত্তিটা রং-করা কাঠের। তার দেহ মাপে মানুষের মতন বটে, কিন্তু তার মুখ দানবের মত প্রকাণ্ড। আর সে মুখের ভাব কি ভয়ঙ্কর! দেখিলেই বুকের কাছটা ছ্যাৎ-ছ্যাৎ করতে থাকে।

মাথার চুলগুলো সাপের মতন ঝুলছে, কাণ দুটো হাতীর মতন, মুখখানা খানিক

সিংহ আর খানিক ভাল্লুকের মতন, দু-দুটো গোল গোল কাঁচের চোখ আগুনের মত জ্বলছে। হাঁ-করা বড় বড় দাঁতওয়ালা মুখের ভিতর থেকে রাঙা টক্‌টকে, লক্‌লকে জিভের আধখানা বাইরে বেরিয়ে প'ড়ে ঝুলছে! কাঁধ ও মুণ্ডের মাঝখানে গলাটা দেখলে মনে হয়, কে যেন একখানা লিক্‌লিকে সরু বাঁখারির উপরে মুখখানাকে বসিয়ে দিয়েছে। হাত দুখানা বাঘের থাবার মত। কোমরের কাছ থেকে পা পর্য্যন্ত দেহের



একটা পাথুরে ঢিপির উপরে মানুষের মত উঁচু একটা মূর্ত্তিকে দেখতে পেলুম—৬৩ পৃষ্ঠ।

কোন অঙ্গ দেখা যাচ্ছে না। কাঠকে কুঁদে আর কোন অঙ্গ গড়াই হয় নি। মূর্ত্তির গায়ের রং আলকাতরার মতন কালো আর মুখের রং খানিক সাদা, খানিক তামাটে ও খানিক হল্‌দে।

ভাবলুম, এ মূর্ত্তি যদি সত্যসত্য রাত্রে কুঠির ভিতরে ঘুমাতে আসে, তাহ'লে আমাদের ঘুম এ জীবনে আর ভাঙবে কি?

—ধীরে ধীরে কুঠির দিকে ফিরে এলুম। টেলর পশ্চিমের আকাশের দিকে তাকিয়ে কি দেখছিল। আমাকে দেখে সে বললে, "গুপ্ত, খুব ঝড়-বৃষ্টি আসচে, ঐ দেখ!"

সত্য কথা। পশ্চিমের আকাশখানা আচম্বিতে ঠিক যেন কালো কষ্টিপাথর হ'য়ে গেছে। ঝড় উঠতে আর দেরি নেই।

(খ)

ঝড় এসে সমস্ত অরণ্যকে জাগিয়ে দিয়ে গেছে। এখন বৃষ্টি পড়ছে মুষল-ধারে।

অনেক রাত। টেলরের নিমন্ত্রণ নিয়ে, তার সঙ্গে গল্প করতে করতে অনেকক্ষণ আগে 'ডিনার' খেয়েছি। এখন টেলর তার ঘরে শুয়ে হয়তো দিব্য আরামে নিদ্রা দিচ্ছে ;—কিন্তু আমার চোখে ঘুম নেই।

ভূত-টুৎ কিছু মানি না ;—তবু কেন জানি না, মনটা কেমন খুৎ-খুৎ করছে! রাজার সেই ম্যানেজারের কথাগুলো আর সাঁওতালী দেবতার সেই ভয়ানক মুখখানা মনের ভিতর দিয়ে ক্রমাগত আনাগোনা করছে। যত তাদের ভুলবার চেষ্টা করি আজেবাজে নানান কথা ভেবে,—তত তারা মনের উপরে চেপে বসে, নরম মাটির উপরে ভারি পায়ের দাগের মত।

বাইরে বৃষ্টি ঝরছে, ঝম্-ঝম্ ঝম্-ঝম্! মাঝে মাঝে ঝোড়ো, দম্‌কা হাওয়া হা-হা-হা-হা ক'রে উঠছে!—যেন কোন আহত আত্মার কান্না! চারিদিক থেকে বনের গাছপালাগুলো মর্-মর্ মর্-মর্ ক'রে যেন কোন শত্রুকে অভিশাপ দিচ্ছে! তারই ভিতর থেকে একবার শুনলুম হায়েনার অট্টহাসি, একবার শুনলুম শৃগাল-দলের মায়াকান্না, একবার শুনলুম বাঘের গর্জ্জন!.......

হঠাৎ আমার ঘরের দরজার উপর দুম্-দুম্ ক'রে আঘাত হ'ল! ধড়্‌মড়্ ক'রে আমি বিছানার উপরে উঠে বস্‌লুম,—সে কি আসছে? সে কি আসছে?

দরজার উপরে আর কোন আঘাত হ'ল না। ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটায় দরজা ন'ড়ে উঠেছে নিশ্চয়! নিজের কাপুরুষতার জন্যে মনে মনে নিজেই লজ্জিত হ'য়ে আবার শুয়ে পড়বার চেষ্টা করছি, এমন সময়ে বাহির থেকে খনখনে ঝাঁঝালো গলায় গান শুনলুম :—

"লোগোবুরু ধীর্‌কো সিনিন্ ঘাণ্টাবাড়ি মা কাওয়াড়।"

এ তো সাঁওতালী ভাষা। নিশ্চয়ই কোন সাঁওতালী গান গাইছে! কিন্তু এত রাত্রে, এমন ঝড়-বাদলে, এই হিংস্র জন্তু-ভরা গভীর অরণ্যের মধ্যে কে সাঁওতালী মনের আনন্দে সখ ক'রে গান গাইতে আসবে?

আবার দরজার উপরে ঘন ঘন আঘাত হ'ল—এবারে আরো জোরে।.......

আমার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠল। এ তো ঝড়ের ধাক্কা নয়, এ যে সত্য-

সত্যই কে দরজা ঠেলছে আর ঠেলছে!....তবে কি সে এসেছে? তবে কি সে এখানে ঘুমোতে এসেছে?

আবার গান শুনলুম এবারে আমার খুব কাছে, একেবারে কুঠির বারান্দার উপরে। সেই তীব্র খন্‌খনে গলার গান!—

"লোগোবুরু ধীর্‌কো সিনিন্ ঘান্টাবাড়ি মা কাওয়াড়!"

হঠাৎ উল্টো বিপদ্! কুঠির ভিতর দিক্‌কার দরজায় ঘন-ঘন আঘাত! ভিতরে-বাহিরে বিপদ্ দেখে প্রায় যখন হাল ছেড়ে দিয়ে বসেছি, এমনি সময়ে শুনলুম:—

"গুপ্ত! গুপ্ত! ভগবানের দোহাই, দরজা খোলো—দরজা খোলো শীগ্‌গীর!"

এ তো টেলরের গলা!......আঃ! বাঁচলুম! তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিলুম।

টেলর হুড়্‌মুড়্ ক'রে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল— তার চোখ-মুখ পাগলের মত, তার হাতে বন্দুক।

আমি তাকে দু-হাতে চেপে ধরে' বললুম, "মিঃ টেলর, হয়েচে কি? এত রাত্রে কি দরকার তোমার?"

টেলর দেয়ালে ঠ্যাসান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বললে, "গুপ্ত, আমার ঘরের দরজায় ক্রমাগত কে লাথি মারচে আর গান গাইচে। তুমিই কি আমার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে আমাকে ডাকছিলে?"

আমি বললুম, "না, না। আমি আমার বিছানা ছেড়ে এক পা'ও নড়িনি! কিন্তু আমারও ঘরের দরজা যে কে নাড়চে, আর গান গাইচে!......ঐ শোনো!"

দুম্-দুম্ ক'রে আমার ঘরের দরজায় আবার দু-বার প্রচণ্ড আঘাত হ'ল,—সঙ্গে সঙ্গে সেই গান:—

"লোগোবুরু ধীর্‌কো সিনিন্ ঘান্টাবাড়ি মা কাওয়াড়!"

......আচমকা আবার একটা ঝড়ের ঝাপ্‌টা এসে দরজা জানালার উপরে আছ্‌ড়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা খড়খড়ি দুম্‌দাম্ ক'রে খুলে গেল।

......সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের আলোকে স্পষ্ট দেখলুম, বারান্দার উপরে কার একটা জীবন্ত ছায়ামূর্ত্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে! কে ও কে ও? ও কি সেই-ই—যে প্রতি রাত্রে এখানে ঘুমোতে আসে...আমার মাথার চুলগুলো যেন খাড়া হয়ে উঠল!

টেলরের বন্দুক গ্রুম্ ক'রে গর্জ্জে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে ছায়ামূর্ত্তিটা সাঁ্যাৎ ক'রে বারান্দার একপাশে, আমাদের চোখের আড়ালে স'রে গেল।

টেলর চেঁচিয়ে উঠল, "গুপ্ত! গুপ্ত! জান্‌লা বন্ধ ক'রে দাও—জান্‌লা বন্ধ ক'রে দাও!"

পা চলতে চাইছিল না! কিন্তু পাছে টেলর মনে করে বাঙালী কাপুরুষ, সেই ভয়ে নিজের সমস্ত দুর্ব্বলতাকে দমন ক'রে আমি জান্‌লার পাল্লা দুটো আবার বন্ধ ক'রে দিলুম।

টেলর টল্‌তে টল্‌তে আমার বিছানার উপরে ব'সে প'ড়ে বললে, "গুপ্ত! কিছু মনে কোরো না, আমি আজ তোমার বিছানাতেই তোমার সঙ্গে রাত কাটাব!"

বাইরে আবার কে গান গাইলে :—

"লোগোবুরু ধীর্‌কো সিনিন্ ঘান্টাবাড়ি মা কাওয়াড়!"

গ

সকাল বেলা। কিন্তু তখনো সমান ভাবে বৃষ্টি ঝরছে আর ঝরছেই।

আস্তে আস্তে দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম। সারা আকাশখানা যেন কালো মেঘের ঘেরাটোপ্ দিয়ে ঢাকা; সূর্য্যকে যেন আজ কোন্ অন্ধকার-রাহু গ্রাস ক'রে ফেলেছে। যতদূর নজর চলে খালি দেখা যায় অগণ্য শ্যামল তরুর বিরাট সভা আর শৈলমালার গর্ব্বোন্নত শিখর এবং তারই ভিতরে এসে পড়েছে তীরের চক্‌চকে ফলা'র মত বৃষ্টির অশ্রান্ত ধারাগুলো। কোথাও পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ বা কোন জীবের চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই,—পথের উপর দিয়ে ক্রুদ্ধ জলস্রোত যেন কোন অদৃশ্য শত্রুকে বেগে আক্রমণ করতে ছুটে চলেছে!

হঠাৎ বারান্দার এক কোনে চোখ গেল। কাপড় মুড়ি দিয়ে কে একজন শুয়ে রয়েছে!

কাছে গিয়ে ডাকলুম, "এই! কে তুই?"

বার কয়েক ডাকাডাকির পর কাপড়ের ভিতর থেকে একখানা সাঁওতালী মুখ বেরুল।

—"কে তুই?"

—"আমি ঠাকুরের পূজারী।"

—"ঠাকুর! কে ঠাকুর?"

—"যিনি ঐ শালবনে থাকেন।"

—"এখানে কি করছিস্?"

—"ঠাকুর রোজ রাত্রে এখানে ঘুমোতে আসেন, তাই আমও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আসি।"

—"কাল রাত্রে তাহ'লে তুই-ই দরজা ঠেল্‌ছিলি?"

—"আমিও ঠেলছিলুম, ঠাকুরও ঠেলছিলেন।"

—"আর গান গাইছিল কে?"

—"আমি।"

এমন সময় টেলরও ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। তাকে সব কথা খুলে বললুম। টেলর তো শুনেই মহা ক্ষাপ্পা, ঘুসি পাকিয়ে পুরুতের দিকে ছুটে যাবামাত্র সে এক লাফে বারান্দার রেলিং টপ্‌কে বাইরে প'ড়ে, বনের ভিতরে কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

টেলর বললে, "রাস্কেলকে ধরতে পারলে একবার দেখিয়ে দিতুম। ওঃ সারারাত কি অশান্তিতেই কেটেচে।"

আমি বললুম, "যাক্, যা হবার তা তো হ'য়ে গেছেই। এখন আমাদের কি উপায় হবে। কুঠির দ্বারবানও এল না, ডুলি-বেয়ারারাও এই দুর্য্যোগে বোধ হয় আসবে না। আমরা যাব কেমন ক'রে?"

টেলর বললে, "আমাকে যেমন ক'রেই হোক্ আজ যেতে হবেই। বোম্বে যাবার টিকিট পর্য্যন্ত আমি কিনে ফেলেচি। উপায় থাকলে তোমাকেও আমি ষ্টেসন পর্য্যন্ত পৌঁছে দিতুম। কিন্তু আমার 'টু-সিটার' গাড়ী,—আমি, আমার আর্দ্দালি, তুমি, তোমার চাকর আর তোমার মালপত্তর অতটুকু গাড়ীতে তো ধরবে না, কাজেই তোমাকে এখানে ফেলে রেখেই আমাকে যেতে হবে।...আর্দ্দালি।"

টেলরের আর্দ্দালি এসে সেলাম করলে।

টেলর বললে, "আমার মালপত্তর সব গুছিয়ে নিয়ে গাড়ীতে তোলো। তারপর শালবন থেকে সেই কাঠের পুতুলটা তুলে নিয়ে এস।"

আমি বললুম, "তুমি কি সত্যিসত্যিই ঐ পুতুলটা ইংল্যাণ্ডে নিয়ে যেতে চাও?"

টেলর বললে, "নিশ্চয়! আমার যে কথা সেই কাজ!"

(ছয়)

আবার রাত এল। বৃষ্টি এখনো থামে নি, আমি এখনো কুঠিতে বন্দী হ'য়ে আছি।

টেলর চ'লে গেছে এবং যাবার সময়ে সাঁওতালীদের ভূতের রাজাকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেছে। সে আর এই কুঠির ভিতরে ঘুমোতে আসবে না।

চোখে ঘুম আসছিল না। একখানা ইংরেজী নভেল বার ক'রে পড়তে বসলুম। ঘণ্টা-দেড়েক পরে তন্দ্রার আবেশ এল। আলোটা কমিয়ে দিয়ে শয়নের উপক্রম করছি, এমন সময়ে শুনলুম, বাইরের সিঁড়ির উপরে আওয়াজ হ'ল, ঠক্, ঠক্, ঠক্!

ঠিক যেন কাঠের আওয়াজ! ঠক্ ঠক্ করতে করতে আওয়াজটা আমার ঘরের কাছ-বরাবর এল, তারপর দরজার উপরে শুনলুম ধাক্কার পর ধাক্কা!

কী আপদ! টেলর তো পুতুলটাকে নিয়ে কোন্ সকালে বিদায় হয়েছে, এ আবার কে জ্বালাতে এল।

নিশ্চয়ই সে সাঁওতালী পুরুত ব্যাটা! সে হতভাগা রোজ রাত্রে এইখানে আরাম ক'রে ঘুমোয় আর চারিদিকে রটিয়ে দেয়—কুঠির ভিতরে ভূতের রাজা শুতে আসেন!

ধাক্কার জোর ক্রমেই বেড়ে চলল..........একবার ভাবলুম দরজা খুলে পুরুতটাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দি। তারপর মনে হ'ল, সে কাজ ঠিক হবে না। এই দুর্য্যোগে বিজন জঙ্গলের ভিতরে রাত্রে একলা আমি এখানে আছি যদি কোন দুষ্ট লোক কুমৎলবে এসে থাকে?

বন্দুকটা নিয়ে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। দরজার এক জায়গায় একটা ছ্যাঁদা ছিল, বন্দুকের নলটা সেইখানে রেখে চেঁচিয়ে বললুম, "কে আছ চ'লে যাও, নইলে এখনি আমি বন্দুক ছুঁড়ব।"

কোন জবাব নেই, দরজার উপরে ধাক্কাও থাম্‌ল না।

—"এখনো আমার কথা শোনো, নইলে—"

বাইরে বিশ্রী গলায় কে হাসতে লাগল—হিহি হিঃ, হিহি হিঃ, হিহিহিহিহি—

আমি বন্দুকের ঘোড়া টিপ্‌লুম—সঙ্গে সঙ্গে দরজার উপরে ধাক্কাও থেমে গেল!

ঠক্ ঠক্ ক'রে একটা আওয়াজ ঘরের কাছ থেকে দূরে স'রে যেতে লাগল,—তারপর কুঠির সিঁড়ির উপরে শব্দ শুনলুম ঠক্, ঠক্, ঠক্!

খানিক পরে অনেক দূর থেকে আবার সেই বিশ্রী হাসি শোনা গেল, হিহি হিঃ, হিহি হিঃ, হিহিহিহিহি—

সে হাসি অমানুষিক......শরীরের রক্ত যেন জল ক'রে দেয়।

(৫)

শেষ রাতে জল ধ'রে গেল।

সকালে দরজা খুলতেই কাঁচা সোনার কচি রোদ এসে ঘরখানা যেন হাসিতে ভরিয়ে তুললে! রোদ দেখে মনটা খুসি হ'য়ে উঠল।

বারান্দায় বেরিয়েই দেখি, এককোনে কাপড় মুড়ি দিয়ে কে শুয়ে রয়েছে!

তেড়ে গিয়ে মারলুম তাকে এক ধাক্কা। ধড়্‌মড়্‌ ক'রে সে উঠে বসল। সেই সাঁওতালী পুরুতটা!

ক্রুদ্ধ স্বরে বললুম, "কাল আবার কি করতে এখানে এসেছিলি? ভারি চালাকি পেয়েচিস, না?"

লোকটার মুখের ভাব একটুও বদ্‌লালো না। শান্তস্বরে বললে, "আমার ঠাকুর কাল এখানে ঘুমোতে এসেছিলেন, আমিও তাই এসেছিলুম।"

—"তোর ঠাকুর কোথায়? সায়েব তো তাকে নিয়ে চ'লে গেছে।"

—"আমার ঠাকুর যেখানে থাকেন, সেইখানেই আছেন।"

—"মিথ্যা কথা! আমি নিজের চোখে দেখেচি, টেলর তাকে নিয়ে চ'লে গেছে।"

—"আমার ঠাকুর যেখানে থাকেন, সেইখানেই আছেন।"

কুঠি থেকে বেরিয়ে প'ড়ে ছুটে পাশের শালবনে গিয়ে হাজির হলুম।

সবিস্ময়ে দেখলুম, ভূতের রাজা চোখ পাকিয়ে লক্‌লকে জিভ বার ক'রে ঠিক সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে!

আর, আর, ও কি? মূর্ত্তির পেটের উপরে একটা গর্ত্ত—ঠিক যেন বন্দুকের গুলির দাগ। গর্ত্তের চারপাশে রক্ত জমাট হ'য়ে আছে,—মূর্ত্তির আরো নানা জায়গাতেও রক্তের চিহ্ন!

তবে কি আমার বন্দুকের গুলিই,—ভাবতে পারলুম না, মূর্ত্তির দিকে আর তাকাতেও পারলুম না, কেমন একটা অজানা ভয়ে আমার সমস্ত শরীর আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল,—প্রাণপণে দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে এলুম।

(৬)

কলকাতায় ফিরে এসেই খবরের কাগজে এই বিবরণ পড়লুম:—"সাঁওতাল পরগণার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্‌ মিঃ জে টেলর কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া বিলাতে

যাইতেছিলেন, কিন্তু পথের মধ্যে এক বিপদে পড়িয়া খুব সম্ভব তিনি প্রাণ হারাইয়াছেন। স্থানীয় জঙ্গলের ভিতরে তাঁহার মোটর গাড়ী পাওয়া গিয়াছে। মোটরের উপরে ভিতরে ও চারিপাশে রক্তের দাগ, কিন্তু মিঃ টেলর ও তাঁহার আর্দ্দালীর কোনই সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। পুলিশ সন্দেহ করিতেছে, মিঃ টেলর ও তাঁহার আর্দ্দালীকে ব্যাঘ্র বা অন্য কোন হিংস্র জন্তু আক্রমণ করিয়াছে। নিকটস্থ জঙ্গলে এক নর-খাদক ব্যাঘ্রেরও খোঁজ পাওয়া গিয়াছে।"

সেই ভূতুড়ে মূর্ত্তির গায়ে যে রক্তের দাগ লেগেছিল, তাহ'লে সে রক্ত হচ্ছে হতভাগ্য টেলরের আর তার আর্দ্দালীর গায়ের রক্ত?

এবং সেই সাঁওতালী পুরুতটাই নিশ্চয় কোনগতিকে খবর পেয়ে ভূতের রাজাকে আবার শালবনে ফিরিয়ে এনেছিল?

মনকে এই ব'লে প্রবোধ দিলুম বটে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করলুম, শিকার-কুঠিতে আর কখনো রাত্রিবাস করবো না! কিসে কি হয়, কে জানে?

—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

ইচ্ছাপূরণ

সুবলচন্দ্রের ছেলেটির নাম সুশীলচন্দ্র। কিন্তু সকল সময়ে নামের মত মানুষটি হয় না। সেই জন্যই সুবলচন্দ্র কিছু দুর্ব্বল ছিলেন এবং সুশীলচন্দ্র বড় শান্ত ছিলেন না।

ছেলেটি পাড়াশুদ্ধ লোককে অস্থির করিয়া বেড়াইত, সেইজন্য বাপ মাঝে মাঝে শাসন করিতে ছুটিতেন; কিন্তু বাপের পায়ে ছিল বাত, আর ছেলেটি হরিণের মত দৌড়িতে পারিত; কাজেই কিল্ চড়্-চাপড়্ সকল সময়, ঠিক জায়গায় গিয়া পড়িত না। কিন্তু সুশীলচন্দ্র দৈবাৎ যেদিন ধরা পড়িতেন, সেদিন তাঁহার আর রক্ষা থাকিত না।

আজ শনিবারের দিনে দুটোর সময় ইস্কুলের ছুটি ছিল, কিন্তু আজ ইস্কুলে যাইতে সুশীলের কিছুতেই মন উঠিতেছিল না। তাহার অনেকগুলা কারণ ছিল। একে ত আজ ইস্কুলে ভূগোলের পরীক্ষা, তাহাতে আবার ও-পাড়ার বোসেদের বাড়ী আজ সন্ধ্যার সময় বাজি পোড়ান হইবে। সকাল হইতে সেখানে ধূমধাম চলিতেছে। সুশীলের ইচ্ছা, সেইখানেই আজ দিনটা কাটাইয়া দেয়।

অনেক ভাবিয়া, শেষকালে ইস্কুলে যাইবার সময় বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার বাপ সুবল গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে, বিছানায় প'ড়ে আছিস্ যে? আজ ইস্কুলে যাবি নে?"

সুশীল বলিল, "আমার পেট কাম্ড়াচ্চে, আজ আমি ইস্কুলে যেতে পার্‌ব না।"

সুবল তাহার মিথ্যা কথা সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। মনে মনে বলিলেন, রোস্, একে আজ জব্দ ক'র্‌তে হবে। এই বলিয়া কহিলেন, "পেট কাম্ড়াচ্চে?" তবে আর তোর কোথাও গিয়ে কাজ নেই। বোসেদের বাড়ী বাজি দেখ্‌তে হরিকে একলাই পাঠিয়ে দেব অখন। তোর জন্যে আজ লজঞ্জুস কিনে রেখেছিলুম, সেও আজ খেয়ে কাজ নেই। তুই এখানে চুপ্ ক'রে পড়ে থাক্, আমি খানিকটা পাঁচন তৈরী ক'রে নিয়ে আসি।"

এই বলিয়া তাহার ঘরে শিকল দিয়া সুবলচন্দ্র খুব তিতো পাঁচন তৈয়ার করিয়া আনিতে গেলেন। সুশীল মহা মুস্কিলে পড়িয়া গেল। লজঞ্জুস্ সে যেমন ভালবাসিত, পাঁচন খাইতে হইলে তাহার তেমনি সর্ব্বনাশ বোধ হইত। ওদিকে আবার বোসেদের বাড়ী যাইবার জন্য কাল রাত হইতে তাহার মন ছট্‌ফট্ করিতেছে, তাহাও বুঝি বন্ধ হইল।

সুবলবাবু যখন খুব বড় এক বাটি পাঁচন লইয়া ঘরে ঢুকিলেন, সুশীল বিছানা হইতে ধড়্‌ফড়্ করিয়া উঠিয়া বলিল, "আমার পেট কামড়ানো একেবারে সেরে গেছে, আমি আজ ইস্কুলে যাব।"

বাবা বলিলেন, "না না, সে কাজ নেই, তুই পাঁচন খেয়ে এই খেনে চুপ্‌চাপ্ ক'রে শুয়ে থাক্।" এই বলিয়া তাহাকে জোর করিয়া পাঁচন খাওয়াইয়া ঘরে তালা লাগাইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সুশীল বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত দিন ধরিয়া কেবল মনে করিতে লাগিল, আহা! যদি কালই আমার বাবার মত বয়স হয়, আমি যা ইচ্ছে তাই ক'র্‌তে পারি, আমাকে কেউ বন্ধ ক'রে রাখ্‌তে পারে না!

তাহার বাপ সুবলবাবু বাহিরে একলা বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, আমার বাপ-মা আমাকে বড় বেশী আদর দিতেন ব'লেই ত আমার ভাল রকম পড়া-শুনো কিছু হ'ল না। আহা! আবার যদি সেই ছেলেবেলা ফিরে পাই, তা হ'লে আর কিছুতেই সময় নষ্ট না ক'রে কেবল পড়াশুনো ক'রে নিই।

ইচ্ছা-ঠাক্‌রুণ সেই সময় ঘরের বাহির দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি বাপের ও ছেলের মনের ইচ্ছা জানিতে পারিয়া ভাবিলেন, আচ্ছা ভাল, কিছুদিন ইহাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াই দেখা যাক্!

এই ভাবিয়া বাপকে গিয়া বলিলেন, "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। কাল হইতে তুমি তোমার ছেলের বয়স পাইবে।" ছেলেকে গিয়া বলিলেন, "কাল হইতে তুমি তোমার বাপের বয়সী হইবে।" শুনিয়া দুইজনে ভারি খুসী হইয়া উঠিলেন।

বৃদ্ধ সুবলচন্দ্র রাত্রে ভাল ঘুমাইতে পারিতেন না, ভোরের দিক্‌টায় ঘুমাইতেন। কিন্তু আজ তাঁহার কি হইল, হঠাৎ খুব ভোরে উঠিয়া একেবারে লাফ দিয়া বিছানা হইতে নামিয়া পড়িলেন। দেখিলেন খুব ছোট হইয়া গেছেন; পড়া দাঁত সবগুলি উঠিয়াছে; মুখের গোঁপ-দাড়ি সমস্ত কোথায় গেছে, তাহার আর চিহ্নও নাই! রাত্রে যে ধুতি এবং জামা পরিয়া শুইয়াছিলেন, সকাল বেলায় তাহা এত ঢিল হইয়া গেছে, হাতের দুই আস্তিন প্রায় মাটি পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে,

জামার গলা বুক পর্য্যন্ত নাবিয়াছে, ধুতির কোঁচাটা এতই লুটাইতেছে যে, পা ফেলিয়া চলাই দায়।

আমাদের সুশীলচন্দ্র অন্যদিন ভোরে উঠিয়া চারিদিকে দৌরাত্ম্য করিয়া বেড়ান, কিন্তু আজ তাহার ঘুম আর ভাঙ্গে না। যখন তাহার বাপ সুবলচন্দ্রের চেঁচামেচিতে সে জাগিয়া উঠিল, তখন দেখিল, কাপড়চোপড়গুলো গায়ে এমনি আঁটিয়া গেছে যে, ছিঁড়িয়া ফাটিয়া কুটিকুটি হইবার যো হইয়াছে; শরীরটা মস্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে; কাঁচাপাকা গোঁফ-দাড়িতে অর্দ্ধেকটা মুখ দেখাই যায় না; মাথায় একমাথা চুল ছিল। হাত দিয়া দেখে, সাম্‌নে চুল নাই—পরিষ্কার টাক্ তক্‌তক্ করিতেছে!

আজ সকালে সুশীলচন্দ্র বিছানা ছাড়িয়া উঠিতেই চায় না। অনেকবার তুড়ি দিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাই তুলিল; অনেকবার এপাশ ওপাশ করিল; শেষকালে বাপ সুবলচন্দ্রের গোলমালে ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল।

দুইজনের মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু ভারি মুস্কিল বাধিয়া গেল। আগেই বলিয়াছি, সুশীলচন্দ্র মনে করিত যে, সে যদি তাহার বাবা সুবলচন্দ্রের মত বড় এবং স্বাধীন হয়, তবে যেমন ইচ্ছা গাছে চড়িয়া, জলে ঝাঁপ দিয়া, কাঁচা আম খাইয়া পাখীর বাচ্ছা পাড়িয়া দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইবে; যখন ইচ্ছা, ঘরে আসিয়া যাহা ইচ্ছ তাহাই খাইবে, কেহ বারণ করিবার থাকিবে না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, সেদিন সকালে উঠিয়া তাহার গাছে চড়িতে ইচ্ছাই হইল না। পানা-পুকুরটা দেখিয়া মনে হইল, ইহাতে ঝাপ দিলেই আমার কাঁপুনি দিয়া জ্বর আসিবে। চুপ্‌চাপ্ করিয়া দাওয়ায় একটা মাদুর পাতিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

একবার মনে হইল, খেলা-ধূলাগুলা একেবারেই ছাড়িয়া দেওয়াটা ভাল হয় না, একবার চেষ্টা করিয়াই দেখা যাক্। এই ভাবিয়া, কাছে একটা আমড়া গাছ ছিল, সেইটাতে উঠিবার জন্য অনেক রকম চেষ্টা করিল। কাল যে গাছটাতে কাঠবিড়ালীর মত তড়্‌তড়্ করিয়া চড়িতে পারিত, আজ বুড়া শরীর লইয়া সে-গাছে কিছুতেই উঠিতে পারিল না; নীচেকার একটা কচি ডাল ধরিবামাত্র সেটা তাহার শরীরের ভারে ভাঙ্গিয়া গেল এবং বুড়া সুশীল ধপ্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। কাছে রাস্তা দিয়া লোক চলিতেছিল, তাহারা বুড়াকে ছেলেমানুষের মত গাছে চড়িতে ও পড়িতে দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হইয়া গেল। সুশীলচন্দ্র লজ্জায় মুখ নীচু করিয়া আবার সেই দাওয়ায় মাদুরে আসিয়া বসিল। চাকরকে বলিল, "ওরে, বাজার থেকে এক টাকার লজঞ্চুস কিনে আন্।"

লজঞ্চুসের প্রতি সুশীলচন্দ্রের বড় লোভ ছিল। স্কুলের ধারের দোকানে সে

রোজ নানা রঙের লজঞ্জুস্ সাজান দেখিত; দু'চার পয়সা যাহা পাইত, তাহাতেই লজঞ্জুস্ কিনিয়া খাইত; মনে করিত, যখন বাবার মত টাকা হইবে, তখন কেবল পকেট ভরিয়া ভরিয়া লজঞ্জুস্ কিনিবে এবং খাইবে। আজ চাকর এক টাকায় এক রাশ লজঞ্জুস্ কিনিয়া আনিয়া দিল; তাহারই একটা লইয়া সে দন্তহীন মুখের মধ্যে পুরিয়া চুষিতে লাগিল; কিন্তু বুড়ার মুখে ছেলেমানুষের লজঞ্জুস্ কিছুতেই ভাল লাগিল না। একবার ভাবিল, এগুলা আমার ছেলেমানুষ বাবাকে খাইতে দেওয়া যাক্, আবার তখনি মনে হইল, না, কাজ নাই, এত লজঞ্জুস্ খাইলে উহার আবার অসুখ করিবে।

কাল পর্য্যন্ত যে সকল ছেলে সুশীলচন্দ্রের সঙ্গে কপাটি খেলিয়াছে, আজ তাহারা সুশীলের সন্ধানে আসিয়া বুড়া সুশীলকে দেখিয়া দূরে ছুটিয়া গেল!

সুশীল ভাবিয়াছিল, বাপের মত স্বাধীন হইলে তাহার সমস্ত ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে সমস্ত দিন ধরিয়া কেবলই ড়ুডু ড়ুডু শব্দে কপাটি খেলিয়া বেড়াইবে; কিন্তু আজ রাখাল, গোপাল, অক্ষয়, নিবারণ, হরিশ এবং নন্দকে দেখিয়া মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিল; ভাবিল, চুপ্ চাপ্ করিয়া বসিয়া আছি, এখনি বুঝি ছোঁড়াগুলো গোলমাল বাধাইয়া দিবে। .

আগেই বলিয়াছি, বাবা সুবলচন্দ্র প্রতিদিন দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া ভাবিতেন, যখন ছোট ছিলাম তখন দুষ্টামি করিয়া সময় নষ্ট করিয়াছি, ছেলে বয়স ফিরিয়া পাইলে সমস্ত দিন শান্ত শিষ্ট হইয়া, ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া, কেবলই বই লইয়া পড়া মুখস্থ করি। এমন কি, সন্ধ্যার পরে ঠাকুরমা'র কাছে গল্প শোনাও বন্ধ করিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া রাত্রি দশটা এগারোটা পর্য্যন্ত পড়া তৈয়ারি করি।

কিন্তু ছেলে বয়স ফিরিয়া পাইল সুবলচন্দ্র কিছুতেই ইস্কুলমুখো হইতে চাহেন না। সুশীল বিরক্ত হইয়া আসিয়া বলিত, "বাবা, ইস্কুলে যাবে না?" সুবল মাথা চুল্‌কাইয়া মুখ নীচু করিয়া আস্তে আস্তে বলিতেন, "আজ আমার পেট কাম্‌ড়াচ্ছে, আমি ইস্কুলে যেতে পার্‌ব না। সুশীল রাগ করিয়া বলিত, "পার্ব্বে না বৈ কি! ইস্কুলে যাবার সময় আমারও অমন ঢের পেট কাম্‌ড়েছে, আমি ও-সব জানি!"

বাস্তবিক সুশীল এত রকম উপায়ে ইস্কুল পলাইত এবং সে এত অল্পদিনের কথা যে, তাহাকে ফাঁকি দেওয়া তাহার বাপের কর্ম্ম নহে। সুশীল জোর করিয়া ক্ষুদ্র বাপটিকে স্কুলে পাঠাইতে আরম্ভ করিল। স্কুলের ছুটির পরে সুবল বাড়ী আসিয়া খুব একচোট ছুটাছুটি করিয়া খেলিয়া বেড়াইবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িতেন; কিন্তু ঠিক সেই সময়টিতে বৃদ্ধ সুশীলচন্দ্র চোখে চস্‌মা দিয়া একখানা কৃত্তিবাসের রামায়ণ লইয়া সুর করিয়া পড়িত, সুবলের ছুটাছুটি গোলমালে তাহার পড়ার ব্যাঘাত হইত।

তাই সে জোর করিয়া সুবলকে ধরিয়া সম্মুখে বসাইয়া হাতে একখানা শ্লেট্ দিয়া আঁক কষিতে দিত। আঁকগুলো এমনি বড় বড় বাছিয়া দিত যে, তাহার একটা কষিতেই তাহার বাপের একঘণ্টা চলিয়া যাইত। সন্ধ্যা বেলায় বুড়া সুশীলের ঘরে অনেক বুড়ায় মিলিয়া দাবা খেলিত। সে সময়টায় সুবলকে ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য সুশীল একজন মাষ্টার রাখিয়া দিল, মাষ্টার রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত তাহাকে পড়াইত।

খাওয়ার বিষয়ে সুশীলের বড় কড়াকড়ি ছিল। কারণ, তাহার বাপ সুবল যখন বৃদ্ধ ছিলেন, তখন তাঁহার খাওয়া ভাল হজম হইত না, একটু বেশী খাইলেই অম্বল হইত,—সুশীলের সে কথাটা বেশ মনে আছে, সেইজন্য সে তাহার বাপকে কিছুতেই অধিক খাইতে দিত না। কিন্তু হঠাৎ অল্প-বয়স হইয়া আজকাল তাঁহার এমনি ক্ষুধা হইয়াছে যে, নুড়ি হজম করিয়া ফেলিতে পারিতেন। সুশীল তাঁহাকে যতই অল্প খাইতে দিত, পেটের জ্বালায় তিনি ততই অস্থির হইয়া বেড়াইতেন। শেষকালে রোগা হইয়া শুকাইয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের হাড় বাহির হইয়া পড়িল। সুশীল ভাবিল, শক্ত ব্যামো হইয়াছে, তাই কেবলি ঔষধ গিলাইতে লাগিল। বুড়া সুশীলেরও বড় গোল বাধিল। সে তাহার পূর্ব্বকালের অভ্যাস-মত যাহা করে, তাহাই তাহার সহ্য হয় না। পূর্ব্বে সে, পাড়ায় কোথাও যাত্রাগানের খবর পাইলেই, বাড়ী হইতে পলাইয়া, হিমে হোক্, বৃষ্টিতে হোক্ সেখানে গিয়া হাজির হইত। আজিকার বুড়া সুশীল সেই কাজ করিতে গিয়া—সর্দ্দি হইয়া, কাসি হইয়া, গায়ে মাথায় ব্যথা হইয়া—তিন হপ্তা শয্যাগত হইয়া পড়িয়া রহিল। চিরকাল সে পুকুরে স্নান করিয়া আসিয়াছে, আজও তাহা করিতে গিয়া হাতের গাঁট, পায়ের গাঁট ফুলিয়া বিষম বাত উপস্থিত হইল; তাহার চিকিৎসা করিতে ছয় মাস গেল! তাহার পর হইতে দুইদিন অন্তর সে গরম জলে স্নান করিত এবং সুবলকেও কিছুতেই পুকুরে স্নান করিতে দিত না। পূর্ব্বেকার অভ্যাস-মত, ভুলিয়া তক্তাপোষ হইতে সে লাফ দিয়া নামিতে যায়, আর হাড়গুলা টন্ টন্ ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠে। মুখের মধ্যে আস্ত পান পুরিয়াই হঠাৎ দেখে, দাঁত নাই, পান চিবান অসাধ্য। ভুলিয়া চিরুণী ব্রুশ্ লইয়া মাথা আঁচড়াইতে গিয়া দেখে, প্রায় সকল মাথাতেই টাক্। এক একদিন হঠাৎ ভুলিয়া যাইত যে, সে তাহার বাপের বয়সী বুড়া হইয়াছে এবং ভুলিয়া পূর্ব্বের অভ্যাস মত দুষ্টামি করিয়া পাড়ার বুড়ী আন্দিপিসীর জলের কলসে হঠাৎ ঠন্ করিয়া ঢিল ছুড়িয়া মারিত—বুড়া মানুষের এই ছেলেমানুষী দুষ্টামি দেখিয়া, লোকেরা তাহাকে মার্ মার্ করিয়া তাড়াইয়া যাইত, সে-ও লজ্জায় মুখ রাখিবার জায়গা পাইত না!

সুবলচন্দ্র এক একদিন দৈবাৎ ভুলিয়া যাইত যে, সে আজকাল ছেলেমানুষ হইয়াছে! আপনাকে পূর্ব্বের মত বুড়া মনে করিয়া, যেখানে বুড়া মানুষেরা তাস, পাসা খেলিতেছে, সেইখানে গিয়া সে বসিত এবং বুড়ার মত কথা বলিত, শুনিয়া সকলেই তাহাকে "যা যা, খেলা করগে যা, জ্যাঠামি ক'রতে হবে না"—বলিয়া কাণ



বুড়ী আন্দিপিসির জলের কলসে ঢিল ছুড়িয়া মারিত—৭৬ পৃষ্ঠা।

ধরিয়া বিদায় করিয়া দিত। হঠাৎ ভুলিয়া মাষ্টারকে গিয়া বলিত, "দাও ত, তামাকটা দাও ত, খেয়ে নিই।"—শুনিয়া মাষ্টার তাহাকে বেঞ্চের উপর এক পায়ে দাঁড় করাইয়া দিত। নাপিতকে গিয়া বলিত, "ওরে বেজা, ক'দিন আমাকে কামাতে আসিস্ নি কেন?"

নাপিত ভাবিত, ছেলেটি খুব ঠাট্টা করিতে শিখিয়াছে। সে উত্তর দিত, "আর বছর দশেক বাদে আসব অখন!" আবার এক একদিন তাহার পূর্ব্বের অভ্যাস-মত তাহার ছেলে সুশীলকে গিয়া মারিত।

সুশীল ভারি রাগ করিয়া বলিত—"পড়াশুনো ক'রে তোমার এই বুদ্ধি হচ্চে? একরত্তি ছেলে হ'য়ে বুড়ো মানুষের গায়ে হাত তোল!"—অমনি চারিদিক্ হইতে লোক জন ছুটিয়া আসিয়া, কেহ কিল, কেহ চড়, কেহ গালি দিতে আরম্ভ করে।

তখন সুবল একান্ত মনে প্রার্থনা করিতে লাগিল যে, "আহা, যদি আমি ছেলে সুশীলের মত বুড়া হই এবং স্বাধীন হই, তাহা হইলে বাঁচিয়া যাই!"

সুশীলও প্রতিদিন যোড়হাত করিয়া বলে, "হে দেবতা, আমার বাপের মত আমাকে ছোট করিয়া দাও, মনের সুখে খেলা করিয়া বেড়াই। বাবা যে রকম দুষ্টামি আরম্ভ করিয়াছেন, উঁহাকে আর আমি সাম্‌লাইতে পারি না, সর্ব্বদা ভাবিয়া অস্থির হইলাম।"

তখন ইচ্ছা-ঠাকরুণ আসিয়া বলিলেন, "কেমন, তোমাদের সখ্ মিটিয়াছে?" তাঁহারা দুজনে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন,—"দোহাই ঠাকরুণ, মিটিয়াছে! এখন আমরা যে যাহা ছিলাম, আমাদিগকে তাহাই করিয়া দাও।"

ইচ্ছা-ঠাকরুণ বলিলেন—"আচ্ছা, কাল সকালে উঠিয়া তাহাই হইবে।"

পরদিন সকালে সুবল পূর্ব্বের মত বুড়া হইয়া এবং সুশীল ছেলে হইয়া জাগিয়া উঠিলেন। দুইজনেরই মনে হইল যে, 'স্বপ্ন হইতে জাগিয়াছি।' সুবল গলা ভার করিয়া বলিলেন,—"সুশীল, ব্যাকরণ মুখস্থ ক'র্‌বে না?"

সুশীল মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিল, "বাবা আমার বই হারিয়ে গেছে!"

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মাছেদের রাণী কঙ্কাবতী

নৌকার সহিত কঙ্কাবতীও ডুবিয়া গেলেন। কঙ্কাবতী জলের ভিতর ক্রমেই ডুবিতে লাগিলেন; ক্রমেই নীচে যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে অনেক দূর চলিয়া গেলেন। তখন নদীর যত মাছ সব একত্র হইল। নদীর ভিতর মহা-কোলাহল পড়িয়া গেল যে "কঙ্কাবতী আসিতেছেন।" রুই বলে,—"কঙ্কাবতী আসিতেছেন,"

পুঁটি বলে,—"কঙ্কাবতী আসিতেছেন।" সবাই বলে,—"কঙ্কাবতী আসিতেছেন।" পথ-পানে এক দৃষ্টে চাহিয়া জলচর জীব-জন্তু সব যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, ক্রমে কঙ্কাবতী আসিয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন। সকলেই কঙ্কাবতীর আদর করিল। সকলেই বলিল,—"এস এস, কঙ্কাবতী এস।"

মাছেদের ছেলে-মেয়েরা বলিল,—"আমরা কঙ্কাবতীর সঙ্গে খেলা করিব।"

বৃদ্ধা কাৎলা মাছ তাহাদিগকে ধমক্ দিয়া বলিলেন,—"কঙ্কাবতীর এ খেলা করিবার সময় নয়। বাছার বড় গায়ের জ্বালা দেখিয়া আমি কঙ্কাবতীকে ঘাট হইতে ডাকিয়া আনিলাম। আহা! কত পথ আসিতে হইয়াছে। বাছার আমার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে! এস মা তুমি আমার কাছে এস। একটু বিশ্রাম কর, তার পর তোমার একটা বিলি করা যাইবে।"

কঙ্কাবতী আস্তে আস্তে কাৎলা মাছের নিকট গিয়া বসিলেন।

এদিকে কঙ্কাবতী বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, ওদিকে জলচর জীব-জন্তুগণ মহাসমারোহে একটি সভা করিলেন। তপস্বী মাছের দাড়ি আছে দেখিয়া সকলে তাঁহাকে সভাপতিরূপে বরণ করিলেন। "কঙ্কাবতীকে লইয়া কি করা যায়"—সভায় এই কথা লইয়া বাদানুবাদ হইতে লাগিল।

অনেক বক্তৃতার পর, চতুর বাটা মাছ প্রস্তাব করিলেন,—"এস ভাই! কঙ্কাবতীকে আমরা আমাদের রাণী করি।"

এই কথাটি সকলের মনোনীত হইল। চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠিল।

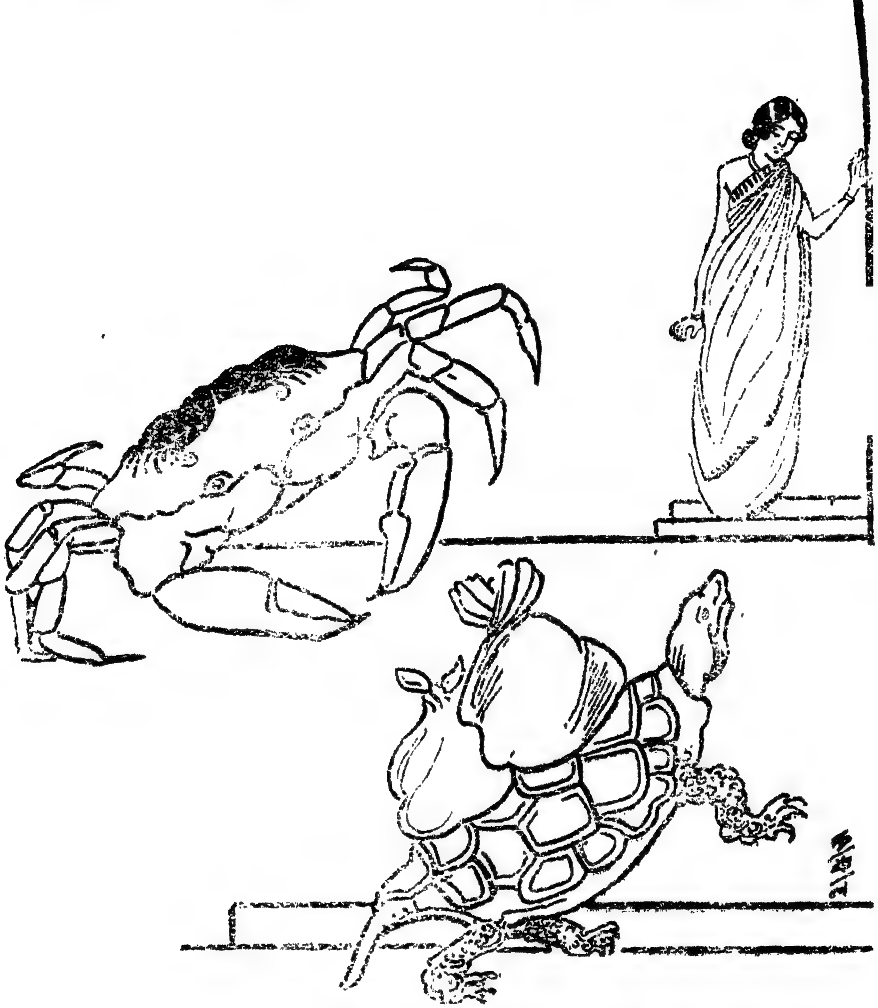
মাছেদের আর আনন্দের পরিসীমা নাই। সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল যে,—ভাই! কঙ্কাবতী আমাদের রাণী হইলে, আর আমাদের কোন ভাবনা থাকিবে না। বঁড়্শী দিয়া আমাদিগকে কেহ গাঁথিলে হাত দিয়া কঙ্কাবতী সূতাটি ছিঁড়িয়া দিবেন। জেলেরা জাল ফেলিলে, ছুরি দিয়া কঙ্কাবতী জালটি কাটিয়া দিবেন। কঙ্কাবতী রাণী হইলে আর আমাদের কোনও ভয় থাকিবে না। এস, এখন সকলে কঙ্কাবতীর কাছে যাই, আর কঙ্কাবতীকে গিয়া বলি যে, কঙ্কাবতি, তোমাকে আমাদের রাণী হইতে হইবে।

তাহার পর মাছেরা কঙ্কাবতীর কাছে যাইল, আর সকলে বলিল,—"কঙ্কাবতি! তোমাকে আমাদের রাণী হইতে হইবে।"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"এখন আমি তোমাদের রাণী হইতে পারিব না। আমার শরীরের সুখ নাই, আমার মনেও বড় অসুখ। তাই এখন আমি তোমাদের রাণী হইতে পারিব না।"

তখন কাৎলানী বলিলেন, "তোমরা রাজ-পোষাক প্রস্তুত করিয়াছ? রাজ-পোষাক না পাইলে কঙ্কাবতী তোমাদের রাণী হইবে কেন?"

এই কথা শুনিয়া মাছেরা সব বলিল—"ও হো বুঝেছি বুঝেছি? রাজ-পোষাক



কচ্ছপের পিঠে টাকা-মোহর বোঝাই দেওয়া হইল। ততক্ষণে কাঁকড়া মহাশয় মাথা আঁচড়াইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন—৮১ পৃষ্ঠা।

না পাইলে কঙ্কাবতী রাণী হইবে না। রাঙা কাপড় চাই, মেঘের মত পোষাক চাই, তবে কঙ্কাবতী রাণী হইবে।"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"না গো না! রাঙা কাপড়ের জন্য নয়। সাজিবার গুজিবার সাধ আমার নাই। একেলা বসিয়া কেবল কাঁদি, এখন আমার এই সাধ।"

মাছেরা সে কথা শুনিল না। বিষম কোলাহল উপস্থিত করিল। তাহাদের কোলাহলে অস্থির হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাল! না হয় আমি তোমাদের রাণী হইলাম। এখন আমাকে করিতে হইবে কি?"

মাছেরা উত্তর করিল,—"করিতে হইবে কি? কেন দরজীর বাড়ী যাইতে হইবে, গায়ের মাপ দিতে হইবে, পোষাক পরিতে হইবে।"

সকলে তখন কাঁকড়াকে বলিলেন,—"কাঁকড়া মহাশয়! আপনি জলেও চলিতে পারেন, স্থলেও চলিতে পারেন, আপনি বুদ্ধিমান লোক। চক্ষু দুইটি যখন আপনি পিট্ পিট্ করেন, বুদ্ধির আভা তখন তাহার ভিতর চিক্ চিক্ করিতে থাকে। কঙ্কাবতীকে সঙ্গে লইয়া আপনি দরজীর বাড়ী গমন করুন। ঠিক করিয়া কঙ্কাবতীর গায়ের মাপটি দিবেন, দামী কাপড়ের জামা করিতে বলিবেন। কচ্ছপের পিঠে বোঝাই দিয়া টাকা-মোহর লইয়া যান্। যত টাকা লাগে, তত টাকা দিয়া, কঙ্কাবতীর ভাল কাপড় করিয়া দিবেন।"

কাঁকড়া মহাশয় উত্তর করিলেন,—"অবশ্যই আমি যাইব। কঙ্কাবতীর ভাল কাপড় হয়, ইহাতে কাহার না আহ্লাদ? আমাদের রাণীকে ভাল করিয়া না সাজাইলে গুজাইলে, আমাদের অখ্যাতি। তোমরা কচ্ছপের পিঠে টাকা-মোহর বোঝাই দাও, আমি ততক্ষণ ঘর হইতে পোষাকি কাপড় পরিয়া আসি, আর মাথার মাঝে সিঁথি কাটিয়া আমার চুলগুলি বেশ ভাল করিয়া ফিরাইয়া আসি।"

কচ্ছপের পিঠে টাকা-মোহর বোঝাই দেওয়া হইল। ততক্ষণ কাঁকড়া মহাশয় ভাল কাপড় পরিয়া, মাথা আঁচড়াইয়া, ফিট্-ফাট হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কঙ্কাবতী করেন কি? সকলের অনুরোধে তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন। কাঁকড়া মহাশয় আগে, কঙ্কাবতী মাঝখানে, কচ্ছপ পশ্চাতে, এইরূপে তিন জনে যাইতে লাগিলেন।

প্রথম অনেক দূর জল-পথে যাইলেন, তার পর অনেক দূর স্থলপথে যাইলেন। পাহাড়, পর্ব্বত, বন, জঙ্গল অতিক্রম করিয়া অবশেষে বুড়া দরজীর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

বুড়া দরজী চশমা নাকে দিয়া কাঁচি হাতে করিয়া কাপড় সেলাই করিতে ছিলেন। দূরে পাহাড়-পানে চাহিয়া দেখিলেন যে, তিন জন কাহারা আসিতেছে। মনে মনে ভাবিলেন,—"ও কাহারা আসে?" নিকটে আসিলে চিনিতে পারিলেন।

তখন বুড়া দরজী বলিলেন,—"কে ও কাঁকড়া ভায়া?"

কাঁকড়া মহাশয় উত্তর করিলেন,—"হ্যাঁ দাদা! কেমন, ভাল আছ তো?"

দরজী বলিলেন, "আর ভাই! আমাদের আর ভাল থাকা না থাকা! এখন গেলেই হয়। তোমরা সৌখীন পুরুষ; তোমাদের কথা স্বতন্ত্র। এখন কি মনে করিয়া আসিয়াছ, বল দেখি?"

কাঁকড়া উত্তর করিলেন,—"এই কঙ্কাবতীকে আমরা আমাদের রাণী করিয়াছি। কঙ্কাবতীর জন্য ভাল জামা চাই, তাই তোমার নিকট আসিয়াছি।"

দরজী বলিলেন,—"বটে! তা আমার নিকট উত্তম উত্তম জামা আছে। ভাল পাটনাই খেরোর জামা আছে। টক্-টকে লাল খেরো, রং উঠিতে জানে না, ছিঁড়িতে জানে না, আগা-গোড়া আমি বখেই দিয়া সেলাই করিয়াছি। তোমাদের রাণী কঙ্কাবতী যদি শিমূল তূলা হয়, তো পরাও, অতি উত্তম দেখাইবে। দামের জন্য আটক খাইবে না। এখন টিপিয়া দেখ দেখি? কঙ্কাবতী শিমূল তূলা কি না?"



বুড়া দরজী

দাড়া দিয়া কাঁকড়া মহাশয় কঙ্কাবতীর গা টিপিয়া টিপিয়া দেখিলেন। তার পর দরজীর পানে চাহিয়া বলিলেন,—"কৈ না! সেরূপ নরম তো নয়!"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"খেরোর খোল পাইয়া তোমরা আমাকে বালিশ করিবে না কি? এই সকলে মিলিয়া আমাকে রাণী করিলে, তবে আবার বালিশ করিবার পরামর্শ করিতেছ কেন?"

দরজী উত্তর করিলেন,—"ঈশ্! মেয়ের যে আস্পা ভারি! বালিশ হ'বে না তো কি তাকিয়া হইতে চাও না কি?"

দরজীর এইরূপ নিষ্ঠুর বচনে কঙ্কাবতীর মনে বড় দুঃখ হইল: কঙ্কাবতী কাঁদিতে লাগিলেন।

কাঁকড়া মহাশয় বলিলেন,—"তুমি ছেলে-মানুষ! আমাদের কথায় কথা কও

কেন বল দেখি? যা' তোমার পক্ষে ভাল তাই আমরা করিতেছি, চুপ করিয়া দেখ। চুপ কর; কাঁদিতে নাই।"

এইরূপ সান্ত্বনা-বাক্য বলিয়া কাঁকড়া মহাশয় আপনার বড় দাড়া দিয়া মুখ মুছাইয়া দিলেন। তাহাতে কঙ্কাবতীর মুখ ছড়িয়া গেল।

বুড়া দরজী বলিলেন,—"তাই তো! তবে এর গায়ের জামা আমার কাছে নাই। এর জামা কাটিতেও জানি না সেলাই করিতেও জানি না।"

কাঁকড়া মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে এখন উপায়? ভাল জামা কোথায় পাই?

বুড়া দরজী বলিলেন,—"তুমি এক কাজ কর, তুমি খলীফা সাহেবের কাছে যাও। খলীফা সাহেব ভাল কারিকর; খলীফা সাহেবের মত কারিকর এ পৃথিবীতে নাই, তাহার কাছে নানাবিধ কাপড় আছে, সে কাপড় পরিলে খাঁদারও নাক হয়।"

এই কথায় কাঁকড়া মহাশয়ের রাগ হইল। তিনি বলিলেন,—"তুমি কি আমাকে ঠাট্টা করিতেছ না কি? তোমার না হয় নাকটি একটু বড়; আমার না হয় নাকটি ছোট, তা'তে আবার ঠাট্টা কিসের?

বুড়া দরজী উত্তর করিলেন,—"না না! তা কি কখনও হয়! তোমাকে আমি ঠাট্টা করিতে পারি? কেন? তোমার নাকটি মন্দ কি? কেবল দেখিতে পাওয়া যায় না, এই দুঃখের বিষয়!"

বুড়া দরজীর এইরূপ প্রিয় বচনে কাঁকড়া মহাশয়ের রাগ পড়িল। সন্তোষ লাভ করিয়া তিনি উত্তর করিলেন,—"তা বটে! তা বটে! আমার নাকটি ভাল, তবে দোষের মধ্যে এই যে দেখিতে পাওয়া যায় না। কোথায় আছে আমি নিজেই খুঁজিয়া পাই না। যদি দেখিতে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে আমার নাক দেখিয়া সকলেই প্রশংসা করিত, সকলেই বলিত, আহা! কাঁকড়ার কি নাক! যেন বাঁশীর মত। আর যাহারা ছড়া বাঁধে তাহারা লিখিত—'তিল ফুল জিনি নাসা'! কিংবা 'শুকচঞ্চু মত নাশা!' যা বল, যা কও, আমার অতি সুন্দর নাক।"

কঙ্কাবতী ভাবিলেন,—'ব্যাপারখানা কি? আমি দেখিতেছি, সব পাগলের হাতে পড়িয়াছি। এ কাঁকড়াটা তো বদ্ধ পাগল। এরে পাগলা গারদে রাখা উচিত।' মুখ ফুটিয়া কিন্তু কঙ্কাবতী কিছু বলিলেন না।

সকলে পুনরায় সেখান হইতে চলিলেন। আগে কাঁকড়া মহাশয়, তাহার পর কঙ্কাবতী, শেষে কচ্ছপ। এইরূপে তিনজনে যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে

অনেক দূর গিয়া অবশেষে খলীফা সাহেবের ঘরে উপস্থিত হইলেন। তখন অন্দরমহলে ছিলেন।

কাঁকড়া মহাশয় বাহির হইতে ডাকিলেন,—"খলিফা সাহেব! খলীফা সাহেব!"

ভিতর হইতে খলীফা উত্তর দিলেন,—"কে হে! কে ডাকাডাকি করে?"

কাঁকড়া মহাশয় উত্তর করিলেন,—"আমি কাঁকড়াচন্দ্র। একবার বাহিরে আসুন, বিশেষ কাজ আছে।"

খলীফা বাহিরে আসিলেন। কাঁকড়াচন্দ্রকে দেখিয়া অতি সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন।

খলীফা বলিলেন,—"আসুন, আসুন, কাঁকড়া বাবু আসুন! আর এই যে কচ্ছপ বাবুকেও দেখিতেছি! কচ্ছপ বাবু! আপনি ঐ টুলটিতে বসুন, আর কাঁকড়া বাবু! আপনি ঐ চেয়ারখানি নিন্! এ মেয়েটিকে বসিতে দিই কোথায়? দিব্য মেয়েটি! কাঁকড়া বাবু! এ কন্যাটি কি আপনার?"

কাঁকড়াচন্দ্র উত্তর করিলেন,—"না, এ কন্যাটি আমার নয়, আমি বিবাহ করি নাই। ওঁর জন্যই এখানে আসিয়াছি। ওঁরে আমরা আমাদের রাণী করিয়াছি। এক্ষণে রাজ-পরিচ্ছদের প্রয়োজন। তাই আপনার নিকট আসিয়াছি! এঁর জন্য অতি উত্তম রাজ-পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে।"

খলিফা উত্তর করিলেন,—"রাজ-পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে পারি। আমার কাছে রেশম আছে, পশম আছে, সাটিন আছে, মায় বারাণসী কিংখাপ পর্য্যন্ত আছে। কিন্তু রাজ-পোষাক তো আর অমনি হয় না? তাতে হীরা বসাইতে হইবে মতি বসাইতে হইবে, জরি-লেস্ প্রভৃতি ভাল ভাল দ্রব্য লাগাইতে হইবে। অনেক টাকা খরচ হইবে। টাকা দিতে পারিবেন তো?"

কাঁকড়াচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন,—"আমাদের টাকার অভাব কি? যত নৌকা-জাহাজ ডুবি হয়, তাহাতে যে টাকা থাকে সে-সব কোথায় যায়? সে সকল আমাদের প্রাপ্য। এক্ষণে আপনার কত টাকা চাই, তা বলুন?"

খলীফা উত্তর করিলেন,—"যদি দুই তোড়া টাকা দিতে পারেন, তাহা হইলে উত্তম রাজ-পোষাক প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি।"

কাঁকড়া তৎক্ষণাৎ কচ্ছপের পিঠ হইতে লইয়া দুই তোড়া মোহর খলীফার সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। খলীফা অনেক রাজার পোষাক, অনেক বাবুর পোষাক প্রস্তুত করিয়াছিলেন—কিন্তু একবারে দুই তোড়া মোহর কেহ কখনও তাঁহাকে দেয় নাই।

মোহর দেখিয়া কঙ্কাবতী ব্যাকুল হইয়া বলিলেন,—"ওগো! তোমরা এ টাকাগুলি আমাকে দাও। আমি বাড়ী লইয়া যাই। আমার বাবা বড় টাকা ভালবাসেন, এত টাকা পাইলে বাবা কত আহ্লাদ করিবেন। এই ময়লা কাপড় পরিয়াই আমি না হয় তোমাদের রাণী হইব, ভাল কাপড়ে আমার কাজ নাই। তোমাদের পায়ে পড়ি, এই টাকাগুলি আমাকে দাও, আমি বাবাকে গিয়া দিই।"

কাঁকড়া কঙ্কাবতীকে বকিয়া উঠিলেন। কাঁকড়া বলিলেন, "তুমি বড় অবাধ্য মেয়ে দেখিতেছি! একবার তোমাকে মানা করিয়াছি যে, তুমি ছেলেমানুষ, আমাদের কথায় কথা কহিও না। চুপ করিয়া দেখ আমরা কি করি।"

কি করিবেন? কঙ্কাবতী চুপ করিয়া রহিলেন। মোহর পাইয়া খলীফার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি বলিলেন,—"টাকাগুলি বাড়ীর ভিতর রাখিয়া আসি, আর ভাল ভাল কাপড় বাহির করিয়া আনি। এই ক্ষণেই তোমাদের রাণীর রাজ-বস্ত্র করিয়া দিব।"

বাটীর ভিতর খলিফা দুই তোড়া মোহর লইয়া যাইলেন। আহ্লাদে পুলকিত হইয়া দন্তপাতি বাহির করিয়া এক গাল হাসির সহিত সেই মোহর স্ত্রীকে দেখাইতে লাগিলেন।

স্ত্রী ত অবাক্! কি আশ্চর্য্য "আজ সকাল বেলা আমরা কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম?" খলীফানী এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে প্রকাশ্যে খলীফানী বলিলেন,—এবার কিন্তু আমাকে ডায়মনকাটা তাবীজ গড়াইয়া দিতে হইবে।"

তাহার পর খলীফা কঙ্কাবতীকে বাটীর ভিতর লইয়া গেলেন। স্ত্রীকে বলিলেন,—"ইনি রাণী। এঁর নাম কঙ্কাবতী। এঁর জন্য রাজ-পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে হইবে। অতি সাবধানে তুমি ইহার গায়ের মাপ লও!"

খলীফানী কঙ্কাবতীর গায়ের মাপ লইলেন। অনেক লোক নিযুক্ত করিয়া অতি সত্বর খলীফা রাজ-বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। খলীফা-রমণী যত্নে সেই পোষাক কঙ্কাবতীকে পরাইয়া দিলেন। রাজ-পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া কঙ্কাবতীর রূপ ফাটিয়া পড়িতে লাগিল।

খলীফা-রমণী বলিলেন,—"আহা! মরি কি রূপ!"

খলীফা বলিলেন,—"মরি কি রূপ!"

সকলেই বলিলেন,—"মরি কি রূপ!"

রাজ-পরিচ্ছদ পরা হইলে কাঁকড়া ও কচ্ছপ, কঙ্কাবতীকে লইয়া, পুনরায় গৃহাভিমুখে চলিলেন। অনেক স্থল অনেক জল অতিক্রম করিয়া তিন জনে



আহ্লাদে পুলকিত হইয়া দন্তপাতি বাহির করিয়া একগাল হাসির সহিত সেই মোহর স্ত্রীকে দেখাইতে লাগিলেন--৮৫ পৃষ্ঠা।

পুনরায় নদীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইলে, কঙ্কাবতীর মনোহর রূপ, মনোহর পরিচ্ছদ দেখিয়া, সকলেই চমৎকৃত হইল। সকলেই

'ধন্য ধন্য' করিতে লাগিল। সকলেই বলিল,—"আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা কঙ্কাবতী হেন রাণী পাইলাম।"

এক্ষণে একটি মহাভাবনার বিষয় উপস্থিত হইল। জলচর জীবগণের এখন এই ভাবনা হইল যে, রাণী থাকেন কোথায়? যে সে রাণী নয়, কঙ্কাবতী রাণী! যেরূপ জগৎসুশোভিনী মনোমোহিনী কঙ্কাবতী রাণী, সেইরূপ সুসজ্জিত, অলঙ্কৃত, মনোমোহিত অট্টালিকা চাই। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে সকলে স্থির করিলেন যে, রাণী কঙ্কাবতীর নিমিত্ত মতি-মহলই উপযুক্ত স্থান। যাহাকে মতি বলে, তাহাকেই মুক্তা বলে। মুক্তার যথায় উৎপত্তি, মুক্তার যথায় স্থিতি, সেই স্থানকে 'মতি-মহল' বলে।

রুই প্রভৃতি মৎস্যগণ যোড়হাত করিয়া কঙ্কাবতীকে বলিলেন,—"রাণী ধিরাণী মহারাণী! মতি-মহল আপনার বাসের উপযুক্ত স্থান, আপনি ঐ মতি-মহলে গিয়া বাস করুন।"

এইরূপে সসম্ভ্রমে সম্ভাষণ করিয়া মাছেরা কঙ্কাবতীকে একটি ঝিনুক দেখাইয়া দিল। ঝিনুকের ভিতর মুক্তা হয় বলিয়া, ঝিনুকের নাম মতি-মহল। কঙ্কাবতী সেই ঝিনুকের ভিতর প্রবেশ করিলেন। ঝিনুকের ভিতর বাস করিয়া কঙ্কাবতী মাছেদের রাণীগিরি করিতে লাগিলেন।

—স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

উরশিমার গল্প

উরশিমা—জেলেদের ছেলে—সমুদ্রে ছিপ ফেলে মাছ ধরছিল। নীল জলের ঢেউয়ে তার নৌকাখানা হেলচে-দুলচে, আর উরশিমা চুপটি কোরে তার উপরে বসে আছে। রোজ সে এমনি কোরে ছিপ ফেলে মাছ ধরে; বাড়ী নিয়ে গিয়ে রেঁধে খায়; কিন্তু সেদিন হলো কি? না, মাছ না উঠে বঁড়শির মুখে উঠল প্রকাণ্ড একটা কাছিম!

কাছিম কত দিন বাঁচে, জান? হাজার বছর! উরশিমা এ কথা জানত, তাই সে কাছিমটি হাতে কোরে মনে-মনে ভাবতে লাগল—'আমার মাছ হলেও চলে, কাছিম হলেও চলে, বরঞ্চ কাছিমের চেয়ে মাছটাই লাগে ভালো। এর ত পরমায়ু হাজার বছর,—আজ যদি একে ছেড়ে দিই, তবে বেচারা এখনো নয় শত নিরানব্বই

বছর সমুদ্রের জলে সাঁতার কেটে খেলে বেড়াতে পারবে ;—নিজের পেট ভরাবার জন্যে একে মেরে ফেলা কি ভালো ?' এই কথা ভেবে উরশিমা সমুদ্রের কাছিম সমুদ্রেই ছেড়ে দিলে। কাছিমটা জলে প'ড়ে অগাধ সমুদ্রে মিশিয়ে গেল !

উরশিমা বসে মাছ ধরছে। ধরতে-ধরতে তার গা-টা কেমন এলিয়ে এলো, চোখ ঢুলে পড়ল, হাত থেকে ছিপ খসে গেল। সমস্ত দিনের গরমের পর বিকেলের ফুর-ফুরে হাওয়া পেয়ে নৌকার উপরে উরশিমা অকাতরে ঘুমিয়ে পড়ল।

কতক্ষণ পরে ঘুম ভেঙে হঠাৎ উরশিমা চেয়ে দেখে,—সামনে পাহাড়ের মতো একটা প্রকাণ্ড কালো ঢেউ ! সেই ঢেউয়ের উপর পরীর মতো এক অপরূপ সুন্দরী মেয়ে ;– যেন কালো মেঘের মাঝে বিদ্যুৎ ! ঢেউটা ক্রমেই নৌকার কাছে এলো। মেয়েটি ধীরে-ধীরে এসে নৌকায় উঠল। উরশিমা অবাক্ ! কোন কথা কইতে পারলে না ! মেয়েটি তখন বল্লে—"দেখ, এই যে সমুদ্র, এর যিনি রাজা, আমি তাঁরই মেয়ে। ঐ যে ঐখানে ঐ অনেক দূরে, বড় বড় ঢেউ দেখছ, ওরই ওপারে আমাদের বাড়ী ; সেখানে আমার বাবা আর আমি থাকি। এই যে একটু আগে একটা কাছিম ধরেছিলে, সে কে ? জান না বুঝি ? আমিই,—কাছিম হ'য়ে তোমার কাছে এসেছিলুম। দেখছিলুম, তুমি কেমন ছেলে, তোমার শরীরে দয়া-মায়া আছে কি না,—তুমি আমায় মার কি রাখো ? বাবা তোমার কথা শুনে ভারী খুসী হয়েছেন ; তোমাকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যেতে বলেছেন। চল তুমি আমার সঙ্গে। নীল ঢেউয়ের ওপারে আমাদের অজগর-পুরী ;—সেইখানে আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকব। আমার খেলার সঙ্গী কেউ নেই ; তুমি আমার সঙ্গে খেলবে, আমার সঙ্গে বেড়াবে,—আর আমায় বিয়ে কোরো ;—সে বেশ হবে, না ? চল ভাই, আমরা যাই।"

মেয়েটি এসে হাল ধরলে, উরশিমা দাঁড় ধরলে,—দু'জনে মিলে নৌকা বাইচে। উরশিমা দাঁড়ই টানচে, দাঁড়ই টানচে, মেয়েটি হাল ধোরে বসেই আছে, নৌকা ভেসেই চলেছে। এমনি কোরে তারা কত ঢেউ পেরিয়ে কতদূর চ'লে সেই অজগর-পুরীর সামনে এসে থামল। সেখানে সেই সমুদ্রের রাজা রাজত্ব করেন। মাছ, ব্যাং, কাছিম, হাঙর, কুমীর, সাপ,—আরো কত কি জলের জানোয়ার তাঁর প্রজা।

উরশিমা চেয়ে দেখে সে বড় মজার জায়গা। সেখানকার যে রাজবাড়ী তার প্রাচীর ইট-চূণ-সুর্কির নয়,—রগ্‌রগে প্রবাল দিয়ে তৈার। সেখানকার গাছের পাতা ঝক্‌ঝকে হীরার ; গাছের ফল ধব্‌ধবে মুক্তার ; মাছের ডানা চক্‌চকে রূপার ; হাঙরের ল্যাজ টক্‌টকে সোনার ! পৃথিবীর মধ্যে যত ভালো-ভালো সুন্দর সুন্দর জিনিষ আছে, সব যেন একসঙ্গে মিলে সেই রাজপুরীটা গড়ে তুলেছে।

উরশিমা ভাবলে, রাজকন্যাকে বিয়ে করলে এ সব ত আমারই হবে ;—আনন্দে তার মন নাচতে লাগল।

রাজকন্যাকে বিয়ে কোরে উরশিমা সেই প্রবালের প্রাচীর-ঘেরা রাজবাড়ীর



সেই ঢেউয়ের উপর পরীর মতো এক অপরূপ সুন্দরী মেয়ে—৮৮ পৃষ্ঠা

মধ্যে মনের আনন্দে আছে। সেই যে হীরের পাতা, মুক্তার ফলগাছ তারই তলে-তলে দুজনে খেলে বেড়ায় ; সোনালী-রূপালী মাছ ধরে ; সোনার হাঙরের পিঠে চ'ড়ে বেড়ায়। এমনি করে তিনটি বছর কেটে গেল।

একদিন উরশিমা স্ত্রীকে বল্লে—"দেখ, এখানে খুব সুখে আছি বটে, কিন্তু বাপ-

মা, ভাই-বোনেদের জন্যে বড় মন কেমন করছে। অনেক দিন তাদের দেখি নি; তুমি ছেড়ে দাও, তা'হলে তাদের একবার দেখে আসি।"

এই কথা শুনে তার স্ত্রী তাকে বল্লে—"দেখ, যেতে ইচ্ছে হয় যাও। কিন্তু আমার এই ভয় হচ্ছে যে, এ জায়গা ছেড়ে গেলেই যেন তোমার একটা বিপদ্ ঘটবে। তুমি বাপ-মাকে দেখে শীঘ্র এসো।"

এই কথা বোলে রাজকন্যা ভাঁড়ার ঘর থেকে একটা তোরঙ্গ হাতে কোরে এনে বল্লে—"এই নাও, এইটা সঙ্গে-সঙ্গে রেখো, তাহ'লে তোমার কখন বিপদ্ হবে না। কিন্তু খবরদার! এর ডালা কখনো খুলো না—তাহ'লেই মুস্কিল! যদি খোল, আমার কাছে আর ফিরে আসতে পারবে না কিন্তু।"

উরশিমা তোরঙ্গ হাতে কোরে নিয়ে বল্লে—"আচ্ছা! কখ্খনো খুলবো না; আমি এখন আসি ?"

উরশিমা নৌকায় উঠে নৌকা ছেড়ে দিলে। রাজকন্যা উরশিমার দিকে, উরশিমা রাজকন্যার দিকে চেয়ে আছে,—নৌকা ঢেউ ভেঙে ক্রমে দূরে চলেছে। এমনি কোরে যেতে-যেতে উরশিমা সেই পাহাড়ের মতো ঢেউয়ের ওপারে চলে গেল। দুজনে-দুজনকে আর দেখতে পেলে না। রাজকন্যা তখন আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বাড়ী ফিরে এলো। আর উরশিমা তার স্ত্রীর কথা, সেই হীরের পাতা, মুক্তার ফল-গাছের কথা ভাবতে-ভাবতে নীল সমুদ্রের নীল-নীল ঢেউ ভেঙে নৌকা চালাতে লাগল। শেষে নৌকা এসে তীরে ভিড়ল।

তীরে উঠে দেখে—এ কি ব্যাপার! সব উলট-পালট! সে যে গ্রামে থাকত সে গ্রাম সেখানে নেই; যে কুঁড়ে ঘরখানিতে ঘুমোত, সেখানিও দেখা যাচ্ছে না, থাকবার মধ্যে আছে কেবল কুঁড়ের সামনে ছেলেবেলাকার সেই পাহাড়টা, আর তারই তলে সেই ছোট্ট নদীটি। আগেকার আর কিছুই নেই।

উরশিমা অবাক্ হ'য়ে গেল। কিছুই বুঝতে পারলে না। এই তিন বছরের মধ্যেই কেমন করে সব বদলে গেছে, সেই কথা আশ্চর্য্য হ'য়ে ভাবতে লাগল। দুজন অচেনা লোক সমুদ্রের তীর দিয়ে যাচ্ছিল। উরশিমা একটু এগিয়ে গিয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করলে—"হ্যাঁগা, এইখানে যে উরশিমা-জেলের কুঁড়ে ছিল, সেটা কোথা গেল বলতে পার ?"

এই কথা শুনে লোক দুটো হো-হো কোরে হেসে উঠে বল্লে—"তুমি পাগল না কি! ঠাকুর্দ্দার মুখে গল্প শুনি বটে যে, তিন-চার শত বছর আগে উরশিমা বোলে এক জেলে এইখানে থাকত। একদিন সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে আর ফিরে আসে নি;—

কোথায় গেল, কি হলো, কেউ জানে না। তার বাপ-মা, ভাই-বোন তাদের ছেলে-পুলে অনেক দিন হলো মারা গেছে। সে-বংশের এখন আর কেউ নেই। তুমি কেমনতর লোক হে, যে সেই উরশিমার খোঁজ কর?"

এই কথা শুনে উরশিমার খেয়াল হলো, সে দেশ, যে-দেশে সেই মস্ত অজগর-পুরী—যার প্রাচীর প্রবালের, যেখানে হীরের পাতা, মুক্তার ফল-গাছ, সোনালী রূপালী মাছ, সোনার-ল্যাজ-হাঙর, সে-দেশ কখনো মানুষের দেশ নয়; নিশ্চয়ই পরীর দেশ! সেখানকার একদিন হয়ত এখানকার এক শত বছর, সেখানকার তিন বছর এখানকার তিন শত বছর।

উরশিমা এখন কি করে? সেখানে তার মা নেই, বাপ নেই, ভাই নেই, বোন নেই, আপনার লোক কেহ নেই; তেমন জায়গায় সে কেমন কোরে থাকে? আর কার কাছেই বা সে দাঁড়ায়? স্ত্রীর কাছে ফিরে যাই—এই মনে কোরে সে আবার নৌকায় উঠল।

অপার সমুদ্র ধূ-ধূ করছে যে দিকেই চায় সেই দিকেই নীল জলের ঢেউ সব যেন একাকার। অজগর-পুরী যে কোথায় তার কোন চিহ্নই চোখে পড়ে না। অগাধ সমুদ্রে সে পথ হারিয়ে ফেলেছে। এখন কি করে? কি করে সে স্ত্রীর কাছে ফিরে যায়? কে তাকে পথ বলে দেয়? সে ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারলে না। তখন তার মনে হলো, স্ত্রী তাকে যে তোরঙ্গটি দিয়েছে, নিশ্চয় সেইটে খুল্লেই অজগর-পুরীর একটা ঠিকানা পাওয়া যাবে।

তোরঙ্গটি যেমন খোলা, অমনি তার ভিতর থেকে খানিকটা সাদা ধোঁয়া হুস্ কোরে বেরিয়ে, সমুদ্রের উপর দিয়ে মেঘের সঙ্গে মিশিয়ে গেল। তখন উরশিমার চট্ কোরে মনে পড়ল, আর সে স্ত্রীর কাছে ফিরে যেতে পারবে না! তখন তার কান্না পেতে লাগল। সংসারে কারুর কাছে দাঁড়াবার আর ঠাঁই নেই! সে হাত তুলে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে কেঁদে-কেঁদে সেই মেঘটাকে ফিরে ডাকতে লাগল। ইচ্ছা হচ্ছিল, ছুটে গিয়ে ধোরে আনে। কিন্তু সে মেঘ কোথায়?—সে আকাশের মেঘের সঙ্গে মিশে এক হ'য়ে গেছে!

এই তোরঙ্গের ভিতরে উরশিমার পরমায়ু আর তার জ্বর, কম্প, শোক, দুঃখ, তার দাঁত-পড়া, চুল-পাকা, রোগ-হওয়া, চোখে-ছানি-পড়া আরো কত কি উৎপাত, হাঁড়ির ভিতর সাপের মতো বন্ধ ছিল। আজ হঠাৎ খোলা পেয়ে সব উৎপাতগুলো উরশিমাকে চারিদিক্ থেকে ছেঁকে ধরলে। উরশিমার নধর শরীর দেখতে-দেখতে রোগা হ'য়ে গেল, মুক্তার মত দাঁতগুলি একে-একে খসে পড়ল, মাথায় দুএক-গাছা

চুল যা রইল, তাও পেকে যেন শোণের নুড়ি হয়েছে! উরশিমা আর চোখে দেখতে পায় না, হাত কাঁপতে লেগেছে, কোমর ভেঙে পড়েছে; তবু সে প্রাণপণে নৌকা বেয়ে চলেছে। ওই সামনে পাহাড়ের মত কালো ঢেউ। দূরে ওই অজগর-পুরীর সোণার চূড়ো দেখা দিয়েছে। ওই না রাজকন্যার মত কে ছাদের উপরে? উরশিমা আর ভালো দেখতে পাচ্ছে না; তার দুটি চোখই ছানি পরে গেছে, আর দাঁড় টানবার শক্তি নেই; জ্বর কম্প দিয়ে এসে ধরেছে;—প্রাণ যায়!

উরশিমার নৌকা বিনা-পালে স্রোতমুখে ভেসে চল্লো। আর একটু গেলেই অজগর-পুরীর বাঁধা ঘাট। সেই ঘাটে রাজকন্যা এসে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু নৌকা আর চলতে চায় না!

উরশিমার নৌকাখানাও দেখতে-দেখতে হঠাৎ কতকালের পুরোনো হ'য়ে পড়ল;—তার রসারসি এলিয়ে গেল। কাঠগুলো ঘুণ-ধোরে ফোঁপরা মত হ'য়ে উরশিমার জীর্ণ তরী রাজপুরীর ঘাটের কাছে এসে বানচাল হল। পোড়া কাঠখানার মতো উরশিমার জীর্ণ দেহ সেই অতল সমুদ্রের তলায় কোথায় তলিয়ে গেল; আর অজগরপুরীতে ফিরে আসা হলো না!

—স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

ভুতুড়ে বই

মানুষের জীবনে এমন সব ঘটনা ঘটে, যার কোনও মানে পাওয়া যায় না। ভাবতে গেলে দিশেহারা হয়ে যেতে হয়। কেন ঘটলো কে জানে—বলে' চুপ ক'রে বসে থাকা ছাড়া আর উপায় নেই।

সে রকম ঘটনা যে সকলের জীবনে সব সময়েই ঘটছে তা নয়। কদাচিৎ কখনো কারো কারো জীবনে হয়তো' ঘটে থাকে। আমার জীবনে মাত্র একবার ঘটেছে।

গল্পটা বলি শোনো।

বর্ষাকাল! দিবারাত্রি ঝিম্ ঝিম্ করে বৃষ্টি পড়ছে। কলকাতার পথ-ঘাট সব কাদায় কাদায় একাকার হয়ে গেছে। বাড়ী থেকে বেরোবার উপায় নেই।

সেদিন বৈকালে বৃষ্টি একটু ধরেছিল। কয়েকদিন ধরে দিবারাত্রি কেমন যেন অন্ধকার-মেঘলা মেঘলা আকাশ আর কুয়াশার মত গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি দেখে দেখে প্রাণ যেন একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছে! হঠাৎ যেন একটুখানি সূর্য্যের আলো দেখা গেল। ছাতি হাতে নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

কোথায় যাব তার কোনও স্থিরতা নেই। মোটরের চাকায় কাদা ছিটকে একদিন আমার ফর্সা কাপড় জামা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল সে কথা আমি আজও ভুলি নি! তাই যথাসম্ভব কাপড় জামা সামলে ফুটপাথের এক পাশ ঘেঁসে চলেছি ত' চলেইছি। এমন উদ্দেশ্যহীনের মত কতক্ষণই বা ঘুরব?

পথের ধারে উঁচু একটা রকের উপর সারি সারি পুরনো বইএর দোকান। গত কয়েক দিনের বাদলের জন্যে দোকান তারা খুলতে পারে নি, আজ আকাশের অবস্থা একটু ফর্সা দেখে ভরসা করে' আবার তারা বই সাজিয়ে বসেছে।

ভাবলাম ভাল বই কিছু থাকে ত' দেখাই যাক্। বই দেখবার জন্যে দাঁড়ালাম। এটা-সেটা উল্‌টে-পালটে দেখছি। বাজার ক'দিন ধরে ভারি মন্দা গেছে। দোকানদার আমায় যা হোক একটা কিছু বই কেনাবার জন্যে একেবারে উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। কিন্তু ভাল বই একটাও নেই।

আকাশটা মনে হলো আবার যেন অন্ধকার করে' এসেছে। গুড়্ গুড়্ করে' একবার মেঘও ডেকে উঠলো! ভাবলাম কাজ নেই আর বই দেখে, বাড়ী ফিরে যাই।

ফেরবার জন্যে যেই পিছন ফিরেছি, এমনি অদৃষ্ট আমার হাতের ছাতিটার খোঁচা লেগে রকের উপর সারি-সারি সাজানো বইএর থাক্ থেকে একখানা বই হঠাৎ ছিট্‌কে রাস্তার ওপর পড়ে গেল। ছি ছি, করলাম কি!

বইখানা রাস্তা থেকে তুলতে গিয়ে দেখি—জলে-কাদায় কয়েকটা পাতা তার নষ্ট হয়ে গেছে। দোকানদার হায় হায় করতে লাগলো। দেখলাম এ অবস্থায় বইখানি দোকান দারের হাতে ফেরৎ দিয়ে চলে যাওয়া আমার উচিত নয়। বইখানা নষ্ট হ'লো যখন আমারই দোষে, দামটা অন্ততঃ তার দিয়ে দেওয়া ভাল।

জিজ্ঞাসা করলাম, "কত দাম?"

দোকানদার বললে, "দাম ত' তো বাবু বেশী নয়, চার আনা দাম, কিন্তু আজ চারদিন ধরে' একটি পয়সার বেচা-কেনা হয় নি!"

বেচারির মুখের অবস্থা দেখে দয়া হলো।

পকেট থেকে চার আনা পয়সা বের করে' তার হাতে দিলাম। দেখলাম,

লোকটি বেশ খুসী হয়ে উঠেছে। তৎক্ষণাৎ বইখানি সে তার কাপড় দিয়ে বেশ করে' মুছে একখানি কাগজ জড়িয়ে আমার হাতে দিয়ে বললে, "নিন বাবু।"

ও নিয়ে আর আমি কি করব! বললাম, "রেখে দাও তোমারই কাছে, কেউ নিতে চায় ত' তাকে বিক্রি করে' দিও।"



দোকানদার কিন্তু রাজী হলো না। বইএর দাম সে পেয়ে গেছে, সুতরাং বইখানি সে আমাকে গছিয়ে দেবেই। দেখলাম বই-এর নাম 'ধর্ম্ম ও জীবন।'

—দূর ছাই! ও বই নিয়ে আমিই বা কি করব?

কিন্তু বাধ্য হয়ে নিতে হ'লো। ভাবলাম—দেবো কোথাও রাস্তার মাঝখানে ফেলে।

এইবার সে এক ভারি মজার কাণ্ড।

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বইখানি হাতে নিয়ে চলেছি। খানিক দূর গিয়েই রাস্তার ধারে বইখানি ছুড়ে ফেলে দিলাম।

ফেলে দিয়ে আর সেদিক্ পানে তাকালাম না। না তাকিয়েই এগিয়ে চললাম। কিন্তু কিছু দূর যেতে না যেতেই দেখি, পিছন থেকে একটি ছোক্‌রা ছুটতে ছুটতে আমার কাছে এসে বললে, "মশাই শুনুন!"

ফিরে দাঁড়িয়ে বললাম, "আমায় ডাকছেন?"

ছোকরাটি সেই কাগজ মোড়া বইখানি আমার হাতে দিয়ে বললে, "বইখানা আপনার হাত থেকে পড়ে গেল—আপনি বুঝতে পারেন নি।"

বইখানা আমি ইচ্ছা করেই ফেলে দিয়েছিলাম সে কথা আর বলতে পারলাম না। আবার সেখানি হাতে নিয়েই চলতে লাগলাম।

যেতে যেতে বাঁ-হাতি একটা বাড়ীর সুমুখে দেখলাম রক্‌টা ফাঁকা, কেউ কোথাও নেই ; বইখানি ধীরে-ধীরে রকের ওপর নামিয়ে দিলাম ! ভাবলাম যার খুশী সে নিয়ে যাবে, আমার ও-বইএর কোনও প্রয়োজন নেই।

কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার, এবারেও ঠিক তাই !

লোকজন কেউ কোথাও ছিল না, অথচ কয়েক পা যেতে না যেতেই দেখি—ছোট্ট একটি ছেলে বইখানি হাতে নিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। বললে, “বইখানি আপনি ফেলে যাচ্ছিলেন।”

কি আর করি, হাত পেতে নিলাম বইখানি। নিয়ে ভাবলাম, এবার একে এমন জায়গায় ফেলব, যেখান থেকে কেউ আর দেখতে পাবে না।

পাশের একটা গলির ভিতর ঢুকলাম।

রাস্তায় লোকজন খুব কম। ভালই হয়েছে। এবার আর কেই দেখতে পাবে না। কোথায় ফেলি, কোথায় ফেলি, ভাবতে ভাবতে ভাবতে চলেছি। হঠাৎ দেখি—রাস্তার পাশেই প্রকাণ্ড একখানা বাড়ী, তার পরেই বাগানের মত কি যেন একটা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে দেখলাম—কেউ কোথাও নেই। এই উপযুক্ত সময় ভেবে প্রাচীরের উপর বইখানি হেলাফেলা করে তুলে দিলাম। কিন্তু হাত ছেড়ে দিতেই ওদিকে ঢিপ্ করে একটা শব্দ হ'লো, বুঝলাম—বইখানি প্রাচীরের ওপারে পড়ে গেছে।

আঃ, বাঁচলাম। এবার বোধ হয় নিষ্কৃতি পাওয়া গেছে।

নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ নারী-কণ্ঠস্বরে একটুখানি চমকে পিছন ফিরলাম। দেখি—একটি বারো তেরো বছরের সুন্দরী মেয়ে হাসতে হাসতে আমার দিকেই ছুটে আসছে। কাছে আসতেই অবাক্ হয়ে গেলাম। দেখলাম তারও হাতে আমার সেই বই।

মেয়েটি বললে, “দোতালার জানালায় আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেখলাম বইখানি আপনি পাঁচিলের উপর রাখলেন, ওপাশে পড়ে গেল বলে' আর খোঁজ করলেন না বুঝি ?”

কি আর বলব, মৃদু হেসে বইখানি তার হাত থেকে নিলাম।

সর্ব্বনাশ ! আচ্ছা ভূতুড়ে বই ত ! ভাবলাম, আমার কাছ থেকে এ যখন কিছুতেই যাবে না, তখন থাক্ আর একে ফেলে কাজ নেই, বাড়ীতেই নিয়ে গিয়ে রাখি।

সেল্‌ফের ওপর অনেক বই জড়ো হয়েছে, তারই একপাশে তারেও দিলাম রেখে। মনে-মনেই বললাম, যেতে যখন চাইলে না কিছুতেই তখন থাকো।

মা ডাকলেন, "চা খাবি আয়।"

পাশের ঘরে চা খেতে গেলাম। চা খেতে খেতেই সন্ধ্যে হ'লো। বাইরে তখন ঝম্ ঝম্ করে' আবার বৃষ্টি নেমেছে। আমার ঘরে এসে সুইচ্ টিপে আলো জ্বালালাম। ভাবলাম, এই বাদলের দিনে বসে বসে কিছু পড়া যাক্।

বই নেবার জন্যে সেল্‌ফের কাছে এগিয়ে যেতেই বিস্ময়ে একেবার হতবাক্



হয়ে থমকে দাঁড়ালাম। দেখলাম সেই বইখানা আমার টেবিলের উপর খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। দেখে মনে হলো—এইমাত্র কে যেন পড়তে পড়তে উঠে গেছে। কিন্তু আমার এ-ঘরে এ সময় কে-ই বা আসবে! বাড়ীতে শুধু মা আর আমি। একটি বোন্ আছে সেও ত' বোর্ডিংএ। বাড়ীতে একটা চাকর পর্য্যন্ত নেই। তবে কি বোর্ডিং থেকে অণিমাই এলো না কি? মা'র কাছে ছুটে গেলাম। মা বল্‌লেন, "কই না, অণিমা ত' আসে নি?"

সেল্‌ফ্‌ থেকে বইখানা কি পড়ে গেল ?—বেড়ালে ফেলে গেছে ? কিন্তু তারও কোনও সম্ভাবনা দেখলাম না। সেল্‌ফের যে জায়গায় বইখানা ছিল, সেখান থেকে বেড়ালে ফেল্‌তে পারে না। তা ছাড়া ফেল্‌লেও সেখান থেকে সেটা মেঝেতেই পড়তো, টেবিলটা ছিল দূরে, তার ওপর পড়তে যাবে কেন ?

বইটায় হাত না দিয়ে ভাল করে' দেখবার জন্যে তার ওপর ঝুঁকে পড়লাম। কেনবার সময় তখনও দেখেছিলাম, এখনও দেখলাম—বইখানি কে যেন লাল পেন্সিলের দাগ দিয়ে দিয়ে অতি যত্নে পড়েছে।

বইএর যে পাতাটা খোলা, তারই নীচের দিকে যে জায়গাটা লাল পেন্সিলের দাগ দেওয়া ছিল, অন্যমনস্কের মত সেই লাইন ক'টা পড়ে ফেললাম।

লেখা রয়েছে—মানুষের মৃত্যুর কোনও স্থিরতা নাই। যে কোনও মুহূর্ত্তে তুমি মরিয়া যাইতে পারো। সুতরাং তাহার পূর্ব্বে তোমার ঋণ তুমি পরিশোধ করিও। তাহা না হইলে……।

সত্যিই ভাবিয়ে তুল্‌লে। কার কাছে আমার কি কি ঋণ আছে আমি ভাবতে বসলাম। মনে পড়ল—আমার এক বন্ধুর কাছে পাঁচটি টাকা আমি একবার ধার নিয়েছিলাম। দিচ্ছি দিচ্ছি করে' আর দেওয়া হয় নি। সে আজ প্রায় পাঁচ ছ' মাস হয়ে গেল। বন্ধুর সঙ্গে আমার আর দেখাও হয় নি, তার কোনও খবরও নিতে পারি নি। টাকার কথা আমার মনেই ছিল না।

তৎক্ষণাৎ ড্রয়ার থেকে পাঁচটি টাকা বের করে পকেটে নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম। শ্যামবাজারে বন্ধুর বাড়ী।

গিয়ে দেখি—বন্ধু আজ দু'মাস ধরে' শয্যাগত। ধরতে গেলে এক রকম মৃত্যু-শয্যায়। এমনি রুগ্ন কঙ্কালসার হয়ে গেছে যে, দেখলে আর চেনবার জো নেই। বিকারগ্রস্ত রুগী, আমায় দেখে সে চিনতেই পারলে না।

তার বিধবা দিদি আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। দেখলাম চোখ দুটি তাঁর ছল্‌ ছল্‌ করছে। আসবার সময় টাকা পাঁচটি তার দিদির হাতেই দিলাম। বললাম 'অজিত পেতো আমার কাছে।'

দিদির মুখখানি কেমন যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ; আর সঙ্গে সঙ্গে দুই চোখের কোণ বেয়ে দুটি অশ্রুর ধারা গড়িয়ে এলো। ঠোঁট দুটো একবার চেপে প্রাণপণে নিজেকে সামলে নিয়ে দিদি বললেন, "কি উপকার যে তুমি আমাদের করলে ভাই—পাঁচটি টাকার কথাই আজ আমি সারাদিন ভেবেছি। ডাক্তার বলে গেছেন টাকা না পেলে তিনি আর ইঞ্জেক্‌শন্‌ দেবেন না।"

SARASWAT LIBRARY

তারপর খবর নিয়েছি, অজিত সেরে উঠেছে। মৃত্যুর মুখ থেকে এক রকম বেঁচে ফিরে আসাই বলতে হবে।

দিদি বললেন, আমার দেওয়া সেই পাঁচটি টাকা না পেলে বোধ হয় বাঁচতো, না। কিন্তু তার এই বাঁচার সঙ্গে আমার সে ভূতুড়ে বইটারও কি কোনও সম্বন্ধ আছে?

আছে, কি না, সে কথা আমি মাঝে মাঝে ভাবি।

ভেবে কোনও কুল-কিনারা পাই না।

—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

লাল সূতা আর নীল সূতা

এক জোলা একদিন তাহার স্ত্রীকে বলিল, "আমি পায়েস খাব, পায়েস রেঁধে দাও।" জোলার স্ত্রী বলিল, "ঘরে কাঠ নেই; কাঠ এনে দাও, পায়েস রেঁধে দিচ্ছি।" জোলা কাঠ আনিতে গেল।

পথের ধারে একটা বড় আমগাছ ছিল, তাহার একটা শুক্‌নো ডালের আগায় বসিয়া জোলা তাহারই গোড়ার দিক্‌টা কাটিতেছে। তাহা দেখিয়া পথের লোক একজন ডাকিয়া বলিল, "ওহে, ও ডাল কেটো না, কাট্‌লে প'ড়ে যাবে।" জোলা বিরক্ত হইয়া বলিল, "তুমি গুণ্‌তে জান না কি? ও ডাল কাট্‌লে প'ড়ে যাব, তা তুমি কি ক'রে জান্‌লে? আমি পায়েস খাব না বুঝি!" পথের লোকটি আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। আর খানিক পরে জোলাও ডালশুদ্ধ পড়িয়া গেল।

গাছ হইতে পড়িয়াই জোলা ভাবিল, "তাই ত! আমি প'ড়ে যাব, তা' ও জান্‌লে কি ক'রে? ও নিশ্চয় একটা কেউ হবে!" এই ভাবিয়া জোলা ছুটিয়া গিয়া সেই পথিকের পা জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভু আপনি কে? আমি কবে মর্‌ব, সেটি আমাকে বলে দিন্‌।" পথিক ভারি মুস্কিলেই পড়িল। জোলার খুব বিশ্বাস হইয়াছে যে, এ পথিক সামান্য লোক নয়, সুতরাং তাহার প্রশ্নের উত্তর না পাইলে পথিককে কিছুতেই ছাড়িতেছে না। শেষটা পথিক যখন দেখিল যে, একটা কিছু না বলিলে তাহার আর ঘরে যাওয়া হইতেছে না, তখন সে রাগিয়া

বলিল, তোর পেটের ভেতর থেকে লাল সূতো আর নীল সূতো যখন বেরুবে, তখন তুই মর্‌বি।" এই কথায় জোলা সন্তুষ্ট হইয়া বাড়ী ফিরিল।

এখন হইতে জোলা ঠিক হইয়া বসিয়া আছে যে, লাল সূতা আর নীল সূতা বাহির হইলেই তাহার মৃত্যু। সুতরাং সে রোজ পরীক্ষা করিয়া দেখে, তাহা বাহির হইল কি না। এইরূপ পরীক্ষা করিতে গিয়া একদিন সত্যসত্যই তাহার কাপড়ে একখণ্ড লাল সূতা আর একখণ্ড নীল সূতা পাইল। অমনি সে চীৎকার



করিয়া তাহার স্ত্রীকে বলিল, "ওগো শীগ্‌গির্‌ এস, আমি মরে গিয়েছি— আমার লাল সূতো আর নীল সূতো বেরিয়েছে।" তাহার স্ত্রী আসিয়া দেখিল, সত্য সত্যই লাল সূতা আর নীল সূতা! তখন সে বেচারা আর কি করে; জোলাকে বিছানায় শোয়াইয়া কাপড় চাপা দিয়া সে কাঁদিতে বসিল! এর মধ্যে আর দু'চারজন জোলা বেড়াইতে আসিয়া দেখে যে, জোলার স্ত্রী কাঁদিতেছে। তারপর জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিল যে, লাল সূতা আর নীল সূতা পাওয়া গিয়াছে, তখন সকলে স্থির করিল যে, জোলা নিশ্চয় মরিয়া গিয়াছে! সুতরাং তাহারা তাহার সৎকারের চেষ্টা দেখিতে লাগিল।

কিন্তু ইহার মধ্যে ভারি এক মুস্কিল দেখা দিল! পোড়ানতে জোলা কিছুতেই রাজি নয়। পোড়ানর কথা তুলিলেই সে বলে, "ও মা! পুড়ে যাব যে!" মরিয়া গেলে, তাহাকে পোড়ান ছাড়া আর কি করা যায়?—গোর দেওয়া! কিন্তু জোলা তাহাতেও অসম্মত। বলে, "ও মা! দম আট্‌কে যাবে যে!" শেষে অনেক যুক্তির পর স্থির হইল যে, জোলাকে গোর দেওয়াই হইবে, কিন্তু মুখখানা জাগাইয়া রাখা

যাইবে! জোলা তাহাতে রাজি হইল; কিন্তু সে বলিল যে, "ক্ষিদে পেলে চারটি ভাত দিয়ো।" এইরূপ পরামর্শের পর জোলাকে গোর দেওয়া হইল—অর্থাৎ তাহার মুখটি জাগিয়া রহিল, আর সব মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিল।

এইরূপে সমস্ত দিন চলিয়া গেল। রাত্রিতে চারিটি ভাত খাইয়া জোলা একটু নিদ্রার চেষ্টা দেখিল।

সেই রাত্রিতে সাত চোর রাজার বাড়ীতে চুরি করিতে চলিয়াছে। চোরেরা ত আর বাবুদের মতন সদর রাস্তা দিয়া চলে না—তাহারা প্রায়ই ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর দিয়া চলে, আর সে সব জায়গা অনেক সময়ই নোংরা থাকে। চলিতে চলিতে একজন চোর কাদার মতন একটা কি জিনিস মাড়াইল, সে জিনিসটার বড় বিশ্রী গন্ধ! সে পা মুছিবার জন্য একটা জায়গা খুঁজিতে লাগিল। উহার নিকটেই জোলাকে গোর দিয়াছে; আর সে চোরটা মুছ্‌বি তো মোছ্‌, সেই জোলার মুখেই গিয়া পা মুছিতে লাগিল! ঘষা আর দুর্গন্ধের চোটে জোলার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; সে রাগিয়া বলিল "উঃ—হুঃ—হুঃ—! তোমার কি চোখ নেই না কি?"

চোর আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কে রে?"

জোলা বলিল, "আমি জোলা!"

"এখানে কি করছিস্?"

"আমি যে মরে গিয়েছি; আমার লাল সুতো নীল সুতো বেরিয়েছে—তাই আমাকে গোর দিয়েছে!"

এই কথা শুনিয়া চোরেরা খুব হাসিতে লাগিল। তারপর তাহাদের একজন সঙ্গীদের বলিল, "একে আমাদের সঙ্গে নিয়ে চল।"

চোরেরা জোলাকে বুঝাইয়া দিল যে, তাহার মৃত্যু হয় নাই, আর তাহাদের সঙ্গে গেলে সে পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে। জোলা জিজ্ঞাসা করিল, "কি খাওয়াবে? পায়েস?" চোরেরা বলিল, "হ্যাঁ পায়েস,—চল!"—পায়েসের কথা শুনিয়া জোলা কোন আপত্তি করিল না। চোরেরা তাহাকে উঠাইয়া লইয়া চলিল।

রাজার বাড়ীতে গিয়া চোরেরা রাজার ঘরে প্রকাণ্ড সিঁদ কাটিল! তারপর জোলাকে ঐ সিঁদের ভিতর ঢুকাইয়া দিয়া বলিল, "রাজার মাথার মুকুটটা নিয়ে আয়।" রাজার খাটে মশারি খাটান ছিল, তাহা দেখিয়া জোলা ভারি আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সে মশারির চারিদিক্ ঘুরিয়া কোথাও তাহার দরজা দেখিতে পাইল না; সুতরাং চোরেদের নিকট ফিরিয়া বলিল, "হ'ল না; ওর ভেতরে আর একটা ঘর আছে, তার দরজা নেই।"

চোরেরা, "দূর বোকা! ওটা ঘর নয়, মশারি! ওটাকে তুলে দেখ্‌লি নে কেন?" জোলা আবার ঘরের ভিতরে গেল।

এবারে জোলা মশারি তুলতে অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু সেটাকে নাড়িতেও পারিল না—কারণ সে খাটশুদ্ধ ধরিয়া টানাটানি করিয়াছিল। সে আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "না ভাই, ওটা বড্ড ভারী।"



"আরে, এমন গাধা ত আর দেখি নি! তুই বুঝি খাটশুদ্ধ তুল্‌তে গিয়েছিলি? শুধু ওর কাপড়টা ধ'রে টান্‌তে হয়।"

এবারে জোলা আর কোন ভুল করিল না। মশারির কাপড় ধরিয়া টানিতেই সেটা উঠিয়া আসিল। ভিতরে খুব উঁচু গদির উপরে রাজা শুইয়া আছেন, তাঁহার গায় ঝালর দেওয়া অতিশয় পুরু লেপ। দেখিয়া, জোলার মনে ভারী দুঃখ হইল; সে ভাবিল, বুঝি রাজাকেও গোর দিয়াছে! তারপর দেখিল, শুধু মুখখানি জাগিতেছে। তখন সে ভাবিল যে, "ঠিক ত আমারই মতন করেছে, দেখ্‌ছি! এরও লাল সূতো নীল সূতো বেরিয়েছিল না কি?" জোলা যত ভাবে, ততই আশ্চর্য্য হয়, আর ততই তাহার জানিতে ইচ্ছা করে, রাজা মহাশয়ের লাল সূতা নীল সূতা বাহির হইয়াছিল কি না। শেষটা এমন হইল যে, এই খবরটা তাহার না জানিলেই নয়। সুতরাং সে রাজাকে ঠেলিয়া জাগাইল। আর তিনি চোখ মেলিবামাত্রই জিজ্ঞাসা করিল, "লাল সূতো নীল সূতো বেরিয়েছিল?"

ইহার পর একটা মস্ত গোলমাল হইল। রাজবাড়ীর সকলে জাগিয়া গেল, সাত চোর ধরা পড়িল, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে জোলাও ধরা পড়িল।

পরদিন বিচার। জোলা আগাগোড়া সকল কথা খুলিয়া বলিল—লাল সূতা নীল সূতার কথা, গোর দিবার কথা, চোরের পা মুছিবার কথা, পায়সের কথা—কিছুই বাকি রাখিল না।

বিচারে সাত চোরের উচিত সাজা হইল! আর জোলাকে পেট ভরিয়া উত্তম পায়স খাওয়াইয়া বিদায় দেওয়া হইল।

স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

সুন্দরবনে

তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে যে, ছেলেবেলায় প্রায় পাঁচ বছর আমাকে সুন্দরবনে আরাকান দস্যুদলের মধ্যে কাটাইতে হইয়াছে। যখন আমার এগার বার বৎসর মাত্র বয়স, তখন আমাদের বজরায় ডাকাত পড়িয়া সকলকে মারিয়া ধরিয়া লুটপাট করিয়া আনিয়াছিল! কিন্তু আমাকে না মারিয়া কেন যে তাহারা তাহাদের সঙ্গে লইয়া আসিল, প্রথমে তাহা বুঝিতে পারি নাই; পরে বুঝিলাম। ডাকাতদের সর্দ্দারের একটি তের চৌদ্দ বৎসরের ছেলে ছিল! নাম তাহার 'মংনু'। ঐ সুন্দর বনের সুদূর জঙ্গলে ডাকাতদের আড্ডায় তাহার সঙ্গী কেহই ছিল না। তাহার জন্য একটি সঙ্গীর বোধ হয় দরকার হইয়া থাকিবে; তাই আমার সমস্ত স্নেহের আশ্রয় হইতে নিষ্ঠুর ভাবে আমাকে তাহারা কাড়িয়া আনিল; ফুলগাছ হইতে যেমন নিশ্চিন্তে আমরা ফুল ছিঁড়িয়া আনি।

কিন্তু এখানে আসিয়া স্নেহ-যত্ন আমি পাই নাই, এ কথা বলিলে মিথ্যা বলা হইবে। মংনুর সঙ্গে আমার ত খুব ভাব হইলই; তা'ছাড়া মংনুর মাও আমাকে ছেলের মত ভালবাসিতে লাগিলেন। তাঁহার স্নেহে ও আদরে আমি কিছুদিনের মধ্যেই বাড়ীর দুঃখ ভুলিয়া গেলাম।

মংনুর মত সাহসী, বুদ্ধিমান্ ছেলে আমি কমই দেখিয়াছি। তীর ছুঁড়িতে, বন্দুক চালাইতে, সাঁতার দিতে সে তাহার পিতার সঙ্গীদের চেয়ে কিছুমাত্র কম ছিল না।

তাহার নামটাকে ছোট করিয়া তাহাকে আমি মনু বলিয়া ডাকিতাম।

ডাকাতেরা বনের এই জায়গাটায় একটা ছোটখাট গ্রামের মত করিয়া স্ত্রী-পুত্র লইয়া বসবাস করিত। এইখানকার দু'একটা ঘটনা আজ বলিব ঃ—

হেমন্ত গিয়া শীত পড়ি পড়ি করিতেছে। বাড়ীতে বাড়ীতে সন্ধ্যাবেলা কাঠের কুঁদো জ্বালিয়া আগুন করা সুরু হইয়াছে। নানা রকমের বাঘের ফাঁদ সব পাতা হইয়া গিয়াছে। মেয়েরা দল বাঁধিয়া কাঠ সংগ্রহ করিতে বাহির হইতেছে। গাছে গাছে নোনা পাকিতে সুরু করিয়াছে। গাছের ছায়ায় ছায়ায় দুপুর বেলা ঘুরিয়া বেড়াইবার সময় বটে !

এমনি একটি সুন্দর দুপুরে, আমি আর মনু দুইজনে খাওয়া দাওয়া সারিয়া বন্দুক ও তীর ধনুক হাতে একটু ঘুরিতে বাহির হইয়াছি। আমাদের আস্তানার পিছন দিক্‌টা ঘুরিয়া নদীর দিকে যাইবার যে সোজা রাস্তা গিয়াছে, সেইটা দিয়া কতদূর যাইতেই মনে হইল যেন হঠাৎ মড়মড় করিয়া কি একটা ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গেই একটা গোঙানির শব্দ শোনা গেল। মনু বলিয়া উঠিল, "ঐ রে, মরেছে ! কে যেন বাঘের গর্ত্তে প'ড়ে গেছে !"

তাড়াতাড়ি আমরা শব্দ লক্ষ্য করিয়া ছুটিলাম ! গিয়া দেখি ঠিক তাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাঘের জন্য নানা রকম ফাঁদ পাতা হইয়াছিল ; তাহারই একটা গর্ত্ত-ফাঁদে* আমাদের পাশের বাড়ীর একটি ছোট মেয়ে একেবারে হুড়মুড় করিয়া পড়িয়াছে। মনু তুলিবে কি, হাসিয়াই অস্থির ! গর্ত্তের ভিতর উঁকি মারিয়া দেখি, বেচারা পাঁকের মধ্যে প্রায় বসিয়া গিয়াছে। আমি মনুকে খুব বকাবকি করিতে লাগিলাম ; বলিলাম, "লোক ডাকি, দড়ি নিয়ে আসি।" মনু বলিল, "কিচ্ছু কর্‌তে হবে না, দেখ না।" বলিয়া সে নদীর দিকে গেল।

একটা বড় গাছ বাহিয়া একটা মোটা দড়ির মত লতা উঠিয়াছিল। কোমর হইতে ছুরি বাহির করিয়া মনু সেই লতার অনেকখানি কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া আনিল। লতাটাকে তখন দড়ির মতন করিয়া গর্ত্তে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "এই ভুৎনি, কোমরে বাঁধ !"

'ভুৎনি' আর কি করে ? বিপাকে পড়িলে সবই সহ্য করিতে হয়। লতাটিকে সে কোমরে শক্ত করিয়া বাঁধিল। তখন পাশের একটা গাছের ডালে বাধাইয়া আমরা দু'জনে 'হেঁইয়ো জোয়ান' বলিয়া তাহাকে টানিয়া উঠাইলাম।

* গর্ত্ত-ফাঁদগুলি ভারি মজার। সচরাচর বাঘ যেখান দিয়া চলাফেরা করে, সেই রাস্তায় ছোটখাটো একটি কুয়ো কাটিয়া তাহার মধ্যে এক হাঁটু-সমান কাদা ভর্ত্তি করা হয়।

কাদা মাখিয়া সে ভূতের মতই দেখিতে হইয়াছিল। কিন্তু গায়ে তাহার আঁচড়টিও লাগে নাই।

আর একদিনের ঘটনা বলিতে এখনও আমার চোখে জল আসিতেছে। আমাদেরই বাড়ীর অনতিদূরে 'বুধন সর্দ্দারের' বাড়ী। হিন্দুস্থানী হইলেও সে এই আরাকান দস্যুদলে যোগ দিয়াছিল। বুধনের একটি মাত্র মেয়ে, বয়স দশ এগার বৎসর হইবে। ফুটফুটে মেয়েটি; মোটাসোটা, গোলগাল, হাসিখুসী। শিকারের সঙ্গী না হইলেও অনেক সময় সে আমাদের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইত।

যেদিনকার কথা বলিতেছি, সেদিন দিনের বেলাতেই কন্‌কনে শীত পড়িয়াছে। আকাশ মেঘে ঢাকা। টিপ্‌টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে! এই রকম দিনে বাঘের উপদ্রব কিছু বেশী হয়। পাড়ার মেয়েরা সব দল বাঁধিয়া কাঠ কুড়াইতে গিয়াছে। বড় দল না হইলে সে সকল জায়গায় কেহই বড় চলা-ফেরা করে না। 'সুমেরিয়ার মা তাহার মেয়েকে বলিল যে, আজ আর তাহার কাঠ কুড়াইতে গিয়া কাজ নাই, বৃষ্টিতে ভিজিয়া অসুখ করিবে, সুমেরিয়া কিছুতেই শুনিল না, সেও সঙ্গে গেল।

বৈকালের দিকে সকলেরই প্রায় কাঠ কুড়ানো শেষ হইয়াছে। মোট-ঘাট বাঁধিয়া সকলে বাড়ী ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছে! এমন সময় হঠাৎ খানিকটা দূর দিয়া একটা হরিণ একেবারে দুদ্দাড় করিয়া ছুটিয়া বনের মধ্যে গিয়া ঢুকিল। দলের মধ্যে একটি বৃদ্ধা ছিল, সে সকলকে ডাকিয়া বলিল যে, 'বড়শিয়াল' বাহির হইয়াছে। হরিণটার ছুটিবার রকম দেখিয়া সে বুঝিতে পারিয়াছিল।

যাহাই হউক, আর বিলম্ব না করিয়া সকলে আপন আপন মোট লইয়া নিঃশব্দে চলিতে লাগিল। সুমেরিয়া দুই একবার কথা কহিবার উদ্যোগ করিতেই তাহার মা ধমক্ দিয়া চুপ করাইয়া দিল। এইরূপে প্রায় দুই মাইল পথ চলিয়া তাহারা ক্রমে আস্তানার কাছে আসিয়া পড়িল। তখন সকলের ধড়ে প্রাণ আসিল, একটু একটু করিয়া সকলের মুখে কথা ফুটিল।

সাম্‌নেই সর্দ্দার-বাড়ীর তেঁতুল গাছের মাথাটা দেখা যাইতেছে। রাস্তা অত্যন্ত সংকীর্ণ। মাথার উপর সব গাছের ডাল আসিয়া পড়িয়াছে। একটা নোনার ডাল ফলে একেবারে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। একটা খোঁচা দিলেই হয় আর কি।' সুমেরিয়া চুপি চুপি একটু পিছাইয়া পড়িল।

হঠাৎ একটা কিসের শব্দে সকলের পিছনের সেই বুড়ী পিছন ফিরিয়া দেখে যে, একটা প্রকাণ্ড বাঘ সুমেরিয়াকে ফেলিয়া তাহার ঘাড় কামড়াইয়া প্রায় তুলিয়া লইয়া জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিতেছে।

মেয়েদের চিৎকারে লাঠি বর্শা বল্লম বন্দুক লইয়া আড্ডা হইতে সকলে বাহির হইয়া পড়িল। মন্নু ও আমি তাহাদের সঙ্গে বাহির হইলাম। কিন্তু মন্নুর বাবা আমাদের যাইতে দিলেন না। কি আর করিব, মনের দুঃখ মনে চাপিয়া চুপ্ করিয়া বসিয়া মেয়েদের আলাপ-আলোচনা শুনিতে লাগিলাম। কখন্ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম জানি না। মন্নুর ঠেলাঠেলিতে উঠিয়া বাহিরে আসিলাম। তখন একটু একটু আলো হইয়াছে।

উঠানে অনেক লোক জড় হইয়াছে। একটা প্রকাণ্ড বাঘ ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িয়া আছে। কিন্তু একটু দূরেই যাহা দেখিলাম, তাহা মনে করিতে এখনও আমার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠে। একটা ছোট আধ-খাওয়া মৃতদেহ। তাহার একখানা হাত ও একখানা পা নাই এবং পেট ও বুকের খানিকটাও খাইয়া ফেলিয়াছে! কেবল কচি মুখখানা তখনও তক্‌তক্ করিতেছে। সে কি ভয়ানক দৃশ্য! সুমেরিয়াকে যে এমন অবস্থায় দেখিব, তাহা কল্পনাও করিতে পারি নাই। আমি দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া ছুটিয়া ঘরে গিয়া বালিসে মুখ ঢাকিয়া শুইয়া পড়িলাম।

পরে শুনিলাম, বাঘটা না কি দুই মাইল পথ গোপনে তাহাদের পিছন্ পিছন্ আসিয়াছিল।

কাঠ সংগ্রহ করিতে যাইয়া এইরূপ নানা বিপদে মাঝে মাঝে তাহাদের পড়িতে হইত। কিন্তু উপায় নাই। আগুন জ্বালিতেই হইবে—সুতরাং কাঠও চাই। প্রায় সমস্ত রাত উঠানে আগুন জ্বলে, আর তাহার চারিদিকে বসিয়া অনেক রাত পর্য্যন্ত সকলে গল্পগুজব করে।

সেদিন রাত্রে সকলে বসিয়া গল্পগুজব করিতেছে। শীতটাও পড়িয়াছে খুব। আমি আর মন্নু একটা কাঁথার মধ্যে জড়াইয়া গুটিসুটি হইয়া আগুনের ধারে বসিয়াছিলাম। এমন সময় মনে হইল, বেড়ার পাশে কি যেন একটা ভয়ানক হুড়ামুড়ি বাঁধিয়াছে; সকলেই গল্প থামাইয়া কান খাড়া করিয়া সেই ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ শুনিতে লাগিলাম। আমি এবং মন্নু আওয়াজের প্রথমেই কাঁথা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। শব্দটা শুনিয়া মনে হইল যেন দুইটা প্রকাণ্ড জানোয়ারে ভয়ানক ঝটাপটি বাঁধিয়াছে। কিন্তু জানোয়ার দুইটা যে কি, তাহা কেহই ঠিক করিয়া আন্দাজ করিতে পারিল না। হঠাৎ ভয়ানক গর্জ্জনে চারিদিক্ কাঁপিয়া উঠিল। দুই মিনিট না যাইতেই আবার সেই ভয়ানক ডাক। আবার, আবার! কিন্তু ক্রমে শেষের দিকে মনে হইল, আওয়াজটা কতকটা গোঙানির মত হইয়া আসিয়াছে; এবং পরক্ষণেই একটা ঘোড়দৌড়ের মত শব্দ শোনা গেল। তারপর সব চুপ্‌চাপ্। ভয়ে, বিস্ময়ে

আমরা এতই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, অনেকক্ষণ কাহারও মুখে কথা বাহির হয় নাই। সকলেই চুপ্ করিয়া কান খাড়া করিয়াছিলাম—আর কোন শব্দ শোনা যায় কি না।

মনুর বাবা বাড়ী ছিলেন না। খানিকক্ষণ পরে কতকটা বুদ্ধিশুদ্ধি ফিরিয়া পাইয়া হাতিয়ার লইয়া সকলে বাহিরে যাইবার আয়োজন করিতে লাগিল। এই সময় মনুর খোজ পড়িল। কিন্তু তাহাকে কোথাও পাওয়া গেল না। আমরা যখন হতভম্ব হইয়া বসিয়াছিলাম, সেই ফাঁকে সে সরিয়া পড়িয়াছিল।

এমন সময় সদর দরজায় ঘা পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে মনুর বাবার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল—"খোলো খোলো, শীগ্‌গির দরজা খোলো।" তাড়াতাড়ি আমরা দরজা খুলিয়া দিতেই তিনি বলিলেন, "তোমরা দুই একজন বন্দুক নিয়ে আমার সঙ্গে শীগ্‌গির এসো। শূয়োরটাকে বাঘটা যথেষ্ট ঘায়েল করেছে; তার ওপর ভেতর থেকে তোমরা যে তীরটা মেরেছিলে, সেটাও তার গায়ে বিঁধেছে। শীগ্‌গিরই ব্যাটা কাবু হবে। কিন্তু এত বড় বাঘটাকে দাঁতের একঘায়েই কাবার করেছে! উঃ কি ভীষণ শূয়োর!"

আমরা ত একেবারেই অবাক্। আমরা আবার কখন্ তীর মারিলাম! যাই হোক্, তখন আর কথা বলিবার সময় ছিল না। তাড়াতাড়ি দুই তিনটা মশাল জ্বালিয়া বন্দুক এবং ছোরা লইয়া সকলে বাহির হইয়া পড়িলাম। বাহির হইয়াই দেখি, পাশেই ডোবার ধারে বাঘটা পড়িয়া আছে, তাহার পেটের নাড়িভুঁড়ি একেবারে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। প্রকাণ্ড শরীর; একেবারে আসল 'রয়েল বেঙ্গল'।

আমাকে দেখিতে পাইয়া মনুর বাবা মনুর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, "বাঘের প্রথম গর্জ্জনের পরেই সকলের অজান্তে সে কোথায় গেছে। আমরা তাকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না, এমন সময় আপনি দরজায় ডাক্লেন। তা ছাড়া তীরের কথা বলছিলেন, তীর ত আমরা কেউ ছুঁড়ি নি?"

মনুর বাবা এই কথা শুনিয়া বেশ একটু ভয় পাইলেন। ডাকাত হইলেও ছেলেকে তিনি খুব ভালবাসিতেন। আর অমন ছেলেকে কে না ভালবাসে!

শূয়োর অতি ভয়ানক জানোয়ার। তাহার উপর আহত হইলে তাহার আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না—সে আরও ভয়ানক হয়। যে তীরটা লাগিয়াছে, সেটা নিশ্চয়ই মনুর হাতের। ছেলে-মানুষ না জানিয়া বেশী সাহস করিতে যাইয়া কি যেন বিপদে পড়ে! সকলে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া মনুর খোঁজে বাহির হইলাম। সকলেই মনুর নাম ধরিয়া চীৎকার করিয়া অনেক ডাকিলাম। কিন্তু কোনই সাড়া পাওয়া

গেল না। মশালের আলোতে রক্তের দাগ আন্দাজ করিয়া করিয়া আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

আমাদের বাড়ী হইতে আধ মাইল দূরে একটা জলাভূমি। তাহার কাছাকাছি পঁহুছিতেই "হো—এই দিকে, আমি এখানে" বলিয়া একটা চিৎকার আমাদের কানে পৌঁছিল। মনুর আওয়াজ শুনিয়া সকলেই বুঝিতে পারিলাম যে, তাহার বিশেষ



কোনও বিপদ হয় নাই। আওয়াজ লক্ষ্য করিয়া চলিয়া কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা মনুকে দেখিতে পাইলাম। সে কাদায় হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ছুরি দিয়া শূয়োরটার দাঁত কাটিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে। শূয়োরটার ঘাড়ে, কানের ভিতর ও বুকে তীর বিঁধিয়া আছে।

আমরা সকলেই তাহার খুব তারিফ্ করিতে লাগিলাম। ছেলের সাহস এবং হাতের তাক্ দেখিয়া মনুর বাবা এত খুসী হইয়াছিলেন যে, শীঘ্রই তাহাকে একটা ভাল বন্দুক পুরস্কার দিবেন বলিয়া কথা দিলেন।

বন্য শূকরের মাংস খাইতে খুব সুস্বাদু। সুতরাং সকলে মিলিয়া শূকরটাকে বহিয়া আনিলাম। সেদিন আর কাহারও ঘুম হইল না। সমস্ত রাত ধরিয়া রান্না, খাওয়া আর হুল্লোড় চলিল।

মন্নুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বের হলে কি ক'রে?" সে বলিল, "বাড়ীর চাল বেয়ে গিয়ে পেছনের তেঁতুল গাছটাতে উঠেছিলাম। বাঘটা শূয়োরটার পেছনে থাবা মেরে অনেকখানি মাংস তুলে নিয়েছিল। কিন্তু তখুনি শূয়োরটা ফিরে বাঘটাকে এক গুঁতোয় চিৎ ক'রে দাঁত দিয়ে তার পেটটা ফেড়ে ফেললে। ঠিক সেই সময় তাকে দেখ্‌তে পাই আর প্রথম তীর চালাই। তীর খেয়ে বাঘটাকে ফেলে সে দৌড় দিল। আমিও গাছ থেকে নেমে তার পেছু নিলাম। দৌড়তে দৌড়তে দুবার সে প'ড়ে যায় এবং দুবারই আমি তার ওপর তীর চালিয়েছি। জলাটার পাশে গিয়েই সে ম'রে প'ড়ে গেল। তার একটু পরেই তোমাদের মশাল আমি দেখ্‌তে পেলাম।"

পরদিন সকালে বাঘের ছালটা ছাড়ান হইল। মাথা হইতে লেজের ডগা পর্য্যন্ত বাঘটা প্রায় সাড়ে ছয় হাত লম্বা।

—শ্রীজীবনময় রায়

সঙ্কটে প্রাণরক্ষা

মুসলমান রাজাদের সময়ে দেশের অবস্থা এমনি ছিল যে, লোকে চোর-ডাকাতের ভয়ে নির্ভয়ে পথ চলিতে পারিত না। দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই ডাকাতের দল ঘুরিয়া বেড়াইত। এমন কি, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানের লোকে বর্দ্ধমান যাইতে হইলে ভয়ে ভয়ে যাইত, আর ঘরে ফিরিয়া আসিতে পারে, কি না। বর্দ্ধমান জেলাতে অনেক বড় বড় মাঠ আছে, গ্রামগুলি মাঠের মধ্যে অনেক দূরে দূরে, রাতে-ভিতে মাঠের মধ্যে একা পড়িলে ডাকাতে মারিয়া ফেলিত। আবার পশ্চিমে 'ঠগ' নামে প্রসিদ্ধ ডাকাতের দল ছিল। তাহারা দল বাঁধিয়া ডাকাতি করিত। কখনও ঘেসেড়া সাজিয়া, কখনও মুটে হইয়া, কখনও বরযাত্রের দল সাজিয়া, কখনও বা তীর্থযাত্রীর দল সাজিয়া পথিকদের সঙ্গে মিশিত এবং বন-জঙ্গলের ভিতরে লইয়া গিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিত। এই ঠগীর হাঙ্গামা নিবারণ করিতে ইংরাজদিগকে অনেক পরিশ্রম ও অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে।

বাঙ্গালা ১২৪০ সালে হুগলী জেলার একজন ভদ্রলোক তাঁহার মাতা ও গ্রামবাসী আরও কতকগুলি বিধবা স্ত্রীলোক ও কয়েকজন পুরুষ সঙ্গে লইয়া নৌকা-যোগে কাশীধামে যাইতেছিলেন। তাঁহারা এই সংকল্প করিয়া বাহির হইয়াছিলেন যে, কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ দেখিয়া পদব্রজে গয়া হইয়া শ্রীক্ষেত্রে গমন করিবেন। সঙ্গে গোপীনাথ নামে একজন চৌকিদার ছিল। ঐ গোপীনাথ পূর্ব্বে এক ডাকাতের দলের সর্দ্দার ছিল। কোনও কারণে ডাকাতদের সঙ্গে বিবাদ হওয়াতে সে ডাকাতি ছাড়িয়া চৌকিদারী কর্ম্ম লইয়া ছিল। তাহাদের তীর্থযাত্রার বিবরণ তিনি যেরূপ দিয়াছেন তাহা এই ঃ—

"দেশ হইতে যাত্রা করিবার প্রায় এক সপ্তাহ পরে একদিন মধ্যাহ্নে আহারাদির পর আমাদের নৌকা খুলিতে একটু বিলম্ব হইয়া পড়িল। তখন অন্যান্য নৌকা সব ছাড়িয়া গিয়াছে। সেকালে রাত্রিতে অন্য পাঁচখানা নৌকার সঙ্গে না থাকিলে কোনও মাঝিই আপনার নৌকাকে নিরাপদ মনে করিতে পারিত না। বোম্বেটিয়া বা জলদস্যুগণের ভয়ে কেহই নির্জ্জন স্থানে নৌকা রাখিতে সাহস করিত না। অপর দিকে স্থলের দিক্ হইতে চোর ডাকাত আসিবার সম্ভাবনা থাকাতে নৌকা নদীর কিনারার নিকট রাখাও নিরাপদ ছিল না। এইজন্য রাত্রিতে প্রায়ই পাঁচ সাত দশখানা নৌকার মাঝি, একত্রে গভীর জলে নঙ্গর করিয়া থাকিত। আমাদের নৌকার মাঝিরা অগ্রগামী নৌকাগুলির সঙ্গ লইবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। বেলা পাঁচটার সময় আকাশের, উত্তর পশ্চিম কোণে একখানা ক্ষুদ্র কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দেখা দিল। মাঝিরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, 'আজ আকাশের গতিকটা ভাল দেখাচ্চে না।' দেখিতে দেখিতে আধ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত আকাশ মেঘে ছাইয়া গেল ও প্রবল বেগে ঝড় বহিতে লাগিল ; বিদ্যুতের চক্‌মকিতে ও বজ্রের কড়্ কড়্ শব্দে চক্ষু অন্ধ ও কর্ণ বধির-প্রায় হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। মাঝিরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া নৌকা সাম্‌লাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু কিনারার নিকট আসিতে যে কাল বিলম্ব হইল, সেই সময়ের মধ্যেই ঝড় ও স্রোতের বেগে আমাদের নৌকা প্রায় একক্রোশ পথ পিছাইয়া পড়িল। কিনারার নিকট আসিয়া মাঝিরা নঙ্গর ফেলিল ও তীরে খোটা পুতিয়া তাহার সহিত কাছি দিয়া নৌকা শক্ত করিয়া বাঁধিল। ঝড়বৃষ্টি থামিতে থামিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। তখন অগ্রগামী নৌকার সঙ্গ লওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িল। অগত্যা আমাদিগকে সে রাত্রি সেইখানেই থাকিতে হইল। ঝড় থামিলেই মাঝিরা গভীর জলে গিয়া নঙ্গর করিল এবং আমাদিগকে ডাকিয়া বলিল, 'ঠাকুর মশাই, এ জায়গাটা কিছু খারাপ।

আজ আপনারা একটু সজাগ থেক ; ঘুমিয়ে পড় না।' তদনুসারে আমরা সকলে সজাগ ও সতর্ক হইয়া রহিলাম। গোপীনাথ সর্দ্দারও সাবধান হইয়া চারিদিকে চৌকি দিতে লাগিল।

তিথি শুক্লপক্ষের সপ্তমী কি অষ্টমী ; চাঁদ প্রায় ডুবু ডুবু হইয়াছে, এমন সময় গোপীনাথ চুপে চুপে আসিয়া আমাকে বলিল, 'দাদাঠাকুর ! সকলে সাবধান হও। গতিক বড় ভাল বুঝ্‌ছি না।' আমি বলিলাম, 'কেন, কি হয়েছে ?' গোপীনাথ নদীর উত্তর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিল, 'ঐ দ্যাখো ! ওগুলো কি বল দেখি ?' আমি দেখিলাম, পাশাপাশি দশ বারটা কাল হাঁড়ি আমাদের দিকে ভাসিয়া আসিতেছে। আমি বলিলাম, 'ও তো কতকগুলো কেলে হাঁড়ি। ওতে আবার ভয়ের বিষয় কি দেখ্‌লি ?' গোপীনাথ বলিল, 'না দাদাঠাকুর ! ও শুধু কেলে হাঁড়ি নয়। ওর ভিতরে মানুষ আছে।' আমি ত শুনিয়াই অবাক্ ! গোপীনাথ বলিতে লাগিল, 'ঐ কেলে হাঁড়ির ভিতরে মাথা লুকিয়ে তারা ভেসে আস্‌ছে। হাঁড়ির সাম্‌নে ছ্যাঁদা আছে, তাই দিয়ে দ্যাখে আর নিশ্বেস ফ্যালে। আমি অনেকের কাছে শুনেছি, নদীতে চোর ডাকাতেরা ঐ রকম করে আসে।' এই বলিয়া গোপীনাথ মাঝিদের সকলকে সাবধান করিয়া দিতে গেল। মাঝিরা তখনই বড় বড় বাঁশের লগি লইয়া নৌকার চারিদিকে দাঁড়াইয়া উঠিল। পুরুষ যাত্রিগণও লাঠি সোঁটা লইয়া আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইলেন। আমরা সতর্ক আছি দেখিয়া পাছে দস্যুগণ পলায়ন করে এই জন্য আমরা কোনও গোলমাল করি নাই ; নিঃশব্দে প্রস্তুত হইতেছিলাম। তাহারাও হাঁড়ির ভিতর হইতে নৌকার উপরে কি হইতেছে, কিছুই দেখিতে পায় নাই। ক্রমে হাঁড়িগুলি অগ্রসর হইয়া নৌকার খুব কাছে আসিল। দেখিতে দেখিতে সকলের অগ্রগামী হাঁড়িটির পার্শ্ব হইতে একখানি হাত উঠিয়া গোপীনাথের পায়ের নিকটস্থ নৌকার কাঠ ধরিল। গোপীনাথ তৎক্ষণাৎ তরবারির এক আঘাতে হাতখানি কাটিয়া ফেলিল। মাঝিরাও সেই মুহূর্ত্তে কতকগুলি হাঁড়ি লক্ষ্য করিয়া বাঁশের লগি দ্বারা খুব জোরে আঘাত করিল। পাঁচ ছয়জন দস্যু সেই গুরুতর আঘাতে টুপ্ টুপ্ করিয়া জলে ডুবিয়া গেল। তখন ছিন্নহস্ত দস্যুপতির আজ্ঞায় অবশিষ্ট দস্যুগণ বেগে সন্তরণ করিয়া কূলে উঠিয়া পলায়ন করিল।

পরদিন প্রভাত হইতে না হইতে নৌকা খুলিয়া দেওয়া হইল। সেদিন মধ্যাহ্নে আর তীরে উঠিয়া রন্ধনাদি করা হইল না। নৌকাতে বসিয়াই ফলাহার করা গেল। কেন না, তাহা না হইলে অগ্রগামী নৌকাগুলির সঙ্গ লাভের কোন আশা থাকে না। কিন্তু মাঝিরা সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়াও সেদিন অন্য নৌকাগুলি

ধরিতে পারিল না। তখন তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, 'তাই ত! আজও কারুর নাগাল পাওয়া গেল না।' আমাদের ঘাটে পৌঁছিবার প্রায় আধ ঘণ্টা পরে আর একখানি নৌকা আমাদের পার্শ্বে আসিয়া নঙ্গর ফেলিল। তাহাতে কতকগুলি ভদ্রলোক আরোহী দেখিয়া আমাদের কতকটা সাহস হইল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, এমন সময়ে একখানি ছোট ছিপ্ (এক প্রকার লম্বা ও সরু নৌকা) আসিয়া আমাদের নৌকার পার্শ্বে লাগিল এবং মাঝিরা সজাগ আছে দেখিয়া ছিপের একজন দাঁড়ি বলিল, 'ভাই! এক ছিলিম তামাক দিতে পার?' মাঝিরা জানিত যে, বোম্বেটিয়ারা এইরূপ ছিপে করিয়া আসে এবং আগুন বা তামাক চাহিবার ছল করিয়া নৌকায় উঠিয়া আক্রমণ করে। সেইজন্য তাহারা পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। ছিপের দাঁড়ি তামাক চাহিবামাত্র আমাদের একজন দাঁড়ি বলিল, 'না ভাই, আমাদের তামাকু ফুরিয়েছে, অন্য জায়গায় দেখ।" এই কথা বলিবামাত্র ছিপের লোকেরা তাহাকে গালাগালি দিয়া জলে ফেলিয়া দিল এবং আমাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য নৌকায় উঠিতে চেষ্টা করিল। এই সময় আর তিন চারিখানি ছিপ্ দ্রুত আসিয়া আমাদের নৌকা আক্রমণ করিল। মাঝিরা চীৎকার করিয়া বাঁশ হাতে লইয়া দাঁড়াইল। গোপীনাথ ঢাল তলোয়ার লইয়া অগ্রসর হইল। কিন্তু দস্যুগণ এত নিকটে আসিয়াছিল যে, বড় বড় বাঁশ দিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার সুবিধা হইল না। ক্রমে উভয় পক্ষে হাতাহাতি আরম্ভ হইল। একজন দস্যু অলক্ষিতভাবে পশ্চাৎ দিক হইতে গোপীনাথের পায়ে কাছি লাগাইয়া এমন এক টান মারিল যে, গোপীনাথ উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল। দস্যুগণ নৌকা অধিকার করে করে, এমন সময় আমাদের পার্শ্বস্থ নৌকা হইতে ঘন ঘন বন্দুকের আওয়াজ হইতে লাগিল এবং দস্যুদের মধ্য হইতে আট দশজন আহত হইয়া কেহ নৌকায়, কেহ জলে পড়িয়া গেল। তখন বেগতিক দেখিয়া ডাকাতেরা সত্বর ছিপ্‌গুলি খুলিয়া দিল। কিন্তু তাহাতেও তাহারা নিস্তার পাইল না। বহুদূর পলায়ন করিবার পূর্ব্বে বন্দুকের গুলিতে তাহাদের মধ্যে আরও তিন চারিজন প্রাণ হারাইল। আমাদের পার্শ্বের নৌকায় যে ভদ্রলোকগুলি ছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে আত্মরক্ষার জন্য দুইটি দোনলা বন্দুক ছিল। তাঁহারা নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছিলেন, এমন সময় আমাদের নৌকায় গোলমাল শুনিয়া তাঁহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হয় এবং তাঁহারা বন্দুকের সাহায্যে দস্যুদিগকে তাড়াইয়া দেন। এইরূপে আমরা ঈশ্বরের কৃপায় সে যাত্রা রক্ষা পাইলাম।

আমাদের সঙ্গী নৌকার ভদ্রলোকগুলিও কাশী যাইতেছিলেন তাঁহারা আমাদের সঙ্গে থাকিতে সম্মত হওয়াতে আমরা অনেকটা নির্ভয় হইলাম তদ্ভিন্ন পরদিন মাঝিরা প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া অগ্রগামী অন্যান্য নৌকার সহিত মিলিল। তাহার পর কাশী যাইবার পথে আমাদের আর বিশেষ কোনও বিপদ্ ঘটে নাই। তখন রেলগাড়ী ছিল না ; কাশী পঁহুছিতে ও একে একে কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, পুষ্কর প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিতে এক বৎসর কাটিয়া গেল। তখন আমার মাতাঠাকুরাণী ও অন্যান্য স্ত্রীলোকগণ শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ-দর্শনে যাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন। পুরুষদের মধ্যেও অনেকের সে ইচ্ছা ছিল। কাজেই শ্রীক্ষেত্রে যাওয়া স্থির হইল ; এবার সমস্ত পথটাই হাঁটিতে হইবে। আবার বৈশাখ মাস ফিরিয়া আসিয়াছে। পশ্চিমের সেই গরমে দিনের বেলা পথে চলে কাহার সাধ্য ? কাজেই আমরা অন্যান্য যাত্রীদিগের সঙ্গে দল বাঁধিয়া সন্ধ্যাকালে ও ভোরে পথ চলিতাম এবং দিবসে আহারাদির পর বিশ্রাম করিতাম। পথে মধ্যে মধ্যে চটি বা পান্থনিবাস ছিল। উহাই যাত্রীদের আশ্রয় স্থল। যতক্ষণ চটি না পাওয়া যায়, ততক্ষণ পথ চলা ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। পথে কোথাও বিশ্রাম করা কেহই নিরাপদ বলিয়া মনে করিত না।

শ্রীক্ষেত্রে যাইবার পথে কোথাও মাঠ, কোথাও বালুকাময় মরুভূমি, কোথাও পর্ব্বত, কোথাও বা জঙ্গল। পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবার জন্য শ্রীক্ষেত্রের দুইজন পাণ্ডা আমাদের সঙ্গে ছিল। আমরা তাহাদেরই পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলাম। পাঁচ ছয় দিনের পথ অতিক্রম করিলে পর বর্দ্ধমানবাসিনী একজন স্ত্রীলোক যাত্রীর ওলাউঠা হইল। পাণ্ডারা তাঁহাকে তদবস্থায় ফেলিয়া যাইতে পরামর্শ দিল। কিন্তু তাঁহার মাতা কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন পাণ্ডাদের পরামর্শে সকলে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাত্রার উদ্যোগ করিল। আমার মাতা ঠাকুরাণী বলিলেন, 'যে যায় যাক্ ; আমাদের কপালে যা থাকে হবে। তা ব'লে মানুষ হ'য়ে এমন কাজ কর্‌তে পার্‌বো না ; রামকমল কি বলিস্ ?' মা যাহা বলিলেন, আমিও ঠিক তাহাই ভাবিতেছিলাম। আমাদের গ্রামবাসী সঙ্গীদের মধ্যে অনেকেই আমাদের মতে মত দিলেন। কেবল দুই একজন মাত্র অপর যাত্রীদের সঙ্গে চলিয়া গেলেন। সকলে চলিয়া গেলে পর আমরা রুগ্নার সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। আমার সঙ্গে দুই একটি ঔষধ ছিল। আমি তাহা হইতে রোগীকে খানিকটা ক্লোরোডাইন খাওয়াইয়া দিলে পরে, তাঁহার দুই তিন ঘণ্টা নিদ্রা হইল। নিদ্রাভঙ্গের পর তিনি অনেকটা সুস্থবোধ করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ ও

পথশ্রম সহ্য করিবার উপযুক্ত হইতে আরও তিন চারি দিন গেল কাজেই আমরা আমাদের পূর্ব্ব সঙ্গীগণের অনেক পশ্চাতে পড়িলাম।



এখন প্রথম ভাবনা, কে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে? আমরা এই বিষয় চিন্তা করিতেছি, এমন সময় চারিজন পথিক সেই পান্থ-শালায় উপস্থিত হইল। তাহারা ময়ূরভঞ্জের রাজার লোক বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিল। বলিল, তাহারা রাজমাতাকে বৃন্দাবনে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য রক্ষক হইয়া গিয়াছিল; এক্ষণে ময়ূরভঞ্জে ফিরিয়া যাইতেছে। আমরা কোথা যাইব জিজ্ঞাসা করাতে, আমি উত্তর করিলাম, 'আমরা শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দর্শনে যাইব।' তাহাতে তাহারা বলিল, 'ভালই হইয়াছে। আমাদের দুইজন লোক পুরীতে আছে। তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার জন্য আমরাও সেই পথে যাইতেছি। বাবু, পথ বড় খারাপ; কিন্তু যখন আমাদের সঙ্গ পাইয়াছেন, তখন আর আপনাদের কোন ভয় নাই।' পথ-প্রদর্শক ও রক্ষক উভয়ই পাইলাম ভাবিয়া আমরাও অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। কিন্তু গোপীনাথ সর্দ্দার আমাকে এক পার্শ্বে ডাকিয়া লইয়া গিয়া চুপে চুপে বলিল, 'দাদাঠাকুর, আমার ভাল ঠেক্‌ছে না। এরা যদি রাজার মার চৌকিদার হবে, তা' হলে এদের সঙ্গে কোনও হেতের (অস্ত্র-শস্ত্র) নেই কেন? আমার মনে কেমন সন্দ হচ্চে।' আমি বলিলাম, 'হেতের নেই, সে ত ভালই। থাক্‌লে বরং ভয় ছিল; আমাদের উপর চড়াও হতে পার্‌ত।' গোপীনাথ বলিল, 'না দাদাঠাকুর! হেতেরকে পার আছে। আমিও হেতের ধর্‌তে জানি। কিন্তু ছিঁচ্‌কে চোর আর জুয়াচোরকে আঁটা দায়।' আমি বলিলাম, 'হুঁসিয়ার থাকলে ওরা কি কর্‌তে পার্‌বে?' গোপীনাথ বলিল, 'অষ্টপ্রহর হুঁসিয়ার থাকা বড় শক্ত কথা। আমারই দেখ্‌চি ঘুম হবে না, আমাকেই হুঁসিয়ার থাকৃতে হবে।'

পুঁটুলি পোঁট্‌লা বাঁধিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করা গেল। দুই তিন দিনের পথ গেলে পর আমাদের পথ প্রদর্শকগণ একটা জঙ্গলের পথে প্রবেশ করিল।

আমরা আপত্তি করিলে বলিল, 'এ পথে গেলে আমরা আট দিনের পথ চারদিনে যাব।' তাহা হইলে আমাদের পূর্ব্ব সঙ্গীদের সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা ভাবিয়া আমি তাহাতে সম্মত হইলাম। জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া অবধি আমরা দিবসে চলিতাম ও রাত্রি হইলে চারিদিকে আগুন জ্বালিয়া তাহার মধ্যবর্ত্তী স্থানে শুইয়া বসিয়া থাকিতাম। আমাদের পথ প্রদর্শকগণ স্বতন্ত্রস্থানে শয়ন করিয়া থাকিত। পথশ্রমে আমরা অনেক সময় ঘুমাইয়া পড়িতাম ; গোপীনাথকেও আর সকলের ন্যায় বিশ্রাম করিতে ও ঘুমাইতে দেখা যাইত। কিন্তু আমি পরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, সে বস্তুতঃ ঘুমাইত না, নিদ্রার ভাণ করিত মাত্র। জঙ্গলের পথে প্রবেশ করিবার দুই দিন পরে গোপীনাথ আমাকে নির্জ্জনে যাহা বলিল, তাহা শুনিয়া ভয়ে আমার প্রাণ শুকাইয়া গেল ও শরীর ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। গোপীনাথ যাহা বলিল, তাহার সার মর্ম্ম এই—

'দাদাঠাকুর, আমি আগে ভেবেছিলাম, এরা ছিঁচ্‌কে চোর কি জুয়াচোর। কিন্তু তা নয়। এরা সর্ব্বনেশে লোক ! এরা ফাঁসিওয়ালা, লোকের গলায় রুমাল কি দড়ি দিয়ে পাক্ দিয়ে মেরে ফ্যালে। আমাদের দেশে এদের ঠগী বলে। কাল অনেক রাত্রে তোমরা সকলে যখন ঘুমুচ্ছিলে, আর আমি জেগে ঘুমুচ্ছিলাম, তখন এরা যে কথাবার্ত্তা কচ্ছিল, তা শুনে আমার পেটের পিলে চম্‌কে গ্যাছে। এরা পাকা ঠগ, গলায় ফাঁসি দিতে খুব মজবুত ! এরা বলাবলি কর্‌ছিল যে শীঘ্রই এদের দলের আরও দুজন লোক আস্‌ছে। আমি ত শুনে অবধি একেবারে কাঠ হয়ে গেছি। আমার ত আর এদের সঙ্গে যেতে মন সর্‌চে না। জঙ্গলে পথ হারিয়ে যাই, কি বাঘ ভালুকের মুখে পড়ি, সেও ভাল, তবু এমন লোকের সঙ্গে যেতে নেই।' আমি বলিলাম, 'এখন কি করা যায় ?' গোপীনাথ বলিল, 'আমি বলি, আজ রাতারাতি তোমরা এদের ফেলে পালাও।' আমি তফাতে তফাতে থেকে এরা কোথায় যায়, কি করে দেখি। কেবল আমরা দলে ভারি বলে এরা আজও কিছু কর্‌তে পারে নি। নইলে এত দিনে এই জঙ্গলের ভিতর সব সাবাড় করে দিত। তোমরা আজই পালাও ! গোপীনাথের পরামর্শ যুক্তিযুক্ত স্থির হইল ! আমি ক্রমে ক্রমে চুপে চুপে সকলকে সতর্ক ও পলায়নের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে বলিলাম। ঠগ চারিজন পূর্ব্ব দিন কথায় বার্ত্তায় নিদ্রা যায় নাই ; আজ খুব ঘুমাইতেছিল আমরা সেই অবসরে নিঃশব্দে উঠিয়া প্রস্থান করিলাম। আমরা যে পথে আসিয়াছিলাম, তাহাতে বোধ হয় সর্ব্বদা লোকজন যাতায়াত করিত। কারণ পথটি সংকীর্ণ হইলেও অনেক পরিমাণে পরিষ্কার, গাছ পালা কিছুই ছিল না। আমাদের সঙ্গে

চারিটি লণ্ঠন ছিল, আমরা তাহা জ্বালিয়া সেই গভীর রাত্রিতে প্রাণ হাতে করিয়া ভগবানের নাম করিতে করিতে সেই জঙ্গলের পথে যাত্রা করিলাম। গোপীনাথ ঠগেদের মাথার উপর একটা ঘন গাছের ঝোপের ভিতর বসিয়া রহিল।

গোপীনাথ লাঠির উপর ভর দিয়া দ্রুত পথ চলিতে পারিত। সে আশে পাশে জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিয়া ঠগদিগের সংবাদ লইয়া আমাদিগকে বলিয়া যাইত। পরদিন গোপীনাথ আসিয়া বলিল, ঠগেরা নিদ্রা হইতে উঠিয়া আমাদিগকে দেখিতে না পাইয়া সেই পথ ধরিয়া আসিতেছে।

আমরাও দিনরাত্রি চলিতে লাগিলাম। দ্বিতীয় দিবস রাত্রিতে গোপীনাথের মুখে শুনিলাম, ঠগেরা ক্রমেই আমাদের নিকটবর্ত্তী হইতেছে। কেবল তাহা নয়, তাহারা সংবাদ পাইয়াছে যে, তাহাদের দলের লোকেরা সেই রাত্রেই আসিয়া



পঁহুছিবে এবং তীর্থযাত্রী কোনও জমিদার ও তাঁহার অনুচর বলিয়া পরিচয় দিয়া আমাদের সঙ্গে জুটিবে। আমরা প্রাণের দায়ে দৌড়াইতে আরম্ভ করিলাম। গোপীনাথ ফিরিয়া গেল। খানিক পথ গিয়াছি, এমন সময় আমাদের পশ্চাতে প্রায় আধক্রোশ দূরে হৈ হৈ শব্দ ও তাহার সঙ্গে ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম! ঐ গর্জ্জন শুনিয়া আমরা আরও বেগে দৌড়াইতে আরম্ভ করিলাম। দৌড়াইতে দৌড়াইতে আমরা ঘন জঙ্গল ছাড়াইয়া প্রায় মাঠে আসিয়া পড়িয়াছি, এমন সময় গোপীনাথ লাঠির উপর ভর দিয়া লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া বলিল, 'দাদাঠাকুর! আপদের শাস্তি হয়েছে। যে চার ব্যাটা আমাদের পিছু নিয়েছিল, তাদের তিন্‌টে

নিকেশ হয়েছে। আমি একটা গাছের উপরে লুকিয়েছিলাম, তারা যেই সেই গাছতলায় এলো, অমনি মশালের আলোতে তারাও দেখ্‌লে, আমিও দেখ্‌লাম, সাম্‌নে থেকে এক প্রকাণ্ড বাঘ একটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে পিঠে করে নিয়ে পালালো আর একটা বাঘ অন্য এক জনের ঘাড়ে পড়ে কড়্‌ মড়্‌ করে তার হাড় ভাঙ্গ্‌তে লাগ্‌লো। আমি ত অবাক্‌! বাকী তুজন ভয়ে দিশেহারা হয়ে তুদিকে ছুট্‌ দিল। তাদের এক জনের হাতে মশাল ছিল। খানিক পরে সেই ব্যাটাকে ছুট্‌তে ছুট্‌তে আমার কাছে আস্‌তে দেখে, আমি তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে তার মাথায় কসে এক ঘা লাঠি ঝেড়ে দিলুম। বাছাধনকে বাপও বল্‌তে হল না, মাও বল্‌তে হল না। তারপর মশালটা কুড়িয়ে নিয়ে খানিক দূরে ছুড়ে দিই, আর লাঠি ফেলে লম্বা লম্বা লাফ মারি। এই রকম ক'রে জঙ্গল পার হ'য়েই তোমাদের আলো দেখ্‌তে পেলাম।'

আমরা অবাক্‌ হইয়া গোপীনাথের কথা শুনিতেছিলাম। তাহার কথা শেষ হইলে আমরা সকলে একবাক্যে "জয় জগন্নাথ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম। অমনি কিছু দূরে যাত্রীদিগের মধ্য হইতে "জয় জগন্নাথ" শব্দ মহোৎসাহে উচ্চারিত হইল। নিকটে গিয়া দেখি, তাঁহারা আমাদেরই পূর্ব্বের সহযাত্রী; অন্য পথে আসাতে তাঁহাদের বিলম্ব হইয়া গিয়াছে।

জগন্নাথ দর্শন করিয়া আমরা মেদিনীপুরের পথ দিয়া দেশে ফিরিলাম। পথে আর বিশেষ কোনও বিপদ্‌ ঘটে নাই।

ডিটেক্‌টিভের গল্প

(১)

ম্যাট্রিক দিয়া রমি গিয়াছিল পুরীতে; খাঁচা ছাড়িয়া বাহিরে মুক্তির স্বাদ লইতে। পুরীর চক্রতীর্থে মাসিমার বাসা—রমির আনন্দের আর সীমা নাই!

সারাদিন ক্যামেরা ঘাড়ে এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ানো—সন্ধ্যায় সমুদ্রের তীরে বসিয়া ছবি আঁকা—বাড়ীর কথা রমি ভুলিয়া গেল।

সেদিন সে চন্দন-পুকুরে গিয়াছিল—একধারে বসিয়া ছবি আঁকিতেছিল, নিবিষ্ট মনে। হঠাৎ পাশে এক বাঙ্গালীর আবির্ভাব। বয়স হইয়াছে—ফ্রেঞ্চকাট্‌

দাড়ি, চোখে কালো চশমা আঁটা, পরণে হাফ্‌প্যান্ট, গায়ে একটা খাকী সার্ট, মাথায় শোলা হ্যাট্‌। আগন্তুক আসিয়া কহিল—কি, ছবি আঁক্‌ছো……

কথার সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুক ঝুঁকিয়া রমির ছবি-পানে চাহিল, কহিল—বাঃ, এই বয়সে তোমার খাসা হাত তো। কি পড়্‌চো ?

রমি বলিল—এবারে ম্যাট্রিক দিয়েচি।

আগন্তুক কহিল—বেশ ! বেশ ! বেশ ! পাশ ক'রে বিলেত চলে যাও—ছবি আঁকতে শেখো ; বাপ-মাকে চেপে ধরো। না হলে দেশে থেকে করবে কি ? পাশ আর সে পাশ নেই হে, পাঁশ হয়ে গেছে। কথাটা বলিয়া তার কৌতুক-রসে আগন্তুক নিজেই হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রমি ক্ষণেকের জন্য তার পানে চাহিয়া আবার ছবি আঁকায় মন দিল। আগন্তুক কহিল—শিকারে মন আছে ?

রমি কহিল,—আছে।

আগন্তুক কহিল—আচ্ছা, যে দিন যাবো, নিয়ে যাবো……ভুবনেশ্বরে, নয় চিল্কার কাছে। ইয়া হরিণ, ইয়া ইয়া হাঁস—কলকাতায় থাকো নিশ্চয়, তোমরা কলকাতা জুড়েও তেমন হাঁস, তেমন হরিণ, কখনো ছাখো নি।……আগন্তুক পকেট হইতে একটা সিগার বাহির করিয়া জ্বালিয়া মুখে পূরিল, পূরিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।……

আলাপ এইটুকু। রমি আবার নিজের মনে ছবি আঁকিতে লাগিল—ঐ মস্ত দীঘি, তার মাঝে ঐ সুন্দর বাড়ীটুকু চমৎকার। কিন্তু গরীব উড়িয়ার দেশে অযত্নে কি শ্রীই হইয়াছে !

পাঁচ সাত দিন পরের কথা। স্বর্গদ্বারে সাধু হরিদাসের সমাধি দেখিয়া রমি ফিরিতেছিল সমুদ্র-তীর ধরিয়া ; সেই আগন্তুক ! আগন্তুক কহিল—এই যে—পাশের খবর পেলে ?

রমি কহিল—পেয়েছি।

আগন্তুক কহিল—পাশ হয়েছ ? ফার্ষ্ট ডিভিসনে ?

রমি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হ্যাঁ।

আগন্তুক কহিল—বাঃ বাঃ বেশ ! আমি বলেছি, তুমি একটা মানুষের মত মানুষ হবে। অমন ছবি আঁকো……তা,……চল শিকারে একদিন……

রমি কহিল—আপনি নিয়ে গেলেন কৈ ?……পরশু তো বাড়ী ফিরচি……

আগন্তুক কহিল—পরশু ?

রমি কহিল—হ্যাঁ……

আগন্তুক স্থির দৃষ্টিতে তার পানে চাহিয়া রহিল; তারপর কহিল—বটে! কলকাতায় তোমার বাড়ী কোথায়?

—শ্যামপুকুরে! আগন্তুকের চোখের ভাব এমন হইল যেন শ্যামপুকুর তার ভারী আদরের জায়গা! পরক্ষণেই সে ভাব সামলাইয়া আগন্তুক কহিল,—তাই তো, শিকারে তোমায় নিয়ে যেতে পারলুম না! আচ্ছা। আবার এক সময় দেখা যাবে……কি বলছো! হা—হা—হা—

সে হাসি। হাসির কি ষ্টাইল!

(২)

পুরী-এক্সপ্রেস পুরী ছাড়িল—সন্ধ্যা আসন্ন। রমির কামরায় রমি একা……কতকগুলো ম্যাগাজিন ও খবরের কাগজ কিনিয়া সে বেঞ্চে জড়ো করিয়াছে। সেগুলো নাড়া-চাড়া করিতেছিল। গাড়ী প্ল্যাটফর্ম্ম ছাড়ে ছাড়ে, দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিল…… রমি চাহিয়া দেখে, সেই আগন্তুক! তার হাতে একটা ছোট চামড়ার বাক্স। বাক্সটা রাখিয়া বেঞ্চে বসিয়া আগন্তুক কপালের ঘাম মুছিল, তারপর রমির পানে চাহিল, কহিল—চলেছো তা'হলে বাড়ী?

রমি কহিল—হ্যাঁ। আপনি?

আগন্তুক কহিল—আমিও তোমার সঙ্গী হলুম—বাড়ী থেকে টেলিগ্রাম এলো—জরুরী দরকার। মানে, এক ভাইঝীর বিয়ে, তাই; এখানে রুগ্ন বন্ধু একটি, তাকে ছেড়ে যাওয়াও শক্ত, কি বা করি, ভাবতে ভাবতে শেষে টিকিট কিনে গাড়ীতে চড়ে বসলুম····হা—হা—হা—

আবার সেই হাসি! বিরক্ত হইয়া রমি একখানা ষ্ট্রাণ্ড ম্যাগাজিন খুলিল; ট্রেন চলিতে লাগিল। বাহিরে গাছ-পালা মাঠ-ঘাট……জ্যোৎস্নার মিহি পর্দ্দার আড়ালে সে যেন কোন্ স্বপ্নরাজ্যের আবছায়ার মত ভাসিয়া চলিয়াছে!

ছোটখাট দুই চারিটা ষ্টেশনও পার হইল—রমির মন তখন ষ্ট্রাণ্ডের একটা পাতার মধ্যে তন্ময়। সামনের বেঞ্চে বসিয়া আগন্তুক—সেও স্তব্ধ!

খুর্দ্দা-জংসনে ট্রেন থামিলে আগন্তুক নামিয়া গেল নিঃশব্দে! রমি খোলা জানলায় মুখ বাড়াইয়া দেখিল, আগন্তুক একেবারে সেই প্ল্যাটফর্ম্মের প্রান্তে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। কামরায় দুই চারিজন ভদ্রলোক আসিয়া ঢুকিলেন, কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে নামিয়া গেলেন। রমি আবার পড়া গল্পের খেই ধরিল। হঠাৎ আবার সেই আগন্তুক। আগন্তুক কহিল—ভারী বিপদ্!

রমি সবিস্ময়ে চাহিল।

আগন্তুক কহিল—আমার যাওয়া হলো না। ষ্টেশনে টেলিগ্রাম এসেচে পুরী থেকে। আমার সে বন্ধুটির অসুখ বেড়েছে, উন্মাদ-রোগ। পরের ট্রেনেই আমায় ফিরতে হবে, আর একটা মুস্কিল!

রমি কহিল, কি হোল?

আগন্তুক কহিল—আমার ভাইঝীর জন্য কতকগুলো দামী গহনা আছে বাক্সে। তুমি যদি একটু কষ্ট করে এটা সঙ্গে নাও! তোমার বাড়ীর ঠিকানা আমায় লিখে দাও, আমি খুড়োমশায়কে টেলিগ্রাম করে দি, তিনি তোমার কাছ থেকে নিয়ে যাবেন তোমার বাড়ী এসে। তাঁর নাম নন্দলাল মিত্তির, মাথায় টাক্, মাথার পিছনের চুল লম্বা, দাড়ি আছে, পাকা দাড়ি ···ফর্শা রঙ। আমার টেলিগ্রাম নিয়েই যাবেন তিনি; কেমন? এ ভার-টুকু নেবে তো, বাবা?



"ভাইঝীর জন্য ···গহনা আছে বাক্সে।"

ভারী দায়! ক্ষণেকের জন্য রমির মুখে কথা ফুটিল না। রাত্রে গাড়ীতে সে একা—ট্রেণে চুরি-ডাকাতিও হয়!···আগন্তুক রমির দুই হাত ধরিয়া কহিল, এ উপকারটুকু করতে হবে বাবা, young man, ভয় কি? তা ছাড়া, মেয়ের বিয়ের জিনিষ, কাজেই জরুরী কন্যাদায়·

রমি কহিল—কিন্তু আমায় এতখানি বিশ্বাস করবেন কি ব'লে?"; যদি···

আগন্তুক কহিল—মানুষের মুখ দেখে মানুষ চিনবো না এখনও? তোমার হাতে নির্ভয়ে এগুলো তুলে দিচ্ছি।

এতখানি বিশ্বাস! অজানা অপরিচিত লোককে—রমির মনে ভয় যে হইল না এমন নয়!

ট্রেনের ঘণ্টা পড়িল। আগন্তুক ব্যস্তভাবে কহিল—আর সময় নেই। আমায় রক্ষা করো, বাবা; তোমরা young men, মানুষের দায়ে তোমরা দাঁড়াবে না তো কে দাঁড়াবে? আমি তা'হলে নিশ্চিন্ত হয়ে চল্লুম। আমার খুড়োমশায়ের নাম নন্দলাল মিত্তির, মাথার মাঝখানে টাক্, পিছনে লম্বা চুল, পাকা দাড়ি, ফর্শা রঙ, মনে থাকবে তো?

রমি কহিল—আমার ঠিকানা···বলিয়া একটা খবরের কাগজের কোণ ফ্যাশ্ করিয়া ছিঁড়িয়া সেই কাগজে পেন্সিল দিয়া রমি ঠিকানা লিখিয়া দিল।

ট্রেন চলিতেছিল। আগন্তুক কহিল—God bless you। বলিয়াই চলন্ত ট্রেনের কামরা হইতে প্ল্যাটফর্ম্মে লাফাইয়া পড়িল।

রমি একটু বিস্মিত হইল কিন্তু বিস্ময় থিতাইতে পারিল না। পরের জিনিষ, দামী গহনা তার কাছে গচ্ছিত আছে! সেগুলোর সম্বন্ধে রীতিমত সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। নিজের বন্ধ সুটকেশটা খুলিল; তার মধ্য হইতে ড্রয়িংয়ের বাক্স, রঙের বাক্স, ক্যামেরা বাহির করিয়া সেইখানে চটে-মোড়া চামড়ার বাক্স পুরিয়া সুটকেশে চাবি দিল; চাবিটা বাঁধিল ফাঁশ দিয়া গলার পৈতায়। বাঁধিয়া কোটের বোতাম আঁটিয়া আবার একখানা ম্যাগাজিন খুলিল।

রমি জানালা দিয়া বাহিরের দৃশ্য দেখিতে লাগিল। আকাশে জ্যোৎস্না, মাঝে মাঝে মেঘের লুকোচুরি···নদী, নালা, বন, জলা চকিত স্পর্শ দিয়া গোপন অদৃশ্য অন্তরালে সরিয়া চলিয়াছে!

কাটজুড়ী নদী পার হইয়া ট্রেন আসিয়া কটক-ষ্টেশনে থামিল। প্ল্যাটফর্ম্মে বহু লোক। পুলিশও গিজ্ গিজ্ করিতেছে। পুলিশ প্রতি কামরায় মাথা ঢুকাইয়া কাহার সন্ধান করিতেছে! তার কামরাতেও তারা মাথা ঢুকাইল।

রমি কহিল—কি হয়েছে, মশায়?

পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর কহিল—Big jewellery theft—নেমুচির রাণী সাহেবার হীরা-জহরৎ—প্রায় দেড় লক্ষ টাকা দাম হবে! আজ পাঁচ সাত দিন প্রতি ট্রেনে সন্ধান করছি।

রমি কহিল—কি করে ধরবেন? বাক্সে-তোরঙ্গে ভ'রে গহনা নিয়ে যায় যদি?

ইন্‌স্পেক্টর কহিল—আমাদের নিশানা আছে।

পুলিশ চলিয়া গেল। রমি জানালায় মুখ বাড়াইয়া তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল। একটা থার্ড ক্লাশ কামরায় সহসা চীৎকার! পুলিশ টানিয়া একটা লোককে বাহির করিল। প্রহারের পর প্রহার। কিন্তু মাল? মাল তো বাহির হইল না! ··তবে?

প্রায় আধ ঘণ্টা গাড়ী দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর আবার ছাড়িল। এই কল-কোলাহলের পর প্রকৃতির শান্ত-ছবি! রমি নক্ষত্র-ভরা আকাশের পানে চাহিল।

(৩)

সকালে সাঁতরাগাছিতে টিকিট-সংগ্রহের পালা। এখানেও পুলিশের ভিড়। প্ল্যাটফর্ম্মের পানে চাহিয়া রমি দেখে, দাদা। সে চীৎকার করিয়া ডাকিল—দাদা!

দাদা ছুটিয়া আসিল, কহিল—নেমে পড়ো রমি; আমি গাড়ী নিয়ে এখানে এসেছি তোমায় meet করতে। চলো, এটুকু মোটরে যাবো।

রমি কহিল—অমিরা যদি হাওড়ায় এসে থাকে? দাদা কাকার ছেলে। দাদা কহিল, জ্যাঠাবাবুকে কাল রাত্রে আমি বলেছি, আমরা সাঁতরাগাছিতে তাকে নামিয়ে নেবো। একটু Variety হবে। গাড়িতে আছে অমি, টুকু, গজু, খোকা।

রমি অগত্যা নামিয়া পড়িল এবং নির্ব্বিবাদে আসিয়া মোটরে চাপিল।

হাওড়া ঘুরিয়া শ্যামপুকুরের বাড়ীতে পৌঁছিতে বাবা বলিলেন, এক বুড়ো ভদ্রলোক তোমার খোঁজে এসেছিলেন; কি জিনিষ না কি তাঁর জন্য কে পাঠিয়েছে তোমার সঙ্গে!

রমি কহিল, হ্যাঁ, নেমুচির রাণীজীর জহরৎ। চোরাই মাল!

চোরাই মাল! বাবার বিস্ময়ের সীমা নাই!

রমি কহিল, গাড়ীতে পুলিশ-সার্চ্চ চলেছে! চোর তেমনি বেকুব—মাল নিয়ে ট্রেনে চড়ে সমারোহ ক'রে আসবে!

বাবা কহিলেন—কিন্তু কি জিনিষ? তোর সঙ্গে কে পাঠালে রে?

রমি কহিল—নাম জানি না। এক ভদ্রলোক ট্রেনে আসছিলেন, তাঁর ভাইঝীর বিয়ের গহনা। তিনি আসতে আসতে নেমে গেলেন······

—ওঃ!

উপরের ঘরে অমি, টুকুরা তাদের খেলনা পাইবার জন্য মহা তাগিদ সুরু করিয়া দিয়াছে। রমি সুটকেশ খুলিয়া খেলনা-বিতরণে মনোযোগী······

বাহিরে এক বড় মোটর আসিয়া দাঁড়াইল— বহুকালের পুরানো মোটর।

ভৃত্য আসিয়া কহিল—সেই বুড়ো বাবু এসেছেন, দাদাবাবু। রমি বাইরের ঘরে চলিল। ঘরে বাবা আর সেই বুড়ো বাবুটি—বর্ণনা মেলে। মাথার মাঝখানে টাক্, পিছনে লম্বা চুল! ইনিই সেই নন্দলাল মিত্তির!

রমির বাবার সঙ্গে নন্দলাল কথা কহিতেছিলেন। নন্দলাল বলিলেন—দলিল-পত্রগুলো পাঠিয়েছে। বড় জমিদারী বন্ধক দেবে; আমি রাজি ছিলুম না। অক্ষয় বললে অত করে……

দলিল! জমিদারী বন্ধক!……রমি ত অবাক্! ফশ্ করিয়া কেমন মনে হইল, তাই তো, সেই নেমুচির রাণী সাহেবার গহনা নয় তো?

দাদা আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—তার হাতে রমির সেই পুরীতে কেনা একখানা খবরের কাগজ। কাগজ খানার নাম Puri Express।

রমি কহিল—এ বাক্সে দলিল আছে?

নন্দ কহিলেন—হ্যাঁ, বাবা!



নন্দলাল বলিলেন—দলিল-পত্রগুলো পাঠিয়েছে।

রমি পমির পানে চাহিল। পমি তাকে পুরী-এক্সপ্রেস কাগজের একটা জায়গা দেখাইল। এ কি? রমি কাগজখানা পড়ে নাই,—একটা সংবাদ—নেমুচির রাণী সাহেবার গহনা চুরি। দু-চারটি চেহারাও ছাপা আছে। পুরানো কর্ম্মচারী … যাদের প্রতি সন্দেহ। একটা চেহারা কিছু মেলে তো! তবে ঐ দাড়িটা! ছবিতে দাড়ি

নাই······নন্দ মিত্রের মুখে একরাশ দাড়ি!

রমি কহিল—বাক্স আনি, আপনি বসুন। রমি চলিয়া গেল।

রমি গিয়া টেলি- ফোন্ ধরিল। Ring করিয়া শ্যামপুকুর থানাকে কহিল—একটা বড় চুরির ব্যাপার; শীঘ্র আসুন। রমি চট্ করিয়া নামিল না; উপরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিল পুলিশের প্রতীক্ষায়····থানা কাছেই। আট-দশ মিনিটেই ইন্‌স্‌পেক্টর গুপ্ত দুজন সিপাই সঙ্গে নিয়া আসিলেন। ইন্‌স্‌পেক্টরকে দেখিয়া রমি ছুটিয়া নামিয়া গেল এবং সংক্ষেপে তাঁকে ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিল। পমি সেই পুরী-এক্সপ্রেস কাগজে ছাপা ছবি ও চুরির বৃত্তান্ত দেখাইল। গুপ্ত বলিলেন—আমরা বাহিরে থাকি, তুমি বাক্স ওঁর হাতে দাও।

তাই হইল। নন্দ মিত্র বহু ধন্যবাদ দিয়া গা তুলিলেন এবং বাক্স সমেত বাহিরে আসিতেই পুলিশের সঙ্গে দেখা! পুলিশ তাঁকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিল—বাক্সে কি আছে, দেখবো।

—আমার দলিল আছে। আবার কি থাকবে!

—দেখাতে ক্ষতি কি!

প্রবল আপত্তি। কিন্তু গুপ্ত-পুলিশ ছাড়িবার পাত্র নন্। বাক্স খোলা হইল। অমনি চুনী, পান্না, হীরা, মণি-রত্ন ঝক্-মক্ করিয়া উঠিল!

নন্দলাল মিত্রের দাড়িও খসিল; চেহারা যা বাহির হইল, খবরের কাগজে ছাপা ছবির সঙ্গে হুবহু মিল! সকলে অবাক্! গুপ্ত বলিলেন—এ আগেই সরে এসেছে। মালটা সরাতে পারছিল না, পুলিশের কড়া নজর-বন্দী, তাই ঐ চাল চেলেছে। যাক্, রমির এ Journey memorable! তোমার দৌলতেই চোর ধরা পড়লো!

জোর তদারক চলিল। মাল আরো কিছু মিলিল,—কিন্তু চুরি যা গিয়াছিল, তার সিকির সিকি! তারপর নন্দ মিত্রের দু'বছর জেল! কিন্তু সে কথা যাক্······

রমিরও লাভ হইল। রাণী-সাহেবা খুশী হইয়া একখানা মোটর-বাইক রমিকে উপহার দিলেন। পূজার ছুটিতে সেই বাইকে রমি কাশ্মীর-ট্রিপে বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছে, শুনিলাম।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

নেপুর বাই

নেপুর বাই ছিলো যত রাজ্যের সব বড়-বড় দোকানে ক্যাটালগের জন্য চিঠি লেখা—আর যে জিনিষেরই সম্ভব Free sample যোগাড় করা। খবরের কাগজের সে পড়্তো শুধু বিজ্ঞাপন—আর, যখনি লেখা দেখ্তো, 'Please write for our catalogue', একখানা পোষ্টকার্ড ছেড়ে দে'য়া তার চাই-ই। আর কূপন—কূপনের তো কথাই নেই; একই জায়গায় বন্ধু-বান্ধবদের নাম-ঠিকানা দিয়ে যতবার সম্ভব সে কূপন পাঠাতো—ঝুড়ি ঝুড়ি সব নমুনা জড়ো হ'য়ে উঠ্তো--টয়লেটের জিনিষ, নতুন নতুন ওষুধ, চকোলেট, চা, সৌখীন কাপড়—কী নয়? এই সম্পত্তির মধ্যে এক ক্ষুদে রাজার মত সে বিচরণ করতো—ছোট ভাই বোনেরা তা'র হুম্কির চোটে অস্থির; কেউ কোনো জিনিষের গায়ে একটু হাত দিয়েছো কি রক্ষে নেই! অনেক খুঁজে-পেতে নানা রকম আজ্গুবি বিদেশী কোম্পানীর ঠিকানা সে জোগাড় করতো—ইংল্যাণ্ড থেকে, আমেরিকা থেকে, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা থেকে,—এমন কি জাভাদ্বীপ থেকে তা'র নামে ইয়া মোটা মোটা বিচিত্র সব ক্যাটালগ্ আসতো—ফার্নিচারের, পোষাকের, মাখন পনীর আর টিনের ফলের, ফুলের চারা, যন্ত্রপাতি, বাদ্যযন্ত্র—কিসের নয়? নেপুর পড়্বার টেবিলের ওপর সযত্নে, সগৌরবে সেগুলো স্তূপীকৃত হ'য়ে থাকতো—রঙ্ বেরঙের ছবি, কত রকমের জিনিষ; যা নেপু চোখে দেখা দূরে থাক্, কখনো নামও শোনে নি। সব বর্ণনার নীচে যে-ছোট অঙ্কটা লেখা থাকতো, নেপু সেটা এড়িয়ে যেতো; মনে মনে অস্পষ্টভাবে সে বুঝ্তো যে, জিনিষগুলোর ভয়ানক দাম—কিন্তু বড় হ'য়ে সে যখন ভয়ানক বড়লোক হবে, তখন সব কিনে ফেল্বে। রোজ ইস্কুল থেকে ফিরে সে খানিকটা সময়—যে ক্যাটালগ্টা সব চেয়ে নতুন এসেছে, সেটা নিয়ে কাটাতো; চিৎ হ'য়ে শুয়ে ছবি-ভরা পাতাগুলো ওল্টাতে তা'র আনন্দের সীমা ছিলো না। কখনো বা পুরোনো একটা বার ক'রে নিয়ে তেরোবারের বার দেখ্তো। ক্যাটালগ্গুলো ছিলো তার পক্ষে ছবিতে ছবি, গল্পে গল্প। কোনো গল্পের বই-ই তার কাছে অত ভালো লাগ্তো না, যতটা লাগ্তো ক্যাটালগ্—জিনিষগুলোর বিস্তৃত বর্ণনা—কী সুন্দর, নেপু ভাব্তো, কী সুন্দর লেখা। মোড়কগুলো সে সব আস্ত জমিয়ে রাখ্তো—দেশ-বিদেশের ডাকটিকিট সংগ্রহের জন্য নয়; টাইপ করা তা'র নাম, N. M. Roy, Esqr.—ঐটুকু বার-বার ক'রে দেখ্বার জন্য। তা'র নাম বার্মিংহামের বা নিউইয়র্কের কোনো লোক টাইপ করেছে—ভাব্তেও তা'র আনন্দ হ'ত।

কোনো-কোনো কোম্পানি সঙ্গে চিঠি পাঠাতো—'Dear sir, with regard to your kind inquiry of the···, we have great pleasure in pointing out to you certain advantages······

Yours very faithfully,

চিঠিগুলো নেপু যে কতবার ক'রে পড়্‌তো, তার ইয়ত্তা নেই। তা'কে—সাউথ সাবার্ব্বান্‌ ইস্কুলের সেকেণ্ড ক্লাশের ছাত্র নেপালমোহন রায়কে—অত সমীহ করে' চিঠি লিখ্‌ছে বিলেতের, আমেরিকার সব প্রকাণ্ড কোম্পানি !

কী বিনয় ! কী সৌজন্য ! নেপু এক-একখানা চিঠি পড়ে, আর মুগ্ধ হ'য়ে যায়। নেপুর কী জিনিষ চাই, না চাই, কী-ভাবে কিন্‌লে নেপুর সুবিধে হ'তে পারে—তার জন্য ওদের কত ভাবনা। মা-র পরিত্যক্ত একটা হাত-বাক্স জোগাড় করে' সব চিঠিগুলো নেপু তার ভেতর সাজিয়ে রেখেছে ; ও-বাক্সয় কী আছে, কেউ জিজ্ঞেস কর্‌লে নেপু ফোঁস্‌ করে' ওঠে।

একবার এক কাণ্ড হ'ল—নেপু তখন ম্যাট্রিক ক্লাশে পড়ে। Statesmanএ একবার এক বিজ্ঞাপন বেরুলো, এক বিলেতি কোম্পানি নতুন ধরণের কতকগুলো incubator আম্‌দানি করেছে। বিজ্ঞাপন পড়ে' নেপু বুঝ্‌লো incubator হচ্ছে এক রকম যন্ত্র যা'তে ডিম ফোটান হয়। কল্‌কাতার কোনো এক পোষ্ট-বাক্সের ঠিকানায় সে ক্যাটালগ্‌ চেয়ে পাঠালো।

পরের দিনই একরাশ কাগজ-পত্র এসে উপস্থিত। শুধু কি ক্যাটালগ্‌—poultry farming সম্বন্ধে এক পুস্তিকা, ভারতবর্ষের কোন্‌-কোন্‌ সহরে ডিম বেচ্‌বার কী-রকম সুবিধে-সে-বিষয়ে আর এক পুস্তিকা ; আর এক প্রকাণ্ড চিঠি ; সে-চিঠি তিন-চারবার পড়ে'ও নেপু ভালো করে' বুঝ্‌তে পারলেনা। এই মডেলের ইন্‌কিউবেটার ভারতবর্ষে এই প্রথম—অন্যান্য মডেলের চাইতে এ-গুলোর শ্রেষ্ঠতা কোথায়—এ-সব বিশদ ক'রে বোঝানো। সঙ্গের অর্ডার-ফর্ম দয়া করে' সই করে' পাঠালেই যন্ত্রটি তা'র বাড়িতে পৌঁছে দেবে ; এক পয়সাও তা'কে দিতে হবে না, no obligation ; দশদিন সে পরীক্ষা করে' দেখুক, অন্যান্য মডেলের চাইতে এই যন্ত্র অনেক ভালো কি না—তারপর যদি তা'র পছন্দ না হয়, কোম্পানির লোক এসেই ফেরৎ নিয়ে যাবে। এক পয়সাও তা'র খরচ নেই—no obligation. Waiting the favour of your reply, Yours very faithfully......'

ক্যাটালগ্‌টা কিন্তু আশানুরূপ সুন্দর নয়। কতকগুলো অত্যন্ত সাধারণ

চেহারার যন্ত্রের এক-রঙা ছবি—একই যন্ত্র নানা ভাবে—কী-ভাবে যন্ত্র ব্যবহার করতে হয়, তার ছবি।

নীচের লেখাগুলোও নেপুর কাছে শক্ত লাগ্‌লো। তবু ক্যাটালগ্‌খানা সে যথাস্থানে রেখে চিঠি-পত্র বাক্সয় তুলে রাখ্‌লো। ঘণ্টাখানেক পরেই incubator-এর কথা তা'র মন থেকে একেবারে মুছে গেলো।

কিন্তু সপ্তাহখানেক পর আর এক চিঠি এসে উপস্থিত। 'Dear Sir, As we presume, you are too busy to reply to our last letter of the...'

ব্যাপারটা—নেপু যদ্দুর বুঝ্‌তে পার্‌লো এই—বম্বের হেড্‌-অফিস থেকে বিশেষ করে' নেপুরই জন্য ('specially for you') সব রকমের ইন্‌কিউবেটর এক-একটি ক'রে কল্‌কাতায় আনানো হয়েছে; নেপু যদি তাঁ'দের অত নম্বর পার্ক ষ্ট্রীটের শো-রুমে দয়া করে' একবার পদার্পণ করে' সেগুলো দেখে আসে, তা হলে তা'রা অত্যন্ত আনন্দিত হয়। We shall have great pleasure in demonstrating to you the many new features that have been added…'। পরিশেষে লেখা যে, তাদের stock-এ দেড়-শো থেকে ছ'শো পঁচাত্তর পর্য্যন্ত দামের যন্ত্র আছে 'a wide range of selection—।' যে কোনোটি নেপুর পছন্দ হয়, এক সঙ্গে সামান্য কিছু দিয়ে নিয়ে যেতে পারে—বাকিটা ছোট মাসিক কিস্তিতে দিলেই চল্‌বে। এমন সুবিধে আর হয় না—নেপু কবে আস্‌বে, সেই অপেক্ষায় তা'রা বসে' আছে।

নেপু চিঠিখানা রেখে দিয়ে তাড়াতাড়ি নাইতে চলে' গেলো; তা'র স্কুলের সময় হ'য়ে গিয়েছিলো।

আরও সপ্তাহখানেক কাট্‌লো। তারপর আর এক চিঠি এসে উপস্থিত।

'Dear Sir, In continuation of our last letter dated…, we suppose it would not suit your convenience to visit our show rooms, So we...

নেপুর হয় তো তা'দের শো-রুমে যাবার সুবিধে হ'বে না। তাই যদি নেপুর আপত্তি না থাকে, নেপুর নির্দ্দিষ্ট দিনে ও সময়ে তা'দের এজেন্ট তা'র বাড়ীতে 'কল' করতে পারে; নেপু যদি অনুমতি দেয়, এজেন্ট তা'দের নতুন ধরণের ইন্‌কিউবেটরের সব সুবিধে তা'কে ভালো-মত বুঝিয়ে দিতে পারে; তখন যদি সে একটা কিন্‌তে ইচ্ছে করে, অর্ডার-ফর্ম সই করে' এজেন্টের হাতে দিয়ে দিলেই চল্‌বে; দর-দস্তুর সম্বন্ধে নেপু চাইলে আরো সুবিধে করা যায়—না হয়

এখন সে একেবারেই কিছু না দিলো; সমস্ত টাকাটাই মাসিক কিস্তিতে নিতে তা'রা রাজি আছে। 'Awaiting the favour of your reply, Yours very faithfully…'.

চিঠির পর চিঠি আস্ছেই। ভারি মজা তো!—কিন্তু ক্যাটালগ্‌টা ওরা আরো ভালো করে' ছাপ্‌তে পারলো না?

কয়েকদিন পর এক সকালবেলায় নেপু একটা এক্‌স্ট্রা (Extra) কষ্‌বার চেষ্টায় গলদ্‌-ঘর্ম্ম হচ্ছে। কিছুতেই হচ্ছে না—নেপু চটে' গিয়ে কাগজ পেন্সিল রেখে দিয়ে তা'দের দোতলার সরু বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো। দেখ্‌লো, প্রকাণ্ড ঝক্‌ঝকে একখানা মোটর গাড়ি অনেক কষ্টে তা'দের গলিতে ঢুকছে। মস্ত গাড়ি—তা'দের গলি একেবারে ভরে' গেছে। খুব আস্তে চল্‌ছে গাড়িখানা—ড্রাইভার দু'দিকের বাড়ীর গায়ে তাকাচ্ছে। নেপু একটু অবাক্ হ'ল—এত বড় গাড়ি এ-গলির কোন্ বাড়ীতে আস্‌তে পারে? এ কী—গাড়িটা যে তা'দের দরজাতেই থাম্‌লো। নেপুর মন লাফ দিয়ে উঠলো—কে না জানি এসেছে। গাড়ি থেকে নাম্‌লো এক—এক সাহেব, লম্বা, ছিপ্‌ছিপে, সুন্দর চেহারা, সুন্দর তা'র পোষাক। সাহেব তা'দের বাড়ীতে—কেন সাহেব আস্‌বে? হঠাৎ তা'র মুখ একেবারে শুকিয়ে গেল! ইন্‌কিউবেটর—বম্বে—পার্ক ষ্ট্রীট—এজেণ্ট—এমনি কতগুলো অসংলগ্ন কথা তা'র মনের মধ্যে খেলে গেলো। সে আর দেরী কর্‌লো না। ঘরের ভেতর গিয়ে একটা পাঞ্জাবি গায়ে ফেলে আস্তে আস্তে খিড়কির দোর দিয়ে সে বেরিয়ে গেলো।

নেপুর বাবা ভবানীপুর পোষ্টাপিসে কেরাণীগিরি করেন—পঁচাত্তর টাকা মাইনে পান। সে সময়ে তিনি খাটো একটা কাপড় লুঙ্গির মত ক'রে জড়িয়ে সারা গায়ে তেল মেখে স্নান কর্‌তে যাচ্ছিলেন। নেপুর ছোট ভাই এসে যখন বল্‌লে, 'বাবা, একজন সাহেব এসেছে—দেখ্‌বে'সো' তিনি ছেলেকে ধম্‌কে দিলেন, 'যা—যা, তোর এখন ফাজলেমি কর্‌তে হবে না।' কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই নেপুর মা এসে রুদ্ধস্বরে বল্‌লেন, 'ওগো—সত্যি, ঘরের ভেতর একটা সায়েব এসে ঢুকেছে, না জানি, কী মৎলব নিয়ে এসেছে—নিশ্চয়ই পুলিশের লোক—হয় তো আমার নেপুকে ধরে' নিয়ে যাবে গো—তুমি শীগ্‌গির যাও, গ্যাখো লোকটা কী চায়।'

নেপুর বাবা অগত্যা হাত থেকে ঘটি নামিয়ে সেই অবস্থাতেই বাইরের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। সত্যি—জলজ্যান্ত এক সাহেব দাঁড়ানো, ঝক্‌ঝকে, ফিট্‌ফাট্, বাইরে মস্ত ঝক্‌ঝকে গাড়ি।

সায়েব বল্‌লে, 'বাবুকো বোলাও।

নেপুর বাবা বল্‌লেন, 'I am the Babu, Sir' সায়েব একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে গেলো। তবু চট্‌ ক'রে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে মুখে অমায়িক হাসি এনে বল্‌লে, 'Oh, I'm very sorry, Good morning.'


সাহেব বল্‌লে 'বাবুকো বোলাও।'

নেপুর বাবা ক্ষীণস্বরে 'গুড্‌মর্ণিং বল্‌লেন। তিনি ভাবলেন সায়েবকে বস্‌তে বলা উচিত; কিন্তু ঘরের এক কোনে একটা ভাঙা তক্তাপোষ আর তা'র পাশে আরো ভাঙা, ছেঁড়া ঢাকবার জন্য পীস্‌বোর্ডের টুক্‌রো-পাতা একটা চেয়ার কী ক'রেই বা সায়েবকে বস্‌তে বলা যায়?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা-বার্ত্তা হ'তে লাগ্‌লো। মিষ্টার রয়ের বেশ ও ঘরের অবস্থা দেখে সায়েবের বুকও একটু দমে গেলো; তবু তিনি অত্যন্ত ভদ্রভাবে আলাপ আরম্ভ কর্‌লেন।

মিঃ রয় দয়া করে' তাদের নতুন ধরণের ইন্‌কিউবেটর সম্বন্ধে খোঁজ নিয়ে ছিলেন—হয় তো তিনি একটা কেন্‌বার কথা ভাব্‌ছেন; তাই Indo English Trading Co.-র প্রতিনিধি সে এসেছে; হয়-তো মিঃ রয়ের কোনো কাজে সে লাগ্‌তে পারে।

নেপুর বাবা ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে' তাকিয়ে বিড় বিড়: করে বল্‌তে লাগ্‌লেন, 'Incubator? Incubator?'

—হ্যাঁ, Incubator? তিনি দয়া করে' খোঁজ নিয়েছিলেন বলে' অনেক ধন্যবাদ; এ ধরণের ইন্‌কিউবেটর ভারতবর্ষে এই প্রথম, কোম্পানি তাঁ'র কাছ থেকেই

প্রথম অনুসন্ধান পত্র পেয়েছে ; তিনি যদি একটা ব্যবহার করে' দেখেন, তাহ'লে আশ্চর্য্য রকম ফল পাবেন, এ-আশ্বাস সায়েব তাঁ'কে দিতে পারে।

নেপুর বাবা একেবারে অথই জলে পড়্লেন ; অস্পষ্ট ভাবে কী যে তিনি বল্‌লেন, সায়েব বুঝ্‌তেই পার্‌লো না।

হঠাৎ তাঁ'র মুখের দিকে তাকিয়ে সায়েবের কী রকম যেন সন্দেহ হ'ল। সে জিজ্ঞেস কর্‌লো, 'আমি কি মিঃ এন. এম. রয়ের সঙ্গে কথা বল্‌ছি ?'

নেপুর বাবার মুখ দিয়ে এতক্ষণে কথা ফুট্‌লো, 'না—আমার নাম পি, এন, রয়!' 'এন্. এম্. রয় বলে' এ-বাড়ীতে কেউ থাকে ?'

'এন্. এম. রয়—এন্. এম. রয়—ও, হ্যাঁ—নেপু! নেপু।' নেপুর কথা মনে পড়্‌বার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমস্ত ব্যাপারটা আঁচ্ ক'রে নিলেন। ঐ হতচ্ছাড়া ছেলের কাণ্ড এ-সব। কতদিন পঁই পঁই করে' বলেছি—আন্দাজে যে সে জায়গায় ক্যাটালগ্ চেয়ে পাঠাস্‌নি—তা কে কা'র কথা শোনে ? এবার সাম্‌লাও ঠ্যালা।

মুখে তিনি বল্‌লেন, 'হ্যাঁ ; এন্. এম্. রয় আমার ছেলে।'

'O' Sorry to have troubled you. May I not see him ?'

নেপুর বাবা বলে' দিলেন, 'সে বাড়ি নেই!'

সায়েব একটুখানি ইতস্তত করে' বল্‌লে, 'Right. Sorry to have taken up your time. Good morning.'

রাগে কাঁপ্‌তে-কাঁপ্‌তে নেপুর বাবা বাড়ীর ভেতর ফিরে' এলেন। 'কোথায় তোমার সেই হতভাগা, বয়াটে, ফাজিল ছেলে—বা'র করো তা'কে।'

নেপুর মা কাঁদো-কাঁদো স্বরে বল্‌লেন, 'ওগো কী হয়েছে, তাই বলো না ? কেন এসেছিলো সায়েব ? পুলিশের লোক নয় তো ?'

সবার ছোট ছেলেটা বলে' উঠ্‌লো, 'বাবা, সায়েবকে আস্‌তে দেখেই নেপু বাড়ী থেকে বেড়িয়ে গেছে —আমি দেখেছিলাম।'

'ও ফিরে এলে ওকে খেতে দিয়ো না।' রাগে এর বেশী নেপুর বাবা কিছু বল্‌তে পার্‌লেন না।

তার পরেও অনেক দিন নেপু ভয়ে-ভয়ে কাটিয়েছে—কখন্ আবার গাড়ি নিয়ে সায়েব এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু ক্রমে একমাস কেটে গেলো—সায়েব আর এলো না, না কোম্পানি থেকে আর একখানা চিঠি। নেপু হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌লো। সে প্রতিজ্ঞা করে' ছিলো, এ-বিপদ্ উৎরোলে আর কখনো ক্যাটালগের জন্য চিঠি লিখ্‌বে না। আর লেখেও নি।

—শ্রীবুদ্ধদেব বসু

মান বড়, না প্রাণ বড়?

গোণ্ডোয়ানা একটি ছোট্ট দেশ। ভারতবর্ষের মাঝখানে একটি পর্ব্বতশ্রেণী আছে, নাম তার বিন্ধ্যাচল। এই পাহাড়ের কোলেই মধ্যপ্রদেশ। ইহারই উত্তর-পূর্ব্ব অংশে গোণ্ডোয়ানা রাজ্য।

সাড়ে চারশো বছর আগে এক রাজপুত-রাণী এইখানে রাজত্ব করিতেন। নাম তাঁর দুর্গাবতী। রাজপুতেরা যোদ্ধার জাত। যত-বড় বীর, আর যত-বড় রাজা-বাদশাই হোন না কেন, যুদ্ধ করিতে আসিলে তখনই রাজপুতেরা বুক ঠুকিয়া সাম্‌নে আসিয়া খাড়া হইত—প্রাণের ভয়ে পেছন ফিরিত না। শুধু যে পুরুষেরাই লড়াই করিতে জানিত, যুদ্ধবিদ্যা শিখিত,—আর মেয়েরা কুটনা-কোটা, বাটনা-বাটা লইয়াই থাকিত, তা নয়—তাহারাও অনেকে পুরুষের সঙ্গে সমানে সমানে যুদ্ধ চালাইতে পারিত। রাণী দুর্গাবতীও তেম্‌নি এক রাজপুত-মেয়ে। শোনা যায়, তাঁর তীরের তাক্ একটুও এদিক্-ওদিক্ হইত না; যেখানটায় তাক্ করিয়া তীর ছুঁড়িতেন, তীর গিয়া ঠিক সেইখানে বিঁধিত। এমনি করিয়া তিনি কত বাঘ, কত শূয়োর, আর কত যে হরিণ মারিয়াছেন, তার ঠিক নাই।

আগে অবশ্য রাজা দলপৎই দেশ-শাসন করিতেন। তাঁর মৃত্যুর পর পাঁচ বছরের ছেলে বীরনারায়ণের আর রাজ্যের ভার রাণীর উপর পড়িল। এই ছেলে আর স্বামীর রাজ্য, দুই-ই তাঁর কাছে সমান আদরের জিনিষ। আর অধর নামে একটি পুরানো আমলাকেও তিনি খুব ভালবাসিতেন। লোকটি জাতিতে কায়স্থ, খুব বিশ্বাসী, আর বুদ্ধিমান্। তিনিই ছিলেন—রাণীর সকল কাজে ডান হাত।

রাণী স্নেহে যত্নে ছেলেকে মানুষ করিয়া তুলিতে লাগিলেন; সুশাসনে আর সুব্যবস্থায় দেশের যতদূর সম্ভব উন্নতি করিলেন।

সত্তর হাজার গ্রাম লইয়া রাণীর এই রাজ্য। তাঁর হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া গিজ্‌গিজ্ করে। লড়াইয়ের হাতীই হাজারখানেক, লড়াইয়ের ঘোড়াও বিশ হাজারের কম নয়। ঘরে ধনদৌলৎ, জিনিষপত্রও তেমনি। এমন সোনার রাজ্য আর রাজধানীর উপর লোভ না হয় কা'র? ভাঙিয়া-চুরিয়া লুঠিয়া লইতে পারিলে যে পোয়াবারো।

মালব-রাজ্যটা গোণ্ডায়ানা-রাজ্যের পাশেই। রাণীর রাজ্যের উপর মালবের রাজা বাজ্-বাহাদুরের যেমন লোভ, তেম্‌নি হিংসা। খুব জাঁক করিয়া তিনি লড়াই বাধাইলেন। আশপাশের মীয়ানা আফগানেরাও কোমর বাঁধিয়া যুদ্ধে নামিল।

কিন্তু রাণীর তীরের মুখে কেহই দাঁড়াইতে পারিল না ;—প্রাণ লইয়া পলাইল। শুধু একবার নয়, অনেকবার এমন হইয়াছে।

তখন আকবর বাদশার আমল। যেখানে যত স্বাধীন রাজ্য ছিল, সব দখল করিয়া গোটা ভারতেই বে-পরোয়া মোগল-শাসন চালাইবেন, ইহাই তাঁহার মতলব। তাই যেখানে যত ভাল লোক পাইয়াছেন,—কি হিন্দু, কি মুসলমান সব হাত করিয়াছেন। তাদের কেহ উজীর, কেহ নাজির, কেহ সেনাপতি, কেহ কোটাল। রাজ্যের কোনোদিকে ব্যবস্থার কসুর নাই। সেনা আর সেনাপতিরা যে নাকে তেল দিয়া ঘুমাইবেন, আর মাসের মাস মাহিনা লইবেন, সেটি হইবার জো নাই। মাহিনা লও, যুদ্ধ করো। 'যুদ্ধ না করিলে, বসিয়া বসিয়া ঝিমাইলে, আশপাশের রাজারা তলোয়ারের খোঁচায় কুঁড়েমির ঘোর ছুটাইয়া দিবে'—ইহাই ছিল তাঁর বুলি। কাজেই বাদশার সেনা-সামন্তকে সকল সময় যুদ্ধের জন্য তৈরী হইয়া থাকিতে হইত।

কিছুদিনের মধ্যেই বাদশার সৈন্যেরা এদেশ-সেদেশ জয় করিয়া মালবের সৈন্যের সঙ্গে লড়াই বাধাইল। মালব কতটুকুই বা রাজ্য, আর তার সৈন্যই বা কত! বাদশার সৈন্যেরা দেখিতে দেখিতে রাজাকে হারাইয়া দিয়া, তাঁর রাজ্যটি কাড়িয়া লইল, আর জয়ধ্বনিতে আকাশ কাঁপাইয়া তুলিল।

মালব আর গোণ্ডোয়ানা গায় গায় লাগাও। এ-রাজ্যে ওড়ে বাদশার নিশান, ও-রাজ্যে তার পাশেই ওড়ে রাণীর নিশান—স্বাধীন রাজ্যের নিশানা! বাদশার এলাকার পাশে গোণ্ডোয়ানা রাজ্য তো সাগরে শিশির-বিন্দু ; সে আলাদা হইয়া, বাদশার রাজ্যের তোয়াক্কা না রাখিয়া, ঘাড় উঁচু করিয়া থাকিবে, এও কি সহ্য করা যায়? বাদশার সেনাপতি আসফ খাঁ রাগের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি কাঁচা লোক ন'ন ; রাণীর বীরত্বের কথা তাঁর বেশ ভাল রকমই জানা-শোনা ছিল ; তাই ফস্ করিয়া রাজধানীর দিকে হাত বাড়াইলেন না। প্রথমে জুলুম আরম্ভ করিলেন, রাজ্যের সীমানার দিকে। সেখানকার লোকেরা লুটপাট আর অত্যাচারের জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিল! এই অঞ্চলেই রাণীর বেশীর ভাগ সৈন্যের বাস। তাহারা মোগলদের হাত হইতে পুঁজিপাটা আর স্ত্রী-পুত্রদের মান-ইজ্জৎ বাঁচাইবার জন্য, যেখানে পারিল ছুটিয়া পলাইল। এইরূপে কাজ অনেকটা হাল্‌কা হইলে আসফ খাঁ রাণীর দরজার গোড়ায় আসিয়া খুব জোরে ডঙ্কা মারিলেন।

রাণী দুর্গাবতী রাগে ফুলিয়া উঠিলেন। তিনি ভয় পাইবার মেয়ে ন'ন ; তাঁর বাপের নাম শালিবাহন—কুলে-মানে যিনি পাহাড়ের সমান উঁচু। স্বামী তাঁর বীর ; তাঁর মৃত্যুর পর, এই রাজ্যটাকে রাণী যকের ধনের মত আগ্‌লাইয়া বসিয়া আছেন—

এক হাতে তীর-ধনুক আর এক হাতে দণ্ড। স্বামীর জন্য চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়াছে, শোকে প্রাণ হুহু করিয়াছে, কিন্তু তিনি কাঁদিতেও পারেন নাই, শোক করিতেও পারেন নাই—চোখের জল চোখে শুকাইয়াছে, প্রাণের শোক প্রাণে মিলাইয়াছে, তাঁহাকে রাজ্যের দিকে ফিরিয়া চাহিতে হইয়াছে। প্রাণের চেয়ে বড় এই রাজ্য, তার উপর জুলুম, আবার দরজার গোড়ায় আসিয়া ডঙ্কা! ধিক্ দুর্গাবতীর জীবনে, ধিক্ তাঁর তীর-ধনুকে আর শত ধিক্ তাঁর রাজত্বে! রাণী যুদ্ধের জন্য অস্থির হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু অধর লোকটা ভারি ঠাণ্ডা মেজাজের; তাঁর রাজ্যের উপর যেমন মায়া, রাণীর উপরও তেম্‌নি। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, কাজটা মোটেই ভাল হইতেছে না। তীর-ধনুকে রাণীর হাত যত সাফাই হোক না কেন, কোথায় বা দিল্লীর বাদশা, আর কোথায় বা গোণ্ডোয়ানার রাণী—আসমান্-জমিন্ তফাৎ বলিলেই হয়। বাদশার সঙ্গে লড়াইও যা, আর তাঁর লোকের সঙ্গে লড়াইও তা। আসফ খাঁর যদি একটা লোক মরে, তখনই দশটা লোক আসিয়া তার জায়গায় খাড়া হইবে। তাঁর কি লোকের অভাব আছে, না অস্ত্রের অভাব আছে? অধর রাণীর কাছে আসিয়া হাতজোড় করিয়া বলিলেন,—"মা, যুদ্ধে কাজ নাই, রফা করো। আসফ খাঁর সঙ্গে লড়িতে হইলে অনেক সৈন্য, অনেক কাঠ-খড় চাই; কিন্তু তোমার সে-সব কই? মোগলের ভয়ে সৈন্যেরা মুলুক ছাড়িয়া পলাইয়াছে। কুড়াইয়া-বাড়াইয়া বড় জোর পাঁচশো সৈন্য তুমি পাইতে পার। এত কম সৈন্য লইয়া আসফ খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করা চলে কি? যদি হুকুম করো, খাঁ-সাহেবকে বলিয়া-কহিয়া আপোষ—"

রাণী আগুনের মত দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন,—"আপোষ! কা'র সঙ্গে! —আসফের সঙ্গে! খোদ বাদশার সঙ্গে হইলেও না হয় কথা ছিল! কোথাকার কে একজন ক্ষুদে সেনাপতি! আর সেনাপতিই বা কে বলে তাকে—ডাকাতের সর্দ্দার, দুর্ব্বলের উপর জুলুম করাই যার কাজ, তার সঙ্গে আপোষ! অধর, নিশ্চয় তোমার মাথা খারাপ হইয়াছে!"

অধর দেখিলেন, কিছুতেই কিছু হইবার নয়, একটি সৈন্য না পাইলেও রাণী যুদ্ধ করিবেন। এ যুদ্ধের যে কি ফল হইবে, তাহাই ভাবিয়া তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

রাণী দুর্গাবতীও অবুঝ মেয়ে ন'ন; মোগলের লোক-বলের বিপক্ষে দাঁড়ানো যে কি বিপদের কথা, তাহা তিনি বেশ জানিতেন। কিন্তু মান, আর দেশের স্বাধীনতাই ছিল তাঁর কাছে সকলের বড়। আসফের সঙ্গে আপোষ করার মানে,—তার কাছে

খাটো হওয়া, আর মোগলের শাসন মানিয়া লওয়া। দুর্গাবতীর পক্ষে তা একেবারেই অসম্ভব

উপস্থিত-মত হাজার-দুই সৈন্য পাওয়া গেল। রাণী ইহাদের লইয়াই যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ; কিন্তু কর্ম্মচারীরা অনেক করিয়া বুঝাইল যে, আরও সৈন্য পাওয়া যাইতে পারে ; যতদিন না পাওয়া যায়, নর্হীতে গিয়া থাকাই ভাল। নর্হী বন জঙ্গলে-ঘেরা একটা জায়গা, তার দুই পাশে খাড়া পাহাড়। রাণী কর্ম্মচারীদের কথায় অমত করিলেন না।

খবর পাইয়া মোগলরাও 'দিন্ দিন্' শব্দে হল্লা করিতে করিতে সেই দিকে ছুটিল। নর্হীতে রাণীর আরও কিছু সৈন্য বাড়িল। তিনি সৈন্যদের ডাকিয়া বলিলেন,—"দেশের জন্য প্রাণ দিতে হইবে বলিয়া আমি তোমাদের ডাকিয়াছি ; যাহাদের প্রাণের ভয় আছে, তাহারা এই বেলা সরিয়া পড়, আমি শত্রুর ভয়ে এমন করিয়া আর চোরের মত লুকাইয়া থাকিতে পারিব না। যুদ্ধ করিব, কত জন যুদ্ধে প্রাণ দিতে পারিবে, বলো ?"

একসঙ্গে পাঁচ হাজার সৈন্য গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, "প্রাণ দিব—সবাই আমরা দেশের জন্য প্রাণ দিব—জয় মা দুর্গাবতীর।" সেই গর্জ্জনে নির্জ্জীব পাহাড়গুলোও যেন সজীব হইয়া গম্ভীর আওয়াজ দিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দুই দলে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল।

পরদিন রাণীর কাছে খবর আসিল, বড় ভয়ের কথা—মোগলরা অনেক চেষ্টার পর পাহাড়ের মুখটা দখল করিয়াছে। রাণী সৈন্যদের ভরসা দিয়া বলিলেন,—"কোনো ভয় নাই ; দেখ না, এখনই আমি উহাদের কি দশা করি"—বলিয়া তিনি নিজে যুদ্ধের জন্য তৈরী হইলেন, আর এম্নি কৌশলে সৈন্য চালাইলেন যে, মোগলের বেশীর ভাগ সৈন্যই পাহাড়ের পথে ঢুকিয়া প্রাণ হারাইল ; বাদবাকি সৈন্যেরা কোনোরূপে পলাইয়া বাঁচিল। রাণীর সৈন্যদের তখন ভারি স্ফূর্ত্তি, তাহারা রাণীর নামের জয়ধ্বনি দিয়া পাহাড় কাঁপাইতে লাগিল। রাণীর মুখে কিন্তু তেমন খুশীর ভাব দেখা গেল না ; তিনি বলিলেন,—শত্রু হারিয়াছে সত্য, তবে এই হারই তাহাদের শেষ হার নয়। তাহাদের অনেক সৈন্য এখনও বাঁচিয়া আছে, তাহারা এদিক্-ওদিক্ হইতে আরও সৈন্য আনিয়া দল ভারী করিবে। তারপর আবার লড়াই। যদি শত্রুর হাত হইতে বাঁচিতে চাও, তাহা হইলে এস, এখনই আমরা উহাদের পিছন-পিছন ছুটি,—ফের যুদ্ধের জন্য তৈরী হইবার আগেই উহাদের সব ক'টাকে সাবাড় করি।"

সৈন্যেরা সব চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যুদ্ধ করিয়া তাহারা বড় হায়রান হইয়াছে, তাহাদের এখন আর যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা নাই। রাণী মনের ভাব বুঝিয়া যুদ্ধের স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। যে-সব সৈন্য জখম হইয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল, তাহাদের সেবা করিতে লাগিলেন, আর যাহারা মারা গিয়াছে, তাহাদের আত্মীয়স্বজনকে সান্ত্বনা দিলেন। সারারাত এমনি করিয়া কাটিল।

দুর্গাবতী যে-ভয় করিয়াছিলেন, তাহা ফলিতে বড় বেশী দেরী হইল না। ভোরে পাখীর ডাকে সৈন্যদের ঘুম ভাঙিল না, ভাঙিল—মোগলের কামানের ডাকে। আসফ খাঁ বাদশার সেনাপতি, কত বড়-বড় যুদ্ধে জয়ী হইয়া তিনি দরবারে মান পাইয়াছেন; একজন স্ত্রীলোকের কাছে হার! এ অপমান কি তিনি সহ্য করিতে পারেন? দলে ভারী হইয়া, ভাল ভাল অস্ত্রশস্ত্র লইয়া, ভোর হইবার আগেই তিনি পাহাড়ের মুখে আসিয়া কামান দাগিলেন—গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্।

যুদ্ধ—আবার যুদ্ধ। আবার সে তীরের শন্‌শন্‌, গুলির বন্‌বন্‌, তলোয়ারের ঝন্‌ঝন্‌, আর থাকিয়া থাকিয়া কামানের গর্জ্জন! কাটাকাটি, মারামারি, লাফালাফিতে পাহাড়ে দেশটা যেন ওলট্‌পালট্‌ হইতে লাগিল।

এত যে তীর, এত যে গুলির বৃষ্টি—রাণীর কোনো দিকেই খেয়াল নাই; হাতীতে চড়িয়া নির্ভাবনায় যুদ্ধ করিতেছেন। ডঙ্কা বাজিতেছে, আর তালে তালে হাতী নাচিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে রাণীর পিঠে তূণ উঠিতেছে পড়িতেছে, বেণী দুলিতেছে, মাথার মুকুটে মণি ঝল্‌কাইতেছে। তাঁহার ধনুক হইতে যে তীর-বৃষ্টি হইতেছে সে যেন আগুনবৃষ্টি। যেদিকে তাহা পড়িতেছে, সে-দিকে কেবল 'সামাল সামাল' রব।



"দেখ না, এখনই আমি উহাদের কি দশা করি"—১৩৩ পৃষ্ঠা

আজ যে শুধু রাণীই যুদ্ধে আসিয়াছেন, তা নয়—পুত্র বীরনারায়ণও আসিয়াছে। যেমন মা, তেম্‌নি ছেলে। সে যেদিকে হানা দেয়, সেদিকে যেন একটা বিষম ঝড় ওঠে। মোগলরা মরিয়া হইয়া তাহাকে মারিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। একে একে দুইবার বীরনারায়ণ তাহাদের ধাক্কা সাম্‌লাইল। তিনবারের বার আর পারিয়া উঠিল না—জখম হইল। ইহাতে বিপক্ষের খুব সুবিধা হইয়া গেল। যাহারা বীরনারায়ণের সঙ্গ থাকিয়া লড়াই করিতেছিল, তাহাদের অনেকেই ভয় পাইয়া পলাইল। রাণীর পক্ষে তখন মোটে শ-তিনেক সৈন্য। তিনি ছেলেকে যুদ্ধস্থল হইতে সরাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিয়া, এই অল্প সৈন্য লইয়াই মোগলের সঙ্গে যুঝিতে লাগিলেন। আর জয়ের কোনো আশা নাই, এখন তো শুধু মরিবার জন্যই যুদ্ধ। রাণী ভাবিলেন, যখন মরিতেই হইবে,—অম্‌নি কেন মরি ? যত পারি শত্রু মারিয়া তবে মরি। অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়াছেন, তীর আর গুলি বিঁধিয়া নানাস্থান হইতে রক্ত ঝরিতেছে, রাণী ভুলিয়াও দেখিতেছেন না। এবার আর তীর-ধনুক নয়, এক প্রকাণ্ড বর্শা ডানহাতে শক্ত করিয়া ধরিয়া তিনি মোগল-সৈন্যের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। বর্শার আঘাতে অনেকে মরিল, অনেকে জখম হইল। মোগলের পক্ষে সাম্‌না-সাম্‌নি যুদ্ধ চালানো শক্ত হইয়া উঠিল। দূর হইতে বাছাবাছা তীরন্দাজ রাণীকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িতে লাগিল। একটা তীর শোঁ করিয়া আসিয়া তাঁহার কপালে বিঁধিল, তিনি সেটি টানিয়া বাহির করিলেন। চোখে কিছুই দেখিবার উপায় নাই, ক্ষতস্থান হইতে ফিন্‌কি দিয়া রক্ত ছুটিতেছে। সে রক্তে চোখমুখ ভাসিয়া যাইতেছে, পোষাক-আসাক সব লালে লাল। চোখের রক্ত মুছিতে না মুছিতে আর একটা তীর আসিয়া তাঁহার গলায় পড়িল। রাণী আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না—অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন।

জ্ঞান হইলে রাণী দেখিলেন, মোগল-সেনা সাগরের ঢেউয়ের মত নাচিতেছে, ফুলিতেছে, গর্জ্জাইতেছে। বর্শাটা খাড়া করিয়া ধরিয়া একবার উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন,—পারিলেন না। শরীরে কিছুমাত্র বল নাই, রক্তপাতে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। তবে এখন উপায় ? মোগলরা যে এখনই তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিবে, আর শিকল দিয়া বাঁধিয়া লইয়া যাইবে ! রাণী বড় হতাশ হইয়া অধরের দিকে চাহিলেন। সুখেই বলো, দুঃখেই বলো, যুদ্ধেই বলো আর শান্তিতেই বলো, অধর তাঁহার পায়ের কাছে গরুড় পক্ষীটির মত বসিয়া আছেন—যেন তাঁহার সাত জন্মের নিমকের দায়। কিন্তু অধর আজ শুধু চুপ করিয়া বসিয়া নাই,—মাহুত হইয়া হাতী চালাইতেছেন। মোগলের

গোলাগুলি, তীর-বর্শার মধ্য দিয়া এমন কৌশলে হাতী চালাইতেছেন যে, রাণীকে কেহ ধরিতে-ছুঁইতেও পারিতেছে না।

রাণীর জ্ঞান হইয়াছে দেখিয়া অধর খুব খুশী হইলেন। তাঁহাকে তিনি আর এ-অবস্থায় যুদ্ধস্থলে রাখিতে চান না—দূরে লইয়া গিয়া সেবা-শুশ্রূষা করিয়া বাঁচাইতে চান। কিন্তু হুকুম না পাইলে তো যাইবার উপায় নাই; কহিলেন,—"মা, এখন আর এখানে থাকিয়া কি হইবে? হুকুম করো, তোমাকে এখান হইতে সরাইয়া লইয়া যাই।"

রাণীর কানে একটি কথাও ঢুকিল না, বলিলেন,—"বাবা, আমার একটা কাজ তোমাকে করিতেই হইবে। তোমাকে আমি বড় স্নেহে, বড় যত্নে মানুষ করিয়াছি। মানুষ আশাতেই সব করে। আমার মনে কি আশা ছিল, জানো?—একদিন না একদিন দরকার হইবে, আর তোমার কাছে আমি একটা বড় কাজ পাইব। আজ আমার সেই দিন!"

অধর হুকুম পাইলে কি না-করিতে পারেন? বলিলেন,—"হুকুম করো।"

অধরের কোমরে একখানা মস্ত বড় ছোরা ছিল। রাণী সেইটি দেখাইয়া বলিলেন,—"লক্ষ্মী বাপ আমার, ঐটি আমার বুকে বসাইয়া দাও। আমার মান বাঁচাও, নাম রাখো।"

রাণী মরিয়া মোগলের হাত হইতে রক্ষা পাইতে চান। কথা শুনিয়া অধরের গায় যেন কাঁটা দিয়া উঠিল। যিনি পেটে ধরেন, তিনি কি শুধু মা? আর কেউ ন'ন? তবে যিনি সারাজীবন বুকের স্নেহ দিয়া ক্ষুধায় আহার, অসুখে সেবা, শোক-দুঃখে সান্ত্বনা দিয়া মানুষ করেন, তিনি কি? তাঁরই বুকে ছোরা! অধর দাঁতে জিভ কাটিয়া বলিলেন,—"মাপ করো মা, আমি ও-কাজ কিছুতেই করিতে পারিব না। আর যার কথা বলিবে, তার বুকেই আমি ছোরা মারিতে পারিব; এমন কি, নিজের বুকেও আমি হাসিতে হাসিতে ছোরা বসাইতে পারি। কিন্তু তোমার বুকে!—না, সে আমি কিছুতেই পারিব না—মারিয়া ফেলিলেও না।"

রাণী হতাশ হইয়া বলিলেন,—"তবে মোগলরা আমাকে বাঁধিয়া লইয়া যায়, এই তোমার ইচ্ছা?"

অধর হাতীর মাথায় অঙ্কুশ মারিতে মারিতে কহিলেন,—"বাঁধা অম্‌নি মুখের কথা কি না! অধর বাঁচিয়া থাকিতে মোগল তো মোগল, যমেরও সাধ্য নাই, তার হাতীর দিকে এগোয়। ওদের বুকের ওপর দিয়ে হাতীসুদ্ধ তোমাকে আমি ঝড়ের বেগে উড়াইয়া লইয়া যাইব। শুধু তোমার হুকুমের অপেক্ষা।"

কথা শুনিয়া রাণী হাসিবেন কি কাঁদিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। এই অবুঝ লোকটা যে কেমন করিয়া তাঁহাকে বাঁচাইবে, কেবল সেই ভাবনা ভাবিয়াই সারা হইল, কিন্তু এতকাল সঙ্গে থাকিয়াও বুঝিতে পারিল না যে, যুদ্ধে হারিয়া পলাইয়া যাওয়ার চেয়ে রাজপুতের কাছে মৃত্যু হাজার গুণে ভাল! বলে কি না 'হুকুম করো, তোমাকে সরাইয়া লইয়া যাই!'

রাণী অবাক হইয়া কিছুক্ষণ অধরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর ফস্ করিয়া তাহার কোমর হইতে ছোরাখানা কাড়িয়া লইয়া, প্রাণপণ জোরে নিজের বুকে বসাইয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে সব শেষ হইয়া গেল। তিনি মোগলকে ফাঁকি দিয়া, আর অধরকে বোকা বানাইয়া, পৃথিবী হইতে বিদায় লইলেন।

এই যুদ্ধে মোগল যে জয়ী হইয়াছিল তাহা সত্য, কিন্তু রাণীর পরাজয়ের কাছে সে জয় যেন হার মানিয়া গেল। আসফের বাহাদুরীর কথা কেহ আমলেই আনিল না, কিন্তু রাণীর কথা ঘরে ঘরে। প্রজারা তো কাঁদিয়াই আকুল, সত্যিকারের মা মরিলে মানুষ যেমন করিয়া কাঁদে, তাহারাও ঠিক তেম্নি করিয়া কাঁদিল। আর কাঁদিল—ভারতের যেখানে যত স্বাধীন দেশ ছিল, তার লোকেরা; কেন না, তিনি যে দেশের জন্য, দেশের মুক্তির জন্য প্রাণ দিলেন!

—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম পাওয়া পদ্মফুল

বেশ মনে পড়ে সেই এক দিনের কথা—তখন বর্ষাকাল, ঘনঘোর বৃষ্টিতে রাস্তাঘাট কাদায় জলে একেবারে একাকার হয়ে গিয়েছিল। একটি জীর্ণ শীর্ণ ঘোড়ার গাড়ীতে করে বৃষ্টির ছাঁট থেকে কোন রকমে গা বাঁচিয়ে মাখনপুর ইস্কুলের ফটকে এসে নামলুম। সেই দিন থেকে আমার ইস্কুলের জীবনের আরম্ভ।

বোর্ডিংএর কোণের একটি ঘরে আমার থাকবার জায়গা হল। পশ্চিম দিকের জানলাটি খুলতেই দেখতে পেলুম রুণ্কী নদীর কাঁচের মতো জল ছোট্ট ছোট্ট ঢেউ তুলে নাচতে নাচতে ছুটে চলেছে, তার দুপাশে সব্জী ক্ষেতের সবুজ কোল মেঠো হাওয়ায় শিউরে শিউরে উঠছে; আর অন্য দিকে চোখে পড়ল ধূ ধূ মাঠ—সর্ব্বাঙ্গে গেরুয়া বসন জড়িয়ে মেঘলা আকাশের স্তব করছে স্তব্ধ হয়ে!

আশা-আশঙ্কার নানা দোলন মনকে তুলিয়ে তুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। ইস্কুলের ধরা-বাঁধা লেখা-পড়ার ধারা, বোর্ডিংএর আইন-কানুনের মধ্যে চলা ফেরা ওঠা বসা, অজানা অচেনা নতুন জায়গার নতুনতর আবহাওয়া, সব মিলে আমার কেমন লাগবে এই ভেবে বুক দুরু দুরু করে উঠছিল।

কিন্তু ভারি আনন্দ হচ্ছিল, আমার আশপাশের রাশি-রাশি নতুন পাওয়া বন্ধুগুলির কথা ভেবে। যখন ভাবছিলুম—আমারই মত একরাশ ছেলের মধ্যে আমার সমস্ত হাসি-কান্না কথা-বার্ত্তা কাজ-কর্ম্ম ছড়িয়ে দিতে পারবো, যখন ভাবছিলুম—আমার প্রতিদিনের জীবনের প্রত্যেকটি ছবি আমার সঙ্গীদের যাদুস্পর্শে রঙিন্ হয়ে উঠবে, তখন আনন্দ রাখবার যেন আর জায়গা পাচ্ছিলুম না।

সকাল বেলা ইস্কুলের ঘণ্টা ক্লাসে ডেকে নিয়ে গেল। ঘর-ভরা ছেলের মাঝখানে আমার ইস্কুল-জীবনের প্রথম পাতাটি খুলে ধরলুম। মাষ্টারমশাই তখনো ক্লাসে আসেন নি। পাঁচ ছ'টি ছেলে আমাকে ঘিরে বসল। তাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করলে—"তোমার নাম কি খোকা ?"

আমি বল্লুম—"জ্যোতিরিন্দ্র।"

ছেলেটি বল্লে—"জ্যোতিরিন্দ্র মানে কি খোকা ?"

আমি একটু সঙ্কুচিত হয়ে বল্লুম—"তা তো জানি নে ভাই।"

আমার চারপাশের সকলে এক সঙ্গে হো হো করে হেসে উঠলো। কেউ কেউ বল্লে—"নিজের নামের মানে নিজে জানো না তো জানো কি ?"

আমি ভারি অপ্রস্তুত হয়ে গেলুম। দোষটা শুধরোবার জন্যে তাড়াতাড়ি সাম্‌লে নিয়ে বল্লুম—"আমার ডাক-নাম বাহাদুর।"

আবার একটা হাসির ধূম! ইস্কুলের বন্ধুদের সম্বন্ধে যে রঙিন স্বপ্ন আমার মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে ছিল, এক মুহূর্ত্তে তা চূরমার হয়ে গেল!

আসবার সময় মা বলেছিলেন—"দেখিস বাহাদুর, নতুন নতুন বন্ধু পেয়ে ঘরের কোণের মা-টিকে ভুলে যাস নি যেন!" আমার তখন মনে হয়েছিল, হয়ত সঙ্গীদের সঙ্গে আনন্দে মেতে মা-কেও মাঝে মাঝে ভুলে যেতে পারি। কিন্তু এমন যে হবে, তা কে জানতো ? এদেরই বলে বন্ধু—যারা জানে খালি বিদ্রূপ করতে, ভালবাসার এক-কণাও যারা শেখে নি ? আমার অমন স্নেহময়ী মা—তাঁর কথা বার বার মনে পড়তে লাগল।

ছেলেরা আরও দুটো একটা কি কথা জিজ্ঞেস করলে, আমি তার জবাব না দিয়ে চুপটি করে বসে রইলুম। আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে অনেকেই হাসা-হাসি

করছিল, অনেকে নানা রকম ঠাট্টাও করতে ছাড়ছিল না। আমি কোন দিকে দৃক্‌পাত কর্ণপাত না করে গোঁ হয়ে বসেছিলুম। ভাবছিলুম—যেখানে প্রতিটি মুহূর্ত্ত আমার অসহ্য ঠেকছে, বছরের পর বছর সেখানে কাটাবো কেমন করে? মায়ের কাছে ফিরে না গেলে কিছুতেই আমি বাঁচতে পারব না।

পিছন থেকে কে একজন আমার পিঠে ছুঁচোলো পেন্সিলের খোঁচা দিলে। নীরবে সহ্য করে গেলুম। মুখ ফুটে কিছু বলতে সাহস হল না—পিছন ফিরে তাকাতেও ভারি লজ্জা করতে লাগল। পিঠের উপর আবার একটা খোঁচা, এবারে আরো জোরে—হয়ত আমাকে নীরব দেখে ওরা জোর করে কথা কওয়াতে চায়। কিন্তু কথা কইবার সাহস আমার কোথায়? ওদের সেই হাসির তীব্রতা তখনও আমার কানে বাজছিল। ওরা তবুও ছাড়লে না—পেন্সিলের খোঁচায় খোঁচায় আমার পিঠ জর্জ্জরিত হতে লাগল। আমার মুখ নীরব রইলো বটে কিন্তু এবারে চোখের জল আর সামলাতে পারলুম না।

চোখ দিয়ে আমার জল পড়ছে দেখে কে একটি ছেলে বল্লে—"দেখছো, ওকে কাঁদিয়ে তবে ছাড়লে।"

কে এ কথা বল্লে, তাকে দেখবার জন্যে পাশে একবার মুখ ফেরালুম, কিন্তু চোখের জলের ঝাপ্‌সা পর্দ্দার ভিতর দিয়ে ভাল করে দেখতে পেলুম না। মাষ্টারমশাই এসে ক্লাসে ঢুকলেন। সকলে উঠে দাঁড়াল। আমি তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফেল্লুম। এবারে সেই ছেলেটির দিকে ভাল করে তাকালুম। বেশ সুন্দর চেহারাটি, ছিপছিপে গড়ন, সমস্ত মুখের মধ্যে টানা টানা কালো চোখ দুটি সব চেয়ে চোখে পড়ে—আমারই দিকে ভুরু দুটি কুঁচকে তাকিয়ে ছিল; কেন জানি না, আমি বেশীক্ষণ তার চোখের দিকে চেয়ে থাকতে পারলুম না—চোখ নামিয়ে ফেল্লুম।

মাষ্টারমশাই পড়াতে লাগলেন। আমি সেদিকে কিছুতেই মন দিতে পারলুম না। মনে মনে ভাবছিলুম দেশের কথা—বাঁশের ঘের দেওয়া আমাদের ছোট্ট ঘরটি, আমার নিজের হাতে লাগানো টগর ফুলের গাছগুলি, আমার পোষা টিয়ে পাখীটি, এক-পা খোঁড়া নন্দন কুকুরটি—আমার মূক বন্ধু সব। নতুন নতুন বন্ধুর লোভে তাদের ছেড়ে চলে এসেছি—তাই কি আমার এমন শাস্তি হল? ভাবতে-ভাবতে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে সেই সুন্দর ছেলেটির দিকে চোখ পড়ে যাচ্ছিল, প্রায়ই দেখতে পাচ্ছিলুম—সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

যখন টিফিনের ঘণ্টা পড়লো, সব ছেলে একে একে ক্লাস ছেড়ে গেল। আমি নিজের জায়গাতেই চুপটি করে বসেছিলুম, হঠাৎ পিছন দিক্‌ থেকে কে এসে

আমার কাঁধের উপর আস্তে আস্তে একটি হাত রাখলে। ফিরে দেখলুম, এ সেই সুন্দর ছেলেটি।

সে বল্লে—"তোমার সঙ্গে ওরা বড় লাগছে, না ?"

আশ্চর্য্য! এমন মিষ্টি করে কথা বলতে পারে, এমন ছেলেও এদের মধ্যে আছে না কি ? আমি এমন অবাক্ হয়ে গেলুম যে, তার কথার জবাব দিতে পারলুম না।

সে আবার বল্লে—"নতুন ছেলে এলেই ওরা ঐ-রকম করে লাগে—ওই ওদের স্বভাব। তোমায় বড় কষ্ট দিয়েছে, না ?"

আমি বল্লুম—"তোমার নামটি কি ভাই ?"

সে বল্লে—"কমল।"

আমি বল্লুম—"তুমি যদি আমার বন্ধু হও, আমি ওদের দেওয়া কষ্ট সব ভুলে যাবো। হবে ভাই, কমল ?"

কমল বল্লে—"নিশ্চয়ই হব, সেই জন্যেই তো তোমার কাছে এলুম।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার মন রঙে রঙে রঙিন্ হয়ে উঠল। মনে হল, আমার ঐ একটি বন্ধু শত শত বন্ধুর জায়গা জুড়ে থাকবে। সবাই মিলে আমায় যত দুঃখ দিক, যত অত্যাচার করুক, ঐ একটি বন্ধু নিয়ে আমি সব দুঃখ ভুলে থাকবো। দুজনে মিলে খুব গল্প করতে লাগলুম। ইস্কুলের কথা, বোর্ডিংএর কথা, মাষ্টারদের কথা, তারপর এলো ছেলেদের কথা। কমল বল্লে—"ইস্কুলে থাকতে থাকতে ওদের সঙ্গে তোমার ভাব হয়ে যাবে। নতুন নতুন ছেলেদের সঙ্গে ওরা ঐ-রকম করে লাগে—তারপর সব ভুলে যায়।"

আমি বল্লুম—"তা হোক্—ওদের কাউকে আমি চাই না। খালি তোমার সঙ্গে থাকবে আমার ভাব, তার মধ্যে আর কাউকে ঢুকতে দেব না।" এমনি নানা কথায় টিফিন কেটে গেল।

কমলের বইগুলি নিয়ে এসে আমার পাশে তার বসবার জায়গা করে দিলুম। কমলকে আমার ভারি ভাল লাগছিল। মাষ্টারমশাই যখন পড়াচ্ছিলেন আমি চুপি চুপি কমলের সঙ্গে কথা কইছিলুম। মাষ্টারমশা'র কাছ থেকে বকুনি খাওয়া সত্ত্বেও আমি কমলকে ছেড়ে পড়ার দিকে মন দিতে পারছিলুম না। ক্লাসের ছেলেরা সকলেই আমার সঙ্গে কমলের এই বন্ধুত্ব লক্ষ্য করছিল। নতুন ছেলের পক্ষে এতখানি প্রশ্রয় পাওয়া তাদের সহ্য হচ্ছিল না, তাই কেউ কেউ ঠাট্টা করতেও ছাড়ছিল না। কেউ বলছিল—"কমলটার বুদ্ধি দেখেছিস—জংলী ছেলেটার পাশে গিয়ে বসেছে!"

সেদিন ইস্কুলের ছুটি হয়ে যেতে আমি আর কমল এক সঙ্গে হাত ধরাধরি করে

বোর্ডিংএ গেলুম। বোর্ডিংএর বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে দুজনে গল্প করছিলুম, এমন সময় তিন চারটি ছেলে এসে বল্লে—"দেখো, তোমাদের এই একলা একলা গল্প করা, এ আমরা সহ্য করতে পারব না।"

আমি বল্লুম—"বাঃ, আমাদের খুসী আমরা গল্প করব, তোমাদের তাতে কি?"

তারা বল্লে—"আমাদের সবার সঙ্গে সমান ভাবে তোমাদের মিশতে হবে।"

আমি বল্লুম—"বুঝেছি, আমাদের দুজনের এত ভাব দেখে তোমাদের বুঝি হিংসে হয়েছে?"

তারা বল্লে—"ঈস্, হিংসে বই কি! বোর্ডিংএর নিয়ম আছে, সব ছেলেকে সবার সঙ্গে মিশতে হবে, তোমরা সে নিয়ম ভঙ্গ করো কোন্ সাহসে?"

আমি বল্লুম—"আমি নতুন ছেলে, আমি অত নিয়ম-টিয়ম জানি না।"

তারা বল্লে—"তা সে যাই হোক্, তোমাদের আমরা একলা থাকতে দেবো না। এই আমরা এখানে বসলুম।" বলে তারা সবাই মিলে আমাদের চারপাশে ঘিরে বসল।

আমি বল্লুম—"এই একটু আগে তোমরা আমাকে জংলী বলছিলে, এখন পাশে বসতে লজ্জা করছে না?"

তারা বল্লে—"না, আমাদের লজ্জা নেই।"

আমি কমলকে বল্লুম—"চল ভাই, আমরা বোর্ডিংএর বাইরে যাই।"

ছেলেরা বল্লে—"আমরাও ছাড়ছি নে, চল না কোথায় যাবে, আমরাও যাচ্ছি। চল্লুম আমাদের দলবল ডেকে আনতে।"

ওরা দলবল ডেকে আনতে গেল দেখে, আমি কমলকে টেনে নিয়ে রুণ্‌কী নদীর দিকে চলে গেলুম। নদীর ধারে, ওদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে একটি নিরালা জায়গায় বসব ভাবছি, এমন সময় চোখে পড়ল—আমাদের ইস্কুলের নাম লেখা একটি ছোট্ট নৌকো নদীর চড়ায় বাঁধা রয়েছে। আমি বল্লুম—"ঠিক হয়েছে, চল ঐ নৌকোয় করে রুণ্‌কী নদীতে বেড়িয়ে আসি—ওরা এলেও আমাদের আর ধরতে পারবে না।"

দুজনে মিলে নৌকোটাকে জলে ঠেলে দিয়ে চড়ে বসলুম; আমি দাঁড় টানতে লাগলুম, কমল হাল ধরে বসল। খানিকটা দূরে গেছি, এমন সময় ছেলের দল হুড়মুড় করে নদীর চড়ায় এসে উপস্থিত হল। নদীর মাঝখানে আমাদের দেখতে পেয়ে ওদের হল রাগ, ওরা চেঁচিয়ে বল্লে—"আচ্ছা, পালাবে কোথায়? আমরা বুঝি আর ধরতে পারি না?"

আমি বল্লুম—"ধর না দেখি, কেমন পারো।" ওরা সবাই নদীর তীর ধরে একটা গাঁয়ের দিকে ছুট দিলে।

আমি কমলকে বল্লুম—"ওরা ঐ জেলেদের নৌকোটা নিয়ে আমাদের ধরতে আসবে, বুঝলি? দেখ্‌না, কি মজা হয়, অত বড় নৌকো নিয়ে ওরা আমাদের ধরতে পারবে ভাবছিস?" বলে আমি জোরে জোরে দাঁড় টানতে লাগলুম।

ছেলেরা গাছের গুঁড়িতে বাঁধা জেলেদের নৌকোটা খুলে সবাই মিলে চড়ে বসল। আমরা তখন খুব দ্রুত নৌকো বেয়ে চলেছি। ওরা সব ক'টা দাঁড় এক সঙ্গে ছপ্‌ছপ্‌ করে ফেলতে লাগল, কিন্তু অত করেও আমাদের কাছে পৌঁছতে পারলে না। তবু



আমি দাঁড় টানতে লাগলুম, কমল হাল ধরে বসল।

হার স্বীকার কোন মতেই ওরা করলে না। একটা নতুন ছেলে এসে নৌকো-বাওয়ায় হারিয়ে দিয়ে যাবে, এ-ও কি সওয়া যায়? ওরা দাঁড় টেনেই চল্লো, আমিও থামলুম না।

রূণ্‌কী নদীর স্রোত বেয়ে দুই নৌকোয় মিলে এমনি পাল্লা দেওয়া চলছিল অনেকক্ষণ ধরে। বর্ষাকালের আকাশ কখন্‌ যে ঘনঘটাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে হয়ত কেউই লক্ষ্য করে নি। একটা শিরশিরে হাওয়া উঠে যখন গা-টাকে কাঁপিয়ে দিলে, তখন আমার চমক্‌ ভাঙল। কমলকে বল্লুম—"কমল, এ যে ভীষণ বৃষ্টি আসছে দেখছি, আর তো এগোনো যায় না।"

কমল বল্লে—"চল্, তবে এবার ফেরা যাক্।"

আমি বল্লুম—"ওদের নৌকোকে পাশ কাটিয়ে আমি পালিয়ে যাব, তুই ঠিক করে হালটা ধরে থাকিস।"

কমল বল্লে—"কিন্তু এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে নদীর উপর থাকাটা ঠিক হবে না, ভাই।"

আমি বল্লুম—"ভয় কি? আমাদের ফেরবার মুখেই বাতাস বইছে, নদীর স্রোতও সেই দিকে, নৌকো তীরবেগে চলবে, এখুনি বোর্ডিংএ পৌঁছে যাব, দেখ্‌না।" বলে নদীর ঢেউএর তালে আমি দাঁড় টানতে লাগলুম।

দেখতে দেখতে ধূলো উড়িয়ে ঝড় এসে পড়ল। ঝড়ের বেগে আমাদের নৌকোর গতি আরো বেড়ে গেল। আমরা প্রায় ওদের বড় নৌকোর কাছে এসে পড়লুম। ওরাও ঝড় দেখে তখন নৌকো ফিরিয়েছে। কিন্তু ঝড়ের বেগ আরো বেড়ে উঠল। ধূলোয় নদীর দু-তীর অন্ধকার হয়ে গেছে, নদীর জল পায়ের তলায় ফুলে ফুলে ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠতে লাগল। আমি এবারে একটু ভয় পেয়ে কমলের হাত চেপে ধরে বল্লুম—"সাঁতার জানিস তো ভাই?"

কমল ঘাড় নেড়ে বল্লে—"না।"

আমি বল্লুম—"আচ্ছা, ভয় নেই, আমি তো আছি, তোর মত তিনটেকে কাঁধে করে সাঁতার দিতে পারব।" বলতে না বলতেই একটা ভীষণ ধাক্কায় আমরা দুজনেই নৌকো থেকে ছিট্‌কে পড়ে গেলুম। দেখলুম, ওদের বড় নৌকোর ধাক্কা লেগে আমাদের ছোট নৌকোটি উল্‌টে গেছে।

"কমল! কমল!"—বলে আমি চীৎকার করে ডেকে উঠলুম। ঝম্‌ঝম্ শব্দে প্রচণ্ড বৃষ্টি এসে আমার শব্দ ডুবিয়ে দিলে। সাঁতার দিতে দিতে আমি চীৎকার করে ডাকতে লাগলুম—"কমল, কমল!" বৃষ্টির ছাঁটের মধ্যে দিয়ে যতটা পারি দৃষ্টি চালিয়ে নদীর দুরন্ত ঢেউএর মধ্যে পাগলের মতো কমলকে খুঁজতে লাগলুম। জলের মধ্যে ডুব দিয়ে হাৎড়ে হাৎড়ে চারিদিক্ প্রাণপণে খুঁজতে লাগলুম—কিন্তু কোথায় কমল? ঘন শ্যাওলার বন সরুসরু লম্বা লম্বা আঙুল বাড়িয়ে আমাকেই বেঁধে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল! ডেকে ডেকে গলার শব্দ ক্ষীণ হয়ে এল—তবু কমলকে কোন মতেই পেলুম না। পাঁচ-ছ-জন ছেলে বড় নৌকো থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বল্লে—"কি হয়েছে, কমলকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, না কি?"

আমি বল্লুম—"তোরা সবাই মিলে খুঁজে দেখ্, ভাই, কোথায় গেল সে।" আমার আর সাঁতার কাটবার ক্ষমতা নেই দেখে ওরা আমাকে বড় নৌকোয় একলা

বসিয়ে রেখে সকলে মিলে সেই দুর্জ্জয় নদীর মধ্যে কমলকে খুঁজে বেড়াতে লাগল।

বৃষ্টির ধারা কমতে কমতে ক্রমে বৃষ্টি থেমে গেল। নদীর জল থেকে ওরা সবাই শ্রান্ত দেহে উঠে এল—কমল কেবল উঠল না। আমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে দেখে ওরা সান্ত্বনার সুরে বল্লে—"কাঁদিস নে বাহাদুর, তোর দুঃখ আমরা সবাই সমান ভাগে ভাগ করে নিয়েছি।"

সকাল বেলা যাদের কাছ থেকে কেবল ঠাট্টাবিদ্রূপই পেয়েছি, সন্ধ্যার আলোয় তাদের চোখগুলি দেখে, তাদের গলার সুর শুনে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। আমার কেবলই মনে হতে লাগল—আমার একমাত্র বন্ধু কমল আমার কাছ থেকে চলে গেল, সে কি এই এতগুলি ছেলেকে আমার ব্যথার ব্যথী করে নেবার জন্যে?

—শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

বাঘ-শিকার

বাঘ শিকার বড় সহজ নয়। ইহাতে অনেক ছল, অনেক কৌশল খাটাইতে হয়; অনেক সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয় নচেৎ পদে পদে বিপদ্। সাধারণতঃ যে যে উপায়ে বাঘ শিকার করা হইয়া থাকে, সে সম্বন্ধে দু' চারিটা কথা বলিতেছি :—

(১) বনের মধ্যে বেশ বড় ও উঁচু গাছের উপর মাচান বাঁধিতে হয়; মাচানের উপর শিকারী বন্দুকে গুলি-বারুদ পূরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে সেই উঁচু মাচানের নীচে কাছেই কোন একটা গাছের গায় ছাগল, ভেড়া বা অন্য কোন পশু বাঁধা থাকে। বাঘ তাহা খাইতে আসিলে, শিকারী মাচানের উপর হইতে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়ে। বাঘ যে সর্ব্বদা খুব শীঘ্র আসে, তাহা নহে। শীঘ্রও আসে, কখন কখন খুব দেরীতে আসে, আবার কখন কখন মোটেই আসেনা। শিকারীকে খুব ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। সব সময় জ্যান্ত ছাগল, ভেড়া বাঁধিতে হয় না। বাঘের 'মড়ি' (অর্থাৎ বাঘে গরু-মহিষ প্রভৃতি মারিয়া খানিকটা খাইয়া যে অবশিষ্টটুকু পুনরায় খাইবার জন্য লুকাইয়া রাখে) যেখানে থাকে, তাহারই নিকটে কোন গাছে মাচান বাঁধিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। বাঘ সন্ধ্যার সময়ে সেটা খাইতে আসিলে তাহাকে গুলি করিয়া মারিতে হয়।

(২) উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশের বড় বড় ঘাস ও খড়-বনে হাতীর উপর হাওদায় বসিয়া বাঘ শিকার করার নিয়ম আছে। সারি সারি শিকারী-হাতী শিকারী-সওয়ার বহন করিয়া সেই বনের ভিতর প্রবেশ করে, আর অপর দিক্ হইতে অনেক লোকজন হো হো শব্দ করিয়া জঙ্গলের উপর আঘাত করিয়া বাঘ ও অন্য বন্যজন্তু তাড়ায়। বাঘ তাড়িত হইয়া হাতীর সম্মুখ দিয়া যেমন পালায়, অমনি শিকারীরা হাতীর উপর হইতে গুলি মারে। সময়ে সময়ে বাঘ আহত হইয়া ফিরিয়া হাতীকে আক্রমণ করে।



মাচানে বসিয়া বাঘ-শিকার

হাতীর দেহে আবার নখ বিঁধাইয়া তাহার শরীর বাহিয়া উঠিয়া হাওদার শিকারীদের ধরিতে যায়। হাতী ভয়ে ও যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ছট্‌ফট্ করে ও শরীর ঝাড়িয়া বাঘকে ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করে। এই শরীর ঝাড়াতে অনেক সময়ে পৃষ্ঠস্থিত শিকারীও ভূতলে ছিট্‌কাইয়া পড়ে। সব হাতী-দ্বারা বাঘ-শিকার হয় না। বিশেষ শিক্ষিত হাতী না হইলে বাঘ-শিকারে বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা।

(৩) ফাঁদ পাতিয়া কৌশলে বাঘ-মারার ব্যবস্থা আছে। ইঁদুর ধরিবার যেমন খাঁচা-কল হয়, বাঁশ বা কাঠ দিয়া সেই রকম বড় বড় খাঁচা বা খোঁয়াড় তৈয়ারী করা হয়। তাহার একটা দরজা রাখা হয়, সেটা উপর দিকে তোলা থাকে ; দরজার সঙ্গে একটা দড়ি এরূপ ভাবে লাগান থাকে যে, ভিতরে কেহ প্রবেশ করিয়া একটু চলা-ফেরা করিলেই সেই দড়িতে টান্ পড়ে, আর অমনি দরজাটা পড়িয়া পথটা বন্ধ হইয়া যায়। ঐ খাঁচার ভিতর আর একটা ছোট খাঁচায় একটা ছাগল বা অন্য কোন জন্তু বন্ধ করিয়া রাখা হয়। রাত্রিতে বাঘ সেই ছাগলের লোভে বড় খাঁচার ভিতর প্রবেশ করে, আর ছোট খাঁচাটা ধরিয়া টানাটানি করিতে থাকে। সেই সময়ে দড়িতে টান্ লাগিয়া দরজাটা পড়িয়া খাঁচার মুখ বন্ধ হইয়া যায়। বাঘ বন্দী হইয়া গর্জ্জন করিতে থাকে ও বাহির হইবার জন্য কত আঁচড়-কামড় দিতে থাকে। পরে লোকজন লাঠি-শোটা, বর্শা-বন্দুক আনিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলে। কখন কখন এই খাঁচার ঢাক্‌নিটা একটা বাঁশের ঠেক দিয়া খুলিয়া রাখা হয়, আর সেই ঠেকের সঙ্গে একটা বড় আয়না বাঁধিয়া দেওয়া হয়। বাঘ ফাঁদের ভিতরের মাংস-খণ্ডের লোভে নিকটে আসিলে আয়নায় নিজের মুখ দেখিতে পায়। বাঘ যেরূপ অঙ্গ-ভঙ্গী বা নড়া-চড়া করে, আয়নার বাঘও ঠিক সেইরূপ করে। তাহাতে সেই ছায়াটাকে অপর একটা বাঘ মনে করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য বাঘ যেই সেটার উপর লাফাইয়া পড়ে, অমনি ঢাক্‌না পড়িয়া গিয়া বাঘ বন্দী হয়।



পাতায় আঠা মাখাইয়াবাঘ ধরা

(৪) পূর্ব্বে পশ্চিমাঞ্চলে গাছের পাতায় আঠা মাখাইয়া বাঘ ধরা হইত। কোন গাছতলায় অনেক আঠা মাখান পাতা বিছাইয়া রাখা হইত। সেখানে বাঘের খাবারও কিছু রাখা হইত। বাঘ খাবার লোভে সেখানে আসিলে সেই চট্‌চটে আঠা তাহার থাবায় লাগিয়া যাইত। বাঘ তাহা ছাড়াইবার জন্য থাবাটা কপালে, মুখে ঘষিত ; তাহাতে মুখে চোখে আঠা লাগিয়া যাইত। বাঘ যতই ছট্‌ফট্ করিত, ততই আরও আঠা-মাখান পাতা তাহার গায়ে

লাগিয়া যাইত। তারপর বাঘ ক্রোধে গড়াগড়ি করিত ও নাক মুখ মাটিতে ঘষিতে থাকিত। তাহাতে পাতায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া যাইত; চোখে কিছুই দেখিতে পাইত না; ক্রোধে ছট্‌ফট্ ও গর্জ্জন করিতে থাকিত। তখন লোকজন আসিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিত।

(৫) আসাম ও মহীশূর প্রদেশে জালে ধরিয়া বাঘ মারিবার রীতি আছে। যে ঘাস-বনে বাঘ থাকে, তাহার এক ধারটায় খুব মজবুত খুঁটি পুতিয়া তাহাতে মোটা জাল টানাইয়া দিয়া সে-দিক্‌টা সমস্ত ঘিরিয়া ফেলে। অপর দিক্ হইতে অনেক লোক-জন খুব শব্দ করিয়া ইট্ পাথর ছুঁড়িয়া বাঘ তাড়াইয়া লইয়া আসে। বাঘ ভয়ে বিপরীত দিকে বেগে ছুটিয়া পালায়। অবশেষে সেই জালে গিয়া পড়ে ও তাহাতে জড়াইয়া যায়। জালের ও-পাশে পূর্ব্ব হইতেই অনেক লোক-জন বর্শা, বল্লম, খাঁড়া, কুড়ালী লইয়া চুপটি করিয়া বসিয়া থাকে ও জালে বাঘ পড়িবামাত্র বর্শা, বল্লম ও কুড়ালীর আঘাতে তাহাকে মারিয়া ফেলে! কখন কখন বাঘ জাল ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া যায় ও দু'চার জনকে সাংঘাতিকরূপে জখম করিয়া দেয়।

(৬) বাঘ যে-সব যায়গায় চলা-ফেরা করে, সেখানে কূয়ার মত আট দশ হাত গভীর গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে একটা ছাগল ছাড়িয়া দেওয়া হয়। রাত্রিতে বাঘ ছাগলের লোভে প্রথমতঃ গর্ত্তের ধারে শুইয়া পড়িয়া হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করে, পরে লোভ-সম্বরণ করিতে না পারিয়া গর্ত্তের ভিতরে লাফাইয়া পড়ে। পরে আর বাহির হইতে পারে না।



তীর-ধনুকের ফাঁদ

(৭) কোন কোন শিকারী বন্দুকে গুলি-বারুদ পূরিয়া সেটাকে বনের মধ্যে একটা গাছের সঙ্গে মজবুত করিয়া বাঁধিয়া দেয়। পরে বন্দুকের 'ঘোড়া' উঠাইয়া তাহার সহিত একটা সরু লম্বা দড়ি বাঁধিয়া, সেই দড়িটা আট দশ হাত দূরে বন্দুকের

সম্মুখে আনিয়া, তাহাতে একখণ্ড মাংস টান্ করিয়া বাঁধিয়া দেয়। তীর-ধনুকের সহিতও ঐরূপ কৌশল করিয়া মাংস বাঁধা যায়। বাঘ বা অন্য কোন জন্তু যখন ঐ মাংস ধরিয়া টানে, তখনই বন্দুক বা তীর ছুটিয়া বাঘের গায়ে লাগে।

(৮) এ সব কাপুরুষের মত বাঘ মারা; ইহাতে সাহস, বীরত্ব বা ধীরতা কিছুই নাই। যাঁহারা ভাল শিকারী, তাঁহারা পায়ে হাঁটিয়া বনের ভিতর বাঘের সম্মুখে গিয়া গুলি করিয়া বাঘ মারেন। ইহাতে তাঁহাদের অসীম সাহস, অব্যর্থ লক্ষ্য, হাতের স্থিরতা, মনের দৃঢ়তা ও ধীরতা প্রকাশ পায়। এই রকম শিকারে ভারি বিপদ্; লক্ষ্য যদি ভ্রষ্ট হইল, হাতটা যদি কাঁপিয়া উঠিল, মনে যদি ভয় হইল, কি করিতে হইবে মুহূর্ত্তের মধ্যে যদি ঠিক করিতে না পারিল, তবেই নিজের প্রাণ লইয়া টানাটানি। প্রকৃত শিকারীরা এইরূপ শিকারেই আমোদ পান।

নেপালের গুর্খারা ভারি সাহসী! তাহাদের একমাত্র অস্ত্র একটা ছোট ভোজালী বা খাঁড়া, তাহাকে কুকৃরি বলে। গুর্খা এই 'কুকৃরি' দিয়া বাঘ মারিতে যায়। বাঘ দেখিয়া গুর্খা দৃঢ়মুষ্টিতে ভোজালী ধরিয়া স্থির হইয়া দাঁড়ায় ও বাঘের প্রত্যেক গতির উপর দৃষ্টি রাখে। বাঘ গুর্খাকে ধরিবার জন্য যেই লাফ মারে, গুর্খা অমনি একটু সরিয়া দাঁড়ায় আর বাঘ নিকটে আসিবামাত্র তাহার থাবা লক্ষ্য করিয়া এক কোপ মারে, অমনি সে পা-খানি দু-খণ্ড হইয়া যায়। বাঘ মাটিতে পড়িয়াই রাগে ও যন্ত্রণায় আবার তাহাকে আক্রমণ করিবার জন্য লাফ মারে, গুর্খা আবার একটু সরিয়া গিয়া তাহার অপর পায়ে কোপ মারে। এইরূপে বাঘকে চলৎশক্তি-রহিত করিয়া মারিয়া ফেলে। কখন কখন প্রথম আক্রমণের সময়েই গুর্খা একটু সরিয়া দাঁড়ায় ও বাঘ যেই পাশ দিয়া বেগে লাফাইয়া যায়, অমনি চট্ করিয়া বাঘের গলা লক্ষ্য করিয়া কোপ মারে। এক কোপেই তাহার মুণ্ড শরীর হইতে পৃথক্ হইয়া যায়।

—স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

জয়-পরাজয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

তখন আমার বয়স বার বৎসর। একদিন মা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মোহনলাল, দেখ্‌তে দেখ্‌তে তুই বড় হ'য়ে উঠ্‌লি। আর হেসে খেলে সময় নষ্ট ক'র্‌লে চল্‌বে না। কালই তোকে স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দেব।"

এত বয়স পর্য্যন্ত স্কুলে ভর্ত্তি হই নাই শুনিয়া, কেহ কেহ হয়ত আশ্চর্য্য বোধ করিবেন। কিন্তু তাঁহারা যদি সকল দিক্ দেখিয়া শুনিয়া বিচার করেন, তাহা হইলে নিশ্চিতই বুঝিতে পারিবেন যে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। প্রথম, আমি নেহাৎ গরীব লোকের ছেলে নই,—ঘরে অন্নের বিশেষ অভাব ছিল না। দ্বিতীয়, আমি মায়ের একমাত্র সন্তান,—আব্দারের সীমা ছিল না। তৃতীয়, নিতান্ত শিশু অবস্থায় আমি পিতৃহীন হই,—শাসন করিবার কেহই ছিল না। কাজেই এমন সুযোগের মধ্যে পড়িলে, কোন্ বালকই বা বার বৎসরের পূর্ব্বে স্কুলে ভর্ত্তি হয়? আমি মায়ের আদুরে গোপাল হইয়া হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটাইতাম। মাকে বেলা দুপুর পর্য্যন্ত ফাঁকি দিয়া, বাগানে বাগানে পাখীর ছানা খুঁজিয়া বেড়াইতাম; কখন সমবয়সীদের সঙ্গে জুটিয়া প্রতিবাসীদের বাগানে পাকা কুল, বাতাবি লেবু, কাঁচা আম, কচি শশা প্রভৃতি চুরি করিতে যাইতাম। কখন জেলের ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া, ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করিয়াও নদীতে নৌকা চড়িয়া বেড়াইতাম; কখন বা নদীর চড়ায় গিয়া চড়িভাতি করিতাম। একদণ্ড আমাকে বাড়ীতে কেহ স্থির হইয়া থাকিতে দেখে নাই। দুপুরবেলা মা আমাকে 'হাসি খুসি' ও শ্লেট-পেন্‌সিল দিয়া বসাইয়া দিতেন, কিন্তু আমি তাঁহার চোখে ধূলা দিয়া, পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে গিয়া মিশিতাম এবং ডাণ্ডা-গুলি ও কপাটি খেলায় সারাদিন কাটাইয়া সন্ধ্যার সময় ঘরে ফিরিতাম।

আমি আরও কয়েক বৎসর হাসিয়া খেলিয়া কাটাইতে পারিতাম; কিন্তু পাড়ার কয়েকটি দুষ্ট ছেলের সহিত আমার কিছু বেশী ঘনিষ্ঠতা হওয়াতে, মা বড়ই ভয় পাইলেন এবং স্কুলে যাইতে আরম্ভ করিলে, তাহাদের সঙ্গে আমার বেড়ান বন্ধ হইবে, এই ধারণায় তিনি পরদিনই আমাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। মায়ের বুঝিবার নিতান্তই ভুল হইয়াছিল! স্কুলে গিয়া অতি অল্পদিনের মধ্যেই আমি অনেকগুলি কুসঙ্গী পাইলাম এবং তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া, স্কুল

হইতে পলাইয়া, বাগানে বাগানে ঘুরিয়া, পাখীর ছানা ও ফল-মূল চুরি করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

স্কুলেও আমার গুণের কথা শীঘ্রই প্রকাশ হইয়া পড়িল। আমাদের ক্লাসে নেপাল ও মণিরাম নামে দুইটি ছেলে ছিল। নেপাল আমার সমবয়স্ক, মণিরামের বয়স নিতান্ত অল্প। এই দুই জনের সঙ্গে আমার একেবারেই বনিত না—প্রায়ই ঝগড়া-বিবাদ হইত। মণিরাম বয়সে ছোট বলিয়া অনেক সময়, এমন কি, বিনা দোষেও তাহাকে প্রহার করিতাম; কিন্তু মনে মনে খুব রাগ থাকিলেও নেপালের উপর কোন অত্যাচার করি, এমন সাহস আমার ছিল না।

ক্লাসের প্রায় সকলেই আমাকে ও নেপালকে ভয় করিত। তাহার কারণ, নেপালের ভালবাসা ও আমার অত্যাচার। নেপাল সকলকে এত ভালবাসিত যে, তাহার সম্মুখে কোন অন্যায় কাজ করিতে কাহারও সাহস হইত না; আর আমার অত্যাচার-প্রবৃত্তি এমনই প্রবল ছিল যে, আমাকে ভয় না করিত, এমন ছেলে ক্লাসে কেহই ছিল না। এমন কি আমি কোন অত্যাচার করিলেও শিক্ষককে বলিয়া দিতে কেহ সাহস করিত না!

অভ্যাসমত একদিন আমি মণিরামকে ধরিয়া দুই চারি ঘা দিতেছি, এমন সময় নেপাল আসিয়া বলিল, "দেখ ভাই, মণিরাম একে ছোট, তা'তে আবার ভারী রোগা। আর তুমি তার চেয়ে কত বড়! মণিকে মারা কি তোমার ভাল দেখায়!"

"আচ্ছা, আচ্ছা, এ বিষয়ে তোমার কোন কথা বল্‌বার দরকার নেই। জ্যেষ্ঠ-তাতের মত উপদেশ দিচ্ছ কেন! মণিকে মার্‌ছি সে বুঝ্‌বে, মাঝ্‌খান থেকে তোমায় ফোড়ন দিতে ডাক্‌লে কে?"—এই বলিয়া রাগের চোটে আমি মণিরামের ঘাড় ধরিয়া ঠেলিয়া দিলাম।

আমার অভদ্র ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া নেপাল সেখান হইতে চলিয়া গেল। তাহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া আমি ভাবিলাম, নেপাল নিশ্চিতই ভীরু। ভীরু না হইলে সে কখনই চুপ করিয়া চলিয়া যাইত না।

সেই দিন হইতে নেপালের উপর আমার রাগ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। ক্লাসের অন্যান্য বালকের উপর আমি এত দিন যেরূপ প্রভুত্ব করিয়াছি, মিথ্যা ভয়ে নেপালের উপর সেরূপ করিতে সাহস করি নাই বলিয়া, মনটা কেমন যেন খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল! ভাবিলাম, এবার সুবিধা পাইলেই নেপালকে উত্তম-মধ্যম ঘা কতক দিতে হইবে। তখন হইতে নেপাল যাহাতে চটে, আমি বাছিয়া বাছিয়া সেইরূপ কাজ করিতে লাগিলাম।

ঝগড়া বাধাইবার জন্য বড় বেশী দিন অপেক্ষা করিতে হইল না। আমাদের স্কুলে যাইবার পথে, এক কৃষকের বাগানে কয়েকটা লিচু গাছ ছিল। তখন জ্যৈষ্ঠ মাস। গাছগুলি লিচুতে ভরিয়া গিয়াছিল। একদিন স্কুলে আমরা কয়েক জনে পরামর্শ করিলাম যে, সেই বাগানের লিচু খাইতে হইবে। আমাদের মধ্যে মণিরাম বেশ গাছে উঠিতে পারিত। আমি তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম, "দেখ্ মণি, আজ লিচু পেড়ে খাবো, তুই গাছে উঠ্‌বি, কেমন ?" মণিরাম ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আচ্ছা।"

স্কুলের ছুটি হইলে আমরা দল বাঁধিয়া, কৃষকের লিচু গাছের তলায় জড় হইলাম। কৃষক তখন বাড়ীতে ছিল না। আমি মণিরামকে গাছে তুলিয়া দিয়া সকলকে পাহারা দিতে বলিলাম। মণিরাম সবেমাত্র দশ বারটা লিচু পাড়িয়াছে, এমন সময় বৈদ্যনাথ আসিয়া বলিল, "ওহে মোহনলাল, ব্যাপার বড় সহজ নয়! নেপাল দলবল নিয়ে এই দিকে আস্‌ছে। বোধ হয়, মারামারি হ'তে পারে।" আমি বলিলাম, "কি, নেপাল আসছে ? আসুক্, আজ তা'কে একবার দেখাবো! তোমরা এই দিকে থাকো, আমি ঐ গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকি। খবরদার, তোমরা ভয় পেও না। আমি ঠিক সময়ে বাইরে এসে নেপালকে দু-চার ঘা লাগিয়ে দেবো। তোমরা তা'র চেলাদের মাথায় চড়্‌টা-আস্‌টা দিতে ভুলো না।" আমার কথায় সকলে রাজী হইল ; আমি গাছের আড়ালে গিয়া লুকাইলাম।

একটু পরেই নেপালের দল গাছ-তলায় আসিয়া উপস্থিত হইল। মণিরাম তখন ভয়ে নামিয়া আসিবার উদ্যোগ করিতেছিল। তাহাকে দেখিতে পাইয়া নেপাল বলিল, "ছিঃ মণি, তোমার এই কাজ! আমি তোমার মাকে ব'লে দেবো।"

মণিরাম ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "না ভাই, আমার কোন দোষ নেই। তুমি ত জান, শুধু মার খা'বার ভয়েই আমি এ কাজ ক'র্‌তে রাজী হ'য়েছি।"

নেপাল। তা জানি, আসল ব্যাপার বুঝ্‌তে আমার বাকী নেই। ছিঃ! ছিঃ! এর চেয়ে লজ্জার কথা আর কি আছে!

নেপালের কথা শেষ হইতে না হইতে বৈদ্যনাথ সগর্ব্বে বলিয়া উঠিল, "সাবধানে কথা বল, অত বাড়াবাড়ি ভাল নয়!"

নেপালের দলে গোপীনাথ নামে একটি ছেলে ছিল। তাহার চেহারা যেমন গুণ্ডার মত, তাহার গায়ের জোরও তেমনি ভয়ানক। সে বৈদ্যনাথের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "কি, সাবধান হ'ব ? কেন, এত ভয় কিসের ? আয় না, কা'র ঘাড়ে ক'টা মাথা, দেখি।" এই বলিয়া গোপীনাথ যেই একটু অগ্রসর হইল, লিখিতে লজ্জা হয়, আমার দলের সকলেই অমনি প্রাণভয়ে দৌড় দিল। দলের ছেলেদের কাণ্ড

দেখিয়া আমি যারপরনাই দুঃখিত হইলাম। এক একবার ভাবিলাম, ছুটিয়া গিয়া নেপালের মুখে এক ঘুসী লাগাই। কিন্তু গোপীনাথের ভয়ে আমারও সে সাহস হইল না। আমি যেমন লুকাইয়া ছিলাম, তেমনি রহিলাম। তখন নেপাল মণিরামকে ডাকিয়া বলিল, "নেমে এস, এমন কাজ আর কখনো ক'রো না।"

মণিরাম ধীরে ধীরে নামিয়া বাড়ীর দিকে চলিল। নেপালের দলও অন্য একটি রাস্তা দিয়া চলিয়া গেল। তাহারা অনেক দূর যাইলে পর, আমি তাড়াতাড়ি বাড়ী চলিলাম। সেই দিন আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, নেপালকে ইহার প্রতিশোধ দিবই দিব। তাহা যদি না পারি, আমার মোহনলাল নাম মিথ্যা!

ইহার পর কয়েক দিনের মধ্যেই নেপালকে মারিবার সুযোগ উপস্থিত হইল। একদিন স্কুলের ছুটির পর নদীর ধার দিয়া যাইতে যাইতে, আমি নীচে বই রাখিয়া, একটা গাছে পাখীর ছানা পাড়িতে উঠিয়াছি, এমন সময়, নেপাল, মণিরাম এবং আমাদের ক্লাশের আরও কয়েকটি ছেলে সেখানে আসিল। গাছের তলায় বই দেখিয়া নেপাল বলিয়া উঠিল, "এই দেখ, কোন হতভাগা ছেলে বই ফেলে গেছে। কা'র নাম লেখা আছে, খুলে দেখ্ ত?"

আমি গাছের উপর হইতে বলিলাম, "কি এত বড় আস্পর্দ্ধা! তুই আমাকে হতভাগা বল্‌বার কে? দাঁড়া, তো'কে দেখাচ্ছি!" এই বলিয়া আমি তিন চারিটা ডিম-শুদ্ধ পাখীর একটি বাসা নেপালের মুখের উপর ছুড়িয়া দিলাম। ডিমগুলা ভাঙ্গিয়া তাহার নাক, মুখ রসে ভরিয়া গেল; নেপালের মুখের শ্রী দেখিয়া সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমি তাড়াতাড়ি নামিয়া তাহার কাছে গিয়া বলিলাম, "এখন তোর 'গুপে' কোথায়? সে-দিন যে বড় মারামারি ক'র্‌তে চেয়েছিলি! আয়, তিন ঘুসীতে এখনই তোর দাঁত উড়িয়ে দেবো!"

"মারামারি করা ভদ্দর লোকের কাজ নয়! যতক্ষণ ভাল কথায় চলে, ততক্ষণ মারামারি না করাই উচিত। কিন্তু তুমি ক্রমেই যে রকম বাড়িয়ে তুল্‌ছ, তোমাকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার। আমি মিষ্টি কথা ব'লে দেখেছি, ভাল ব্যবহার ক'রে দেখেছি, তুমি কিছুতেই শুন্‌লে না। যেন মারামারি করাই তোমার উদ্দেশ্য! যদি তাই হয়, এস, দেখা যাক্!" এই বলিয়া নেপাল তাহার জামার আস্তিন্ গুটাইতে লাগিল।

আমি আর কালবিলম্ব না করিয়া, নেপালের মুখ লক্ষ্য করিয়া সজোরে এক ঘুসী চালাইলাম। সে হঠাৎ মাথা সরাইয়া সেই ঘুসী এড়াইল। তখনই আবার আর একটা ঘুসী মারিলাম, সেটাও তাহার গায়ে লাগিল না। রাগে, ঘৃণায় উত্তেজিত

হইয়া আমি আবার তাহাকে মারিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় নেপালের প্রকাণ্ড এক ঘুসী ঠিক আমার নাকের উপর আসিয়া পড়িল! সে ত ঘুসী নয়, যেন লোহার মুগুর! আমি চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম! মাথা ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, নেপালের সহিত ঘুসীতে আঁটিয়া উঠা সহজ নয়। সে একজন রীতিমত পালোয়ান। তখন আমি—"যাক্



তখন আমি……মরিয়া হইয়া তাহার দিকে ছুটিয়া গেলাম

প্রাণ, থাক মান"—মন্ত্র জপিতে জপিতে একেবারে মরিয়া হইয়া তাহার দিকে ছুটিয়া গেলাম। নেপাল চক্ষুর নিমিষে অমনি একধারে একটু সরিয়া দাঁড়াইল, আর বেগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া আমি পাশের নদীতে পড়িয়া গেলাম। নদীটা বড় না হইলেও গভীর ছিল। আমি সাঁতার জানিতাম না; নদীতে

পড়িয়া আঁকুর-পাকুর করিতে করিতে ভাসিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু আমার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল! আমার এই আসন্ন বিপদে নেপাল স্থির থাকিতে পারিল না —তাড়াতাড়ি লাফাইয়া পড়িয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিল। আমিও তাহার কাপড় ধরিলাম। নেপাল বলিল, "তোমার কোন ভয় নেই; কাপড় ছেড়ে দেও, আমি তোমাকে এখনি উঠাচ্ছি।" কিন্তু তাহার কাপড় ছাড়িতে আমার সাহস হইল না। কি জানি, শত্রু ভাবিয়া সে যদি আমাকে ফেলিয়া চলিয়া যায়। আমার নির্ব্বুদ্ধিতায় লাভের মধ্যে এই হইল যে, আমরা দুই জনেই ডুবিতে লাগিলাম। শেষে নেপাল জোর করিয়া আমার হাত হইতে তাহার কাপড় ছাড়াইয়া লইল এবং অনেক কষ্টে আমাকে লইয়া ভাসিতে ভাসিতে তীরে আসিয়া উঠিল। এইরূপে আমি সে যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম।

কিন্তু কুশিক্ষার এমনই দোষ যে, সে-সময়েও আমি নেপালকে ভাল চক্ষে দেখিতে পারিলাম না। সে যে আপনাকে এত বিপদে ফেলিয়া আমার জীবন-রক্ষা করিল, সে জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাক, বরং অপমানে যেন আমি মরিয়া গেলাম! নেপাল এই ঘটনা লইয়া যেখানে-সেখানে গর্ব্ব করিবে, আর সকলের কাছে আমার মাথা হেঁট্ হইবে,—ইহা অপেক্ষা লজ্জা ও অপমানের বিষয় আর কি আছে? নদীর জলে ডুবিয়া মরাই বরং আমার পক্ষে সহস্র গুণে ভাল ছিল! এই ভাবিতে ভাবিতে আমি বাড়ী চলিয়া গেলাম।

বাড়ী আসিলে, নেপালের প্রতি আমার অন্যায় ব্যবহারের কথা শুনিয়া, মা আমাকে যারপরনাই তিরস্কার করিলেন। তারপর কয়েকজন আত্মীয়-স্বজনের সহিত পরামর্শ করিয়া আমাকে কলিকাতায় পাঠান স্থির করিলেন। ১৫ বৎসর বয়সের সময়ে আমি মামার সহিত কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এত বয়স পর্য্যন্ত আমি কখনও বাড়ীর বাহির হই নাই। সেই জন্য ট্রেণে উঠিয়া প্রথম প্রথম আমার খুব কষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু কলিকাতায় পৌঁছিবার পরে, দিন কয়েক মামার সঙ্গে চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, গড়ের মাঠ, কেল্লা প্রভৃতি দেখিয়া, সে কষ্টের অবসান হইল।

মামা আমাকে একটি বোর্ডিং স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া এক সপ্তাহ পরে দেশে ফিরিয়া গেলেন। আমি বোর্ডিংয়ের ভাল ছেলেদের ত্রিসীমানায়ও ঘেঁসিতাম না। কয়েকটি ওঁচা ছেলে আমার সঙ্গী হইল। আমি তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া লুকাইয়া লুকাইয়া চুরুট্ খাইতে শিখিলাম। অষ্টপ্রহর ভাল জামা-কাপড় পরিয়া বাবুগিরি করিতাম। বোর্ডিংএ আমার স্বেচ্ছাচারিতা ক্রমশঃই বাধা পাইতে

লাগিল। বোর্ডিং স্কুলের বাঁধাবাঁধি নিয়মের মধ্যে বাস করা যে কি ভয়ানক কষ্টকর, তাহা মনে হইলে এখনও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এক মাস যাইতে না যাইতে, আমি পর পর সাত বার নিয়মভঙ্গ-অপরাধে তিরস্কৃত হইলাম। বোর্ডিংএ আমার সমবয়স্ক আরও কয়েকটি বালক ছিল। তাহাদের মধ্যে রমানাথ দুষ্টামীতে সর্ব্বাপেক্ষা পাকা। তাহার সহিত আমার খুব ভাব হইল। আমাদের পরস্পরের মধ্যে এত ভাব দেখিয়া, হেড্‌মাষ্টার মহাশয় নিয়ম করিয়া দিলেন যে, আমরা কেহ কাহার সহিত কথা বলিতে পারিব না। কিন্তু মাষ্টারের চক্ষে ধূলি দিবার শক্তি আমাদের যথেষ্ট ছিল। আমরা গোপনে একত্র হইয়া সর্ব্বপ্রকার দুষ্টামীর মৎলব আঁটিতে লাগিলাম। লেখাপড়াও যে কিছুই শিখিলাম না, এমন নয়। তখন আমি গড়্ গড়্ করিয়া 'রয়েল রীডার থ্রি' পড়িতে পারিতাম; এক টানে আমার নাম লিখিতে পারিতাম; অঙ্কশাস্ত্রের জ্ঞানও নিতান্ত কম হয় নাই,—হড়্ হড়্ করিয়া কুড়ির কোটা পর্য্যন্ত নাম্‌তা মুখস্থ বলিতে পারিতাম। এইরূপে একটু লেখাপড়া এবং অনেকখানি দুষ্টামী শিখিয়া আমি পূজার ছুটির সময় বাড়ীতে আসিলাম; পূজার কয়দিন বেশ কাটিয়া গেল, মা কিছুই বলিলেন না। কিন্তু বিজয়ার পরদিনই মা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মোহনলাল, এই ক'মাস কল্‌কাতায় থেকে তুমি তোমার শিক্ষকদের এবং বোর্ডিংএর ছেলেদের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার ক'রেছ, তা সবই আমি শুনেছি। তোমার মামাকে মাষ্টার মশাই যে চিঠি লিখেছেন, তা আমি দেখেছি। তুমি এখন আর ছেলেমানুষটি নও, বড় হ'য়েছ; কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, এখনও তুমি কুসংসর্গ ছাড়্‌তে পার্‌লে না। যা হ'ক, আমি আর তোমাকে কিছু ব'লতে চাই না। তোমার যা ইচ্ছে, তাই ক'রো।" এই বলিয়া মা চোখে কাপড় দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মাকে কাঁদিতে দেখিয়া আমার বড় কষ্ট হইল; আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, মা যাহাতে কষ্ট পান, এমন কাজ আর কখনও করিব না। আমার ভাবগতিক দেখিয়া মা-ও বোধ করি ভাবিলেন যে, আমার সুমতি হইবার উপক্রম হইয়াছে। তার পর যে কয়দিন বাড়ীতে ছিলাম, আমার সে কয়দিনের ব্যবহার দেখিয়া মা যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন। অবশেষে ছুটি ফুরাইয়া আসিলে, মা আমাকে আদর করিয়া, নানা প্রকার সদুপদেশ দিয়া, আবার কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন।

ছুটির পর বোর্ডিংএ ফিরিয়া আসিয়া দেখি, যেন সব উলট্-পালট্ হইয়া গিয়াছে। আমি যে ঘরটাতে থাকিতাম, সে-ঘর মেরামত হইতেছে, আমার জন্য অন্য একটা ঘরে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অন্যান্য কয়েকজন বালকের ঘরও

বদ্‌লাইয়া গিয়াছিল। রমানাথ আমার আসিবার একদিন পূর্ব্বে বোর্ডিংএ ফিরিয়া আসিয়াছিল। আমি যে-দিন আসি, সেই দিন বিকালে রমানাথ আমাকে চুপি চুপি বলিল, "দেখ মোহনলাল, আজ একটা মজা ক'র্‌তে হবে, তা'তে তোমার সাহায্য চাই। তুমি বোধ হয় জান, ছোট কুঞ্জ রাক্ষসের কথা শুনলে বড় ভয় পায়। কেউ রাক্ষসের গল্প বল্‌লে কুঞ্জ তা'র কাছেও যায় না; আজ রাত্তিরে কুঞ্জকে নিয়ে একটু মজা ক'র্‌বো। আমি দুটো রাক্ষসের মুখোস্ কিনে এনেছি। কুঞ্জ ঘুমুলে আমরা রাক্ষস সেজে তা'কে গিয়ে ভয় দেখাবো। কেমন, তুমি রাজি আছ ত?"

রমানাথের কথার কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মায়ের চোখের জলের কথা আমার মনে পড়িল। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলাম, ইহা ত দুষ্টামী নয়—একটু মজা করা মাত্র! ইহাতে দোষ কি? এই ভাবিয়া রমানাথকে বলিলাম, "আচ্ছা, আমি রাক্ষস সাজবো, কিন্তু ভাই, খুব সাবধান—মাষ্টার মশাই যেন টের না পান।"

"আরে সে ভাবনা নেই। মাষ্টার মশাই আমাদের কোন্ কাজটাই বা জান্‌তে পারেন!" এই বলিতে বলিতে রমানাথ অন্যত্র চলিয়া গেল।

রাত প্রায় বারটা বাজিলে ক্লাশের কয়েকজন ছেলে আমাদের দুইজনকে বেশ ভাল করিয়া রাক্ষস সাজাইয়া দিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের বোর্ডিংগৃহ মেরামত হইতেছিল, বাড়ীতে অনেক খড়ের দড়ি ছিল। সুতরাং আমাদের এক একটি ল্যাজেরও অপ্রতুল হইল না। আমরা বিকট মূর্ত্তি ধরিয়া বাতি হাতে পা টিপিতে টিপিতে ছোট কুঞ্জের ঘরের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলাম। রমানাথ চাবি ঘুরাইবা-মাত্র দরজা খুলিয়া গেল। তখন বাতি নিভাইয়া ভূতের মত অন্ধকারের সহিত মিশিয়া গিয়া আমরা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। তার পর পশ্চিম দিকের জানালা খুলিয়া দিলাম। ঘরে বেশ চাঁদের আলো আসিয়া পড়িল। কুঞ্জের বিছানা ঘরের এক কোণে ছিল বলিয়া, কেবল সেইখানটায় আলো পৌঁছিল না। আমরা কুঞ্জের নাক ডাকার শব্দে বুঝিলাম, সে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত।

পূর্ব্বের বন্দোবস্ত অনুসারে রমানাথ ও আমি একসঙ্গে লাফাইয়া কুঞ্জের উপরে গিয়া পড়িলাম। সে হাঁউ-মাঁউ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ভয়ে তাহার কণ্ঠের স্বর একেবারে বদ্‌লাইয়া গিয়াছিল। সে যতই চীৎকার করিতে লাগিল, আমরাও ততই তাহাকে ল্যাজের বাড়ি মারিতে মারিতে বিকট শব্দ করিয়া বলিলাম, "আঁমরা রাঁক্ষস, তোঁ'কে গিঁলে খাঁবো!"

আমাদের কথা শেষ হইতে না হইতেই কুঞ্জ জানালার ধারে জ্যোৎস্নাতে আসিয়া দাঁড়াইল।—কি সর্ব্বনাশ! সহস্র বজ্র যেন একেবারে আমাদের মাথার উপরে পড়িল! চারিদিক্ অন্ধকার বোধ হইতে লাগিল! এ ত কুঞ্জ নয়! এ যে দেখি, আমাদের হেড্‌মাষ্টার! হেড্‌মাষ্টারকে দেখিয়া, আমাদের হাত-পা



"কয়েকজন ছেলে আমাদের দুইজনকে রাক্ষস সাজাইয়া দিল"—১৫৬ পৃষ্ঠা।

আড়ষ্ট হইয়া গেল! কিন্তু তবুও আমরা প্রাণভয়ে ছুটিয়া ঘরে আসিয়া লুকাইলাম।

বাকী রাতটা যে কি ভাবে কাটিল, তাহা লিখিয়া জানাইতে পারি না। এমন কোন ভাষা নাই, যাহাতে ঠিক আমাদের মনের ভাব প্রকাশ হয়। সকাল হইলে

কি করিব, ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। আমরা গায়ের রং ধুইয়া, দুইটিতে মড়ার মত পড়িয়া রহিলাম। মুখোস আগেই পুড়াইয়া ফেলিয়াছিলাম।

পরদিন ভোর না হইতেই বোর্ডিংময় রাষ্ট্র হইল যে, দুইটি ছেলে মুখোস পরিয়া রাত্রে হেড্‌মাষ্টারকে ভয় দেখাইতে আসিয়াছিল! সেই ছেলে দুইটি কে কে, জানিবার জন্য মাষ্টার মহাশয় বোর্ডিংএর সব ছেলেকে একত্র হইতে বলিলেন। আমরা যতদূর সম্ভব মনের ভাব গোপন করিয়া সকলের সঙ্গে গিয়া বসিলাম এবং যাহারা আমাদের কীর্ত্তি জানিত, ইঙ্গিতে তাহাদিগকে কোনও কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া, নিতান্ত নিরীহ বালকের ন্যায় মাষ্টার-মহাশয়ের আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

কিছু পরেই বোর্ডিংএর সম্পাদক ও হেড্‌মাষ্টার মহাশয় সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কে কে এরূপ অসমসাহসিক কার্য্য করিয়াছে, জানিতে চাহিলেন। কিন্তু বালকদিগের মধ্যে কেহই তাঁহাদের কথার উত্তর দিল না। তাঁহারা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন। সে-বারেও কেহ কোন উত্তর দিল না। তখন তাঁহারা এক এক জন করিয়া একদিক্ হইতে সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। প্রথম চার পাঁচটি ছেলে উত্তর দিল যে, তাহারা কিছুই জানে না। তার পর মাষ্টার মহাশয় পঞ্চানন নামে একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন। পঞ্চাননের সহিত রমানাথের খুব শত্রুতা ছিল। আমিও পঞ্চাননকে মনে মনে ঘৃণা করিতাম। মাষ্টার মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে পঞ্চানন দাঁড়াইয়া বলিল, "আমার বোধ হয়, রমানাথ এর মধ্যে ছিল। কাল বিকেলে তা'কে দুটো মুখোস্ কিনে আন্‌তে দেখেছি।" পঞ্চাননের কথা শুনিয়া, ভয়ে আমাদের মুখ শুকাইয়া গেল, বুক গুর্-গুর্ করিতে লাগিল। বোর্ডিংএর সম্পাদক মহাশয় তখনই রমানাথের হাত ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিতে টানিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই কাজ ক'রেছ ?"

"আজ্ঞে না, আমি কিছুই জানি না," বলিয়া রমানাথ আত্মদোষ গোপন করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা। প্রহারের যন্ত্রণায় দুই তিন মিনিটের মধ্যেই রমানাথ তাহার দোষ স্বীকার করিল এবং আমার নামও প্রকাশ করিয়া দিল। হেড্‌মাষ্টার মহাশয় আমাকেও টানিতে টানিতে সম্পাদকের কাছে লইয়া গেলেন। খুনীকে ফাঁসি দিবার সময় তাহার মনের ভাব কেমন হয়, এই সময়ে তাহা আমি ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আমরা কোন রকমে দোষ গোপন করিতে না পারিয়া, প্রকৃত ঘটনাটা কি, তাহা তাঁহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই আমাদের কথায় বিশ্বাস

করিলেন না ; মনের সাধ মিটাইয়া প্রহার করিতে লাগিলেন। চাবুকের আঘাতে যখন আমাদের সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়া লাল হইয়া উঠিল, তখন তাঁহারা আমাদের দুই জনকে দুই ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিলেন। এইখানেই যে আমাদের শাস্তির শেষ হইল, তাহা নহে ; দশটার পর ইস্কুলের ছেলেরা উপস্থিত হইলে, মাষ্টার মহাশয় আমাদের দুই জনের মাথায় দুইটা গাধার টুপী পরাইয়া ক্লাসে ক্লাসে ঘুরাইয়া আনিলেন এবং ভবিষ্যতে আর কখন কোন প্রকার দুষ্টামী করিলে, বোর্ডিং হইতে তাড়াইয়া দিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন। এইরূপে সেই দিনের গোলযোগ এক রকম থামিয়া গেল।

গোলমাল চুকিয়া গেল বটে, কিন্তু ছোটলোক পঞ্চাননের শত্রুতার কথা আমরা কিছুতেই ভুলিতে পারিলাম না। দুইজনে গোপনে পরামর্শ করিলাম যে, বোর্ডিং ছাড়িতে হয় তাহাও স্বীকার, পঞ্চাননকে একবার ভাল করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে।

আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হইতে বেশী দেরী হইল না। পাঁচ ছয় দিন পরে একদিন সামান্য দোষে আমরা পঞ্চাননকে বেশ করিয়া প্রহার করিলাম। হেড্‌মাষ্টার মহাশয় তাহা শুনিয়া আমাদের দুই জনকে বোর্ডিং হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

(ক্রমশঃ)

—যোগীন্দ্রনাথ সরকার

রা ও লালের কথা

কোনও নগরে এক গরীব ঘাসিয়াড়া বাস করিত। সে প্রতিদিন জঙ্গল থেকে ঘাস কাটিয়া আনিয়া সহরে দুই চার পয়সায় বিক্রয় করিত। তাহাতেই অতি কষ্টে তাহার দিন কাটিয়া যাইত। প্রতিদিনের অভ্যাস মত সে একদিন ভোর বেলায় উঠিয়া শহরের বাহিরে ঘাস কাটিতে গেল। প্রায় দশসের ঘাস কাটা হইবার পর তাহার হঠাৎ মনে পড়িল, ঘাস-বাঁধা দড়িটা বাড়ীতে ফেলিয়া আসিয়াছে। তখন বেচারার যে কি রকম দুঃখ হইল, তা' বেশ বুঝিতেই পারিতেছ। সমস্ত দিনের পরিশ্রম একেবারে মাটি। যখন সে দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া ভাবিতেছিল, সেই মসয় কয়েক পা দূরে দড়ির মতন কি একটা রৌদ্রে ঝক্-ঝক্ করিতে দেখা

গেল। সেটা কি দেখিবার জন্য কাছে গিয়া দেখিল, একটা মরা সাপ পড়িয়া রহিয়াছে। সাপটা দিয়া ঘাস বাঁধিতে বেশ সুবিধা হইবে মনে করিয়া সে খুব খুসী হইল। তাড়াতাড়ি সেটা তুলিয়া লইতে গেল; কিন্তু এ কি! তুলিবামাত্র সেটা একটা উজ্জ্বল বহুমূল্য লাল (অর্থাৎ চুনি) হইয়া গেল। হঠাৎ এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া বেচারা ঘাসিয়াড়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল, একটু ভয়ও পাইল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া অতি যত্নে পাথরটিকে পাগড়ীতে বাঁধিয়া লইল। সন্ধ্যার সময় সে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। বেচারা গরীব মানুষ, চুনির দাম জানিত না। কাজেই এমন সুন্দর জিনিষ রাজার উপযুক্ত মনে করিয়া পরদিন সকালে রাজ-প্রাসাদে যাইয়া রাজাকে সেটি উপহার দিল। রাজা এমন দামী জিনিষ পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া লোকটিকে যথেষ্ট টাকাকড়ি দিলেন। অত টাকা পাইয়া তাহার খুব সুবিধা হইল। জীবনের বাকী ক'দিন তাহাকে ঘাস কাটিতে হইল না।

রাজা চুনি লইয়া অন্তঃপুরে প্রিয়তমা মহিষীকে উপহার দিলেন। রাণী উজ্জ্বল রত্নটি তুলিয়া লইয়া দেখিতে গেলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! চুনি হঠাৎ একটি সুন্দর সদ্যোজাত শিশু হইয়া গেল। রাণী দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও আনন্দিত হইলেন। তাঁহার কোন ছেলে-মেয়ে ছিল না; কাজেই তিনি শিশুটিকে অতি যত্নে আদরের সহিত পালন করিতে লাগিলেন। আগে চুনি ছিল বলিয়া রাণী তাহাকে 'লাল' বলিয়া ডাকিতেন। রূপে গুণে লাল বাড়িতে লাগিল। সে যত বড় হইতে লাগিল, ততই তাহার শরীরে রাজলক্ষণ ও মহত্ত্বের চিহ্ন সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। আট বৎসর বয়সের সময় তাহার পিতা তাহাকে রাজপুত্র ও রাজকন্যাদের বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। সেই পাঠশালায় 'হীরা' নামে একটি পরমা সুন্দরী রাজ-কন্যা পড়িত। লাল ও হীরার খুব ভাব হইল; অল্পদিনের মধ্যেই তাহারা পরস্পরকে খুব ভালবাসিতে লাগিল। বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যাইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ভালবাসার বন্ধনও দৃঢ়তর হইতে লাগিল। শেষে একদিন লালের পিতা তাহাদের ভালবাসার কথা শুনিয়া লালকে হীরার সহিত সম্পর্ক ঘুচাইয়া ফেলিতে আজ্ঞা করিলেন। বেচারা অত্যন্ত দুঃখিত হইল। এদিকে হীরা পড়াশুনা সাঙ্গ করিয়া বিবাহের জন্য বাড়ী চলিয়া গেল। তাহার যে ক্ষমতাশালী রাজার সহিত বিবাহ স্থির হইয়াছিল, সে এক কানা কুঁজো বুড়ো। হীরার বিবাহের কথা শুনিয়া লাল নিরাশায় ও দুঃখে পাগল হইবার উপক্রম হইল। একদিন রাত্রে সে রাজ-প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া এক দ্রুতগামী ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া হীরার পিতার রাজ্যে যাত্রা করিল। রাজ-পুত্র যে-দিন শহরে পৌঁছিলেন, সে-দিন হীরার বিবাহ। রাজকন্যা

হীরা বধূবেশে অসংখ্য সুসজ্জিত লোকের সঙ্গে বাদ্য ও আলোক লইয়া উৎসব-সজ্জামণ্ডিত পথে বাহির হইয়াছেন। পথের এমন জায়গায় লাল দাঁড়াইয়া ছিলেন, যেখানে সহজেই লোকের দৃষ্টি পড়ে; হীরা তখনি তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। উদ্ধার নিকট মনে করিয়া তিনি অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। বিবাহের মিছিল চলিবার সময় লাল সুবিধা বুঝিয়া হীরার কানে কানে কয়েকটা কথা বলিলেন। শহরের একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া সকলে আলোকমালা ও বাজি দেখিতে, কেহ বা নটীর নৃত্য-গীত শুনিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল; হীরা সেই অবসরে সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া লালের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাড়াতাড়ি বধূ-সজ্জা খুলিয়া ফেলিয়া হীরা লালের নিকট পুরুষের পোষাক লইয়া পরিলেন। পোষাকের রঙ ও কাট ঠিক লালের পোষাকের মত। পোষাক পরা হইলে হীরাকে কেহ স্ত্রীলোক বলিয়া বুঝিতে পারিল না। হীরা ও লাল লম্বায় এবং আকৃতিতে প্রায় একই রকম ছিলেন, তাঁহাদের দেখিলে দুইটি যমজ ভাই বলিয়া মনে হইত। তাঁহারা ঘোড়ায় চড়িয়া অতি দ্রুতবেগে শহর ছাড়াইয়া গেলেন।

দু-জনে ক্রমাগতই চলিয়াছেন। ছুটিতে ছুটিতে তেজী ঘোড়ার খুরের তলায় আগুন জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল, পায়ের শব্দে সমস্ত কানন-ভূমি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। হীরা ও লাল তখনও চলিয়াছেন; সূর্য্যদেব ধীরে ধীরে পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িলেন; আকাশে তারা ফুটিয়া উঠিল। চারি দিক্ অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল। তাঁহারা শহর ছাড়াইয়া অনেক দূর আসিয়াছেন; আর ধরা পড়িবার সম্ভাবনা নাই। দুই জনে পথের ধারে একটি ছোট্ট কুটীরে আশ্রয় লইলেন। কুটীরে এক বুড়ী থাকিত; সে পথিকদের আদর করিয়া ডাকিয়া লইল। কুটীরটি ছিল দুই মস্ত দস্যুর; তাহারা এই বুড়ীর স্বামী ও পুত্র; এখনও বাড়ী ফিরিয়া আসে নাই; তাহারা এখন ডাকাতি করিতে গিয়াছে। হীরা ও লাল যে কি রকম বিপদের মুখে পা দিলেন, তাহা তাঁহাদের কল্পনারও অতীত। হীরা পরিশ্রান্ত হইয়া শুইয়া পড়িলে বৃদ্ধার দাসী ঘুম পাড়াইবার জন্য তাঁহার পা টিপিতে লাগিল। হীরা প্রায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, এমন সময় তাঁহার পায়ে এক ফোঁটা জল পড়িল; চাহিয়া দেখিলেন, দাসী কাঁদিতেছে। হীরা যতই তাহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করেন, দাসী ততই কাঁদে। অনেকক্ষণ পরে সে চুপি চুপি বলিল, "তোমরা যে বাড়ীতে এসেছ, তা দুই নিষ্ঠুর দস্যুর, তারা এখন চুরি করতে বাইরে গিয়েছে, শীগ্‌গিরই ফিরে এসে তোমাদের দুজনকেই খুন করবে।" এই কথা শুনিয়া হীরা একলাফে উঠিয়া লালের নিকট হাজির হইলেন ও তাঁহাকে সব কথা বলিলেন। শীঘ্র তাঁহারা বুড়ীর

কাছে বিদায় লইয়া অন্ধকারে কুটীর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। বৃদ্ধা তাঁহাদের অনেক করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিল, "ভয়ানক অন্ধকার, রাত্রি অনেক হয়েছে, পথে কত বিপদ্।" কিন্তু কে কাহার কথা শুনে! হীরা ও লাল চলিয়া গেলেন। তাঁহারা আর ফিরেন না দেখিয়া বৃদ্ধা, 'পাখী উড়ে গেল, পাখী উড়ে গেল,' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে তাঁহাদের পিছনে ছুটিল। তাহার স্বামী ও পুত্র তখন বাড়ী ফিরিতেছিল। চীৎকার শুনিয়া সঙ্কেত বুঝিতে পারিয়া তাহারা পলাতক হীরা ও লালের পিছনে দৌড়িল। লাল দুইজনকে পশ্চাৎ লইতে দেখিয়া এক তীর ছুঁড়িলেন। দস্যু-পুত্রের বুক ফুঁড়িয়া বাণ ছুটিয়া দূরে গিয়া পড়িল। সে মরিয়া পড়িয়া গেল। ইহা দেখিয়া তাহার পিতা প্রতিশোধ লইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া বাড়ী ফিরিল। এ দিকে হীরা ও লাল এক সরাইয়ে যাইয়া রাত্রির মত আশ্রয় লইলেন। সকালে উঠিয়া দেখেন, এক বৃদ্ধ দরজায় বসিয়া আছে। সে তাঁহাদের সহিস হইতে চাহিল। তাঁহারা তাহাকে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া রৌদ্র উঠিলে তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। একটা নির্জ্জন জায়গায় আসিলে বৃদ্ধ এক ঘায়ে লালের মাথা কাটিয়া ফেলিল। লালকে মারিয়া সে হীরার মাথা কাটিতে তলোয়ার তুলিল। কিন্তু হীরা অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া তাঁহার প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন; তিনি যে পুরুষ নন্ রমণী—তাহা বলিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে স্বীকার করিলেন। এই বৃদ্ধ আর কেহ নয়, সেই মৃত দস্যুর পিতা। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিবার পর সে হীরার কথায় সম্মত হইয়া তাঁহাকে লইয়া কুটীরের দিকে ফিরিয়া চলিল। কয়েক মিনিট যাইবার পর হীরা আকাশের দিকে চাহিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ হাসি দেখিয়া খুব বিরক্ত হইয়া উঠিল। হাসি-তামাসা তাহার সহ্য হয় না। সে বলিল, "এই ছুঁড়ী, হাস্‌ছিস্ কেন রে? দাঁত বন্ধ কর, বল্‌ছি।" কিন্তু হীরা আকাশের দিকে দেখাইয়া বলিলেন, "দেখ দেখ, কি সুন্দর ঘুঁড়ি।" সে উপর দিকে চাহিবামাত্র হীরা তলোয়ার বাহির করিয়া চোখের পলক পড়িতে না পড়িতে তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। তাহার মুখে থুথু ফেলিয়া হীরা মৃত লালের নিকট ফিরিয়া গেলেন। সেখানে যাইয়া তিনি লালের মৃতদেহের উপর পড়িয়া করুণ-সুরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। পথিকেরা তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে সেই পথে হর-পার্ব্বতী যাইতেছিলেন। হীরাকে কাঁদিতে দেখিয়া পার্ব্বতী শিবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়েটি কাঁদ্‌ছে কেন? শিব বলিলেন, "দেবি, সকল অশ্রুমুখী বালিকার কান্নার কারণ শুন্‌লে তোমার কোমল হৃদয় মানবের দুঃখে ভেঙ্গে পড়্‌বে।" কিন্তু পার্ব্বতী হীরার বিলাপ শুনিয়া

অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার দুঃখের কারণ শুনিয়া তাহা মোচন না করিয়া আর এক পাও নড়িবেন না। এইরূপ সঙ্কটে পড়িয়া শিব কি আর করেন, লালের মৃত্যুকথা বলিলেন। তার পর তাঁহার দেহ ও মস্তক একসঙ্গে করিয়া তাহাতে নিজ শরীরের রক্ত প্রবেশ করাইয়া দিলেন। দেবতার রক্ত অমৃত, কাজেই লাল বাঁচিয়া উঠিলেন। হীরার আনন্দের ও কৃতজ্ঞতার আর সীমা রহিল না। তিনি দেব-দম্পতির সম্মুখে পড়িয়া তাঁহাদের বন্দনা আরম্ভ করিলেন। উঠিয়া দেখেন, তাঁহারা অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছেন।

হীরা ও লাল আবার ঘোড়ায় চড়িয়া যাত্রা করিলেন। কয়েক দিন পরে তাঁহারা এক বৃহৎ জনাকীর্ণ নগরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে এক সরাইয়ে হীরাকে রাখিয়া লাল বাজার করিতে গেলেন। এক বড় রাস্তায় গিয়া প্রত্যেক দোকানেই কিছু কিছু কিনিলেন, কিন্তু দোকানের জিনিষ দোকানেই রাখিয়া বলিলেন, "ফের্‌বার সময় নিয়ে যাব।" এইরূপে দোকানের পর দোকানে গিয়া জিনিস কিনিয়া টাকা দিতে দিতে চলিলেন। অবশেষে পথের শেষে এক পানের দোকানে আসিলেন। পানওয়ালী ছিল জাদুকরী। তাহার কাছে গিয়া লাল পান চাহিলেন। সে বলিল, "আসুন, আসুন মশায়, আপনি যত চান, তত দেব।" লাল তাহাকে চিনিতেন না, কাছে যাইবামাত্র মায়াবিনী তাঁহাকে ছাগল বানাইয়া ফেলিল।

এদিকে লাল আসেন না দেখিয়া হীরা খোঁজ করিতে চলিলেন। তিনি তখনও পুরুষের পোষাক পরিয়া ছিলেন। লাল যে পথে গিয়াছিলেন, সেই পথে যাইবামাত্র দোকানদারেরা তাঁহাকে লাল মনে করিয়া তাঁহার ক্রীত দ্রব্য-সকল দিতে আসিল। হীরা বলিলেন, "ফের্‌বার সময় নেব।" যাইতে যাইতে প্রত্যেক দোকানদারই কিছু না কিছু দিতে আসিল ; তিনি প্রত্যেককেই এক উত্তর দিলেন। পানওয়ালীর দোকানে আসিলে সে তাঁহাকে কিছুই বলিল না। হীরা তখনই ব্যাপারটি আন্দাজ করিয়া লইলেন যে, লাল এখানেই আছেন। কাজেই তিনি পানওয়ালীর কাছে পান চাহিতে গেলেন। সে বলিল, "আসুন, আসুন মশায়, আপনি যত চান, আমি তত দেব।" "আমি তোর মতন বোকা নয়," বলিয়া হীরা চলিয়া গেলেন। এক রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে হীরা দেখেন, এক বুড়ী মিঠাই তৈয়ার করিতে করিতে কাঁদিতেছে। হীরা তাহার কাছে গিয়া বলিলেন, "মা, তুমি কাঁদ্‌ছ কেন ? আর এই মিঠাইগুলোই বা কেন কর্‌ছ ?" বৃদ্ধা বলিল, "কি আর বল্‌ব, বাছা ? এ এক দুঃখের কাহিনী। এ দেশের রাজার এক মেয়ে আছে, তাকে প্রতিদিন একটা মানুষ উৎসর্গ কর্‌তে হয়। আজ আমার ছেলের পালা। এ মিঠাইগুলি তারই জন্যে এবং

আমি তারই জন্যে কাঁদ্‌ছি।" হীরা বলিলেন, "মা, কেঁদো না, আমি তোমার ছেলের বদলে সেই ভীষণ রাজকন্যার কাছে যাব। এখন আমায় মনের সাধে মিঠাইগুলি খেতে দাও।" বৃদ্ধা এত সহজে পুত্রের উদ্ধার হইল দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া হীরাকে সমস্ত খাবার সাজাইয়া দিল। হীরা মনের সাধে খাইয়া রাজ-প্রাসাদে চলিলেন। রাজ-কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ রাজকন্যার মহলে পাঠাইয়া দিল। হীরা পুরুষবেশে গিয়াছিলেন বলিয়া সকলেই তাঁহাকে বীর যুবক মনে করিয়া অত্যন্ত সমাদর করিল। রাজকন্যা যথেষ্ট ভালবাসা দেখাইলেন। হীরা কিঞ্চিৎ আহার করিবার পর এক পুরোহিত আসিয়া রাজকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিল। তারপর দুইজনে এক নিভৃত শয়ন-কক্ষে বিশ্রাম করিতে গেলেন। হঠাৎ এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। রাজকন্যার সে অমায়িক মনোহারিণী মূর্ত্তি কোথায় গেল ? এ কি ভীষণ মূর্ত্তি! রাজকুমারীর মুখ দিয়া ফেণা বাহির হইতেছে, চোখ দিয়া আগুন ছুটিতেছে যেন দুইটা জ্বলন্ত আগুনের ভাঁটা! সে দুই হাতে তাহার অমন সুন্দর চুল গোছা গোছা করিয়া ছিঁড়িতে লাগিল, মাটিতে পড়িয়া চিৎকার আরম্ভ করিল। শেষকালে গর্জ্জন কিছু কমিলে, সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। এমন সময় একটা ভীষণ বিষধর কাল সাপ তাহার বাঁ পা ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া আসিল। সাপটা বিকট গর্জ্জন করিয়া হীরার গায়ে পড়িতে আসিল। তাহার কি ভয়ানক চেহারা! প্রকাণ্ড দুই জিভ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। হীরা যদিও ভয় পাইয়াছিলেন, কিন্তু বুদ্ধি হারান নাই। সাপটাকে কাছে আসিতে দেখিয়া ক্ষুরধার তলোয়ার দিয়া তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন, তারপর হীরা সারারাত্রি সেই ঘরে বসিয়া মূর্চ্ছিতা রাজকন্যাকে সচেতন করিতে ব্যস্ত রহিলেন। পরদিন রাজার নিকট খবর পৌঁছিল, এতদিন যে সাপটা রাজকন্যাকে পাইয়া বসিয়াছিল, হীরা নামক এক বীর যুবা তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছেন। রাজা শুনিয়া মহা খুসী! হীরাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি পুরস্কার চাও!" হীরা একদিনের জন্য সেই শহরের রাজা হইতে চাহিলেন। রাজা মহা আনন্দে হীরার মাথায় মুকুট ও হাতে দণ্ড দিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন। রাজার হুকুমে সমস্ত কর্ম্মচারী তখনকার মত হীরার অধীন হইল।

হীরা সিংহাসনে উঠিয়া শহরে ঢেঁড়া পিটাইয়া দিলেন, "রাজার হুকুম, নগরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে নিজ নিজ গরু-বাছুর পশু-পক্ষী লইয়া মহারাজের নিকট হাজির হইবে।" সকলে নিজ নিজ পালিত পশু-পক্ষী লইয়া রাজ-দরবারে ছুটিল। সকলে সমবেত হইলে নাম ডাকা হইল, কিন্তু এ কি! পানওয়ালী যে আসে

নাই। পেয়াদারা ছুটিয়া গিয়া পানওয়ালী ও তাহার ছাগল বাঁধিয়া আনিল। হীরা দেখিয়াই বুঝিলেন, এই ছাগলই লাল। তিনি মায়াবিনীকে ছাগল বিক্রয় করিতে বলিলেন। সে উত্তর করিল, "ধর্ম্মাবতার, আমি মা কালীকে ছাগলটা উৎসর্গ করেছি, আগামী অমাবস্যায় বলি দেব। মহারাজ, আমি মানত করে রেখেছি, দাসীকে এ জন্যে ক্ষমা কর্‌বেন। এই কথা শুনিয়া হীরা আদেশ করিলেন, "জল্লাদ, এই মায়াবিনীকে বেঁধে আগুনে পুড়িয়ে মার।" রাজার আদেশে পানওয়ালী তৎক্ষণাৎ বাঁধা পড়িল। তারপর তাহার প্রাণদণ্ড হইল। হীরা মন্ত্র পড়িয়া ছাগলটাকে আবার মানুষ করিয়া তুলিলেন। সভার মাঝখানে তিনি লালকে স্বামী বলিয়া বরণ করিলেন এবং রাজবেশ খুলিয়া ফেলিয়া রমণীর বেশে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

হীরা পুরুষ নয় দেখিয়া রাজকন্যা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। কিন্তু লালের সহিত তাঁহারও বিবাহ হইল। এইরূপে লাল দুই স্ত্রীর সহিত সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন রাজকন্যা হীরাকে বলিলেন "বোন, আমাদের প্রিয়তম স্বামীর জাত কি, বল না? তিনি রাজার পোষ্য-পুত্র তা ত জানি, কিন্তু তাঁর জন্মের মধ্যে একটা কি রহস্য আছে। তোমাকে তিনি বেশী ভালবাসেন, এই কথাটা তুমি তাকে জিজ্ঞাসা কোরো।" হীরা বলিলেন, "আমাদের সে কথায় কাজ কি, বোন? আমরা তাঁর ভালবাসা পেয়েই কি যথেষ্ট সুখী নয়? তাঁর মুখের স্নিগ্ধ কিরণেই আমরা স্নিগ্ধ হয়ে আছি। আমাদের আর কিসের দরকার?" কিন্তু রাজকন্যা কোন কথাই শুনিবেন না, তিনি লালের জাতি জানিবার জন্য অত্যন্ত জেদ আরম্ভ করিলেন। শেষে হীরা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। হীরা লালের নিকট গিয়া তাঁহার জাতি জিজ্ঞাসা করিলেন। লাল ইহা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত-চিত্তে বলিলেন, "হীরা, আমায় ও-কথা জিজ্ঞাসা কোরো না। এর জন্য তোমায় পরে দুঃখ পেতে হবে।" কিন্তু হীরার শুনিতেই হইবে। লাল তখন হীরাকে লইয়া এক নদীর ধারে উপস্থিত হইলেন; নদীর ঠিক্ কিনারায় দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখনও আমার জাত জান্‌তে চাও?" হীরা বলিলেন, "চাই।" লাল এক হাঁটু জলে নামিয়া বলিলেন, "এখনও কি তুমি আমার জাত জান্‌তে ইচ্ছুক?" হীরা বলিলেন, "হাঁ, প্রভু।" লাল আরও গভীর স্থানে এক গলা জলে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "এখনও আমার জাত জান্‌তে ইচ্ছা আছে? বল, এখনও আশা আছে।" কিন্তু হীরা পূর্ব্বের মতন বলিলেন, "হাঁ, জান্‌তে চাই।" লাল গভীর জলে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার সমস্ত শরীর জলের ভিতর, কেবল চুলের ডগাগুলি জলের উপরে দেখা

কোথা হইতে একটা হতভাগা ব্রাহ্মণ আসিয়া ফাঁকি দিয়া হাজার টাকা লইয়া যায়, অথচ তাহাদের মত উপযুক্ত লোক রাজসভায় দিবানিশি রাজবাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়াও মনের মত টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে না, কি দুঃখ!—তাহারা স্থির করিল, যাহাতে ব্রাহ্মণ টাকা না পায়, তাহার উপায় করিতে হইবে। শেষে রাজা যখন খাজাঞ্চিকে হাজার টাকা বাহির করিয়া আনিবার হুকুম দিবেন, সেই সময় এক জন চাটুকার গম্ভীরস্বরে বলিল, "মহারাজ টাকা দিন তা'তে আপত্তি নেই, আপনার অর্থ আপনি জলে ফেলে দিলে আমাদের কি আপত্তি হ'তে পারে? কিন্তু আমরা থাক্‌তে একটা জোচ্চোর এতগুলো টাকা ফাঁকি দিয়ে নিয়ে যাবে—এ অসহ্য; আমরা মহারাজের হিতাকাঙ্ক্ষী, অনুমতি হয় ত এই জোচ্চোর বামুণকে গোটা কতক প্রশ্ন করি।"

রাজা বলিলেন, "সে ত ভাল কথাই; কোন প্রকার জুয়াচুরী প্রকাশ হ'লে, এ ব্রাহ্মণ উপযুক্ত শাস্তি পাবে। আমি প্রহরীদের কাছে জেনেছি, এ ব্যক্তি সারারাত দীঘির জলে গলা পর্য্যন্ত ডুবিয়ে বসেছিল। আমি আমার প্রহরীদের অবিশ্বাস করি না।"

"মহারাজের প্রকৃতি অতি সরল"—বলিয়া প্রথম নম্বর চাটুকার ব্রাহ্মণকে প্রশ্ন করিল, "তুমি বল্‌ছ, তুমি সারারাত দীঘির জলে গলা ডুবিয়ে বসে ছিলে? কতক্ষণ তুমি এই ভাবে ছিলে?"

ব্রাহ্মণ সবিনয়ে উত্তর করিল, "জমাদার ঠাকুরকে জিগেস্‌ করুন, আমি প্রাসাদের ওপর আলো জ্বল্‌লে—সন্ধ্যেবেলা জলে নামি, তারপর ভোরের বেলা সেই বাতি নিভ্‌লে জল থেকে উঠি। ধর্ম্ম সাক্ষী—আমি মিথ্যা বল্‌ছি না।"

চাটুকার আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি জলে ডুবে ছিলে, আলো জ্বল্‌ছে কি না, কি ক'রে জান্‌লে?"

ব্রাহ্মণ বলিল, "আমি গলা পর্য্যন্ত ডুবিয়ে ছিলাম, আমার চোখ দু'টি সারারাত আলোর দিকেই ছিল। আলোর দিকে চেয়েই আমি এ দুরন্ত রাত কাটিয়েছি, মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা পেয়েছি; কিন্তু এত কষ্টেও যখন দেহে প্রাণ আছে, তখন আর কষ্ট দেবেন না, আমাকে বিদায় করুন; মহারাজের বিজয় ঘোষণা ক'র্‌তে ক'র্‌তে আমি চলে যাই।"

চাটুকার বলিল, "মহারাজ, এ বামুণ জোচ্চোর। ফাঁকি দিয়ে আপনার কাছ থেকে হাজার টাকা নিয়ে যাবে। এ আলোর দিকে চেয়ে সারারাত জলের মধ্যে বসেছিল—এতেই বোঝা যাচ্ছে, বামুণ চোখ দিয়ে আলোর উত্তাপ নিয়েছে, সেই

জন্যেই জলের মধ্যে সারারাত বাস ক'রেও এর শীত লাগে নি ; এ বামুণ কখনও টাকা পেতে পারে না।"

শুনিয়া সকল চাটুকার সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "এ কখনও টাকা পেতে পারে না, বামুণ জোচ্চোর।"

রাজা চাটুকারের কথায় ভুলিয়া গেলেন, প্রহরীকে বলিলেন, "এই জোচ্চোর বামুণকে তাড়িয়ে দাও।"

"হা ভগবান্, তুমি এর বিচার কর" বলিয়া মর্ম্মাহত ব্রাহ্মণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া রাজবাড়ী পরিত্যাগ করিল।

পথে গোপাল ভাঁড়ের সঙ্গে তাহার দেখা। গোপাল তাহাকে দেখিয়াই মাথা নোয়াইয়া বলিল, "প্রণাম ঠাকুর, তোমাকে এত কাতর দেখ্‌ছি কেন ? তোমার কি দুঃখ, আমাকে বল।"

ব্রাহ্মণ বলিল, "পরমেশ্বর ভিন্ন কেউ আমার দুঃখ দূর ক'রতে পার্‌বেন না ; তোমাকে ব'লে কি আর হ'বে ?"

গোপাল ছাড়িবার পাত্র নয়। ব্রাহ্মণের কাছে সকল কথা শুনিয়া বলিল, "এ জন্যে তুমি আক্ষেপ কোরো না, আমি তোমার টাকা আদায় করিয়ে দেবো।"

সে কথায় ব্রাহ্মণের বিশ্বাস হইল না ; কিন্তু আশার শেষ নাই। গোপালের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ সে দিনের মত কৃষ্ণনগরেই থাকিয়া গেল। এদিকে গোপাল রাজসভায় না গিয়া, একেবারে বাড়ী যাইয়া গম্ভীরভাবে উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

অবশেষে সে এক কাণ্ড আরম্ভ করিল। একটা প্রকাণ্ড উঁচু বাঁশের আগায় একটা হাঁড়ি বাঁধিয়া তাহাতে কিছু চাল ও জল দিল এবং বাঁশটি মাটিতে পুঁতিয়া তাহার নীচে একটি উনন খুঁড়িয়া জ্বাল দিতে লাগিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্রমাগতই সে জ্বাল দিতেছে ; লোকে অবাক্ হইয়া তাহার কাণ্ড-কারখানা দেখিতে লাগিল ; কেহ কেহ বলিল, 'এত দিনে গোপালের মাথা খারাপ হ'য়ে গিয়েছে !'

ইতিমধ্যে রাজবাড়ী থেকে গোপালের ডাক আসিল। বেলা এক প্রহর হইয়া গিয়াছে, এখনও গোপাল রাজবাড়ী উপস্থিত হয় নাই, সভার অর্দ্ধেক আমোদ বন্ধ আছে। রাজবাড়ীর সিপাহীকে গোপাল বলিল, "আমি ভাত রাঁধছি, খেয়ে যাব।" ক্রমে এক এক জন করিয়া তিনজন লোক গোপালকে ডাকিতে আসিল। এদিকে বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে ; কিন্তু গোপালের সেই একই উত্তর, "ভাত রাঁধা শেষ হ'লেই মহারাজকে গিয়ে প্রণাম ক'র্‌ব।"

ক্রমে গোপালের এই অপূর্ব্ব পাগ্‌লামীর কথা মহারাজের কর্ণগোচর হইল। রাজা কিছু বিস্মিত হইয়া, দুই একটি পারিষদের সহিত সন্ধ্যা বেলা বেড়াইতে বেড়াইতে গোপালের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোপাল তখনও সেইভাবে উননে জ্বাল দিতেছে—ঊর্দ্ধে বংশদণ্ডে হাঁড়ির মধ্যে চাল ও জল।



"মহারাজ, আমি ভাত চড়িয়েছি; ভাত নাম্‌লেই খেয়ে যাব।"—১০১ পৃষ্ঠা

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোপাল, তোর বড় বাড়াবাড়ি দেখ্‌ছি, ডেকে পাঠালে কথা গ্রাহ্যই হয় না, এম্নি নবাব হয়েছিস্!"

গোপাল হাত জোড় করিয়া বলিল, "মহারাজ, আমি ভাত চড়িয়েছি। ভাত নাম্‌লেই খেয়ে যাব, এইটুকু মাত্র সময় চেয়েছিলাম। হুকুম অগ্রাহ্য ক'র্‌বার সাহস

আমার নেই। সেই সকাল বেলা ভাত চড়িয়েছি, এখনও নামে নি, তাই যেতে পারি নি, অপরাধ মাপ ক'র্‌তে আজ্ঞা হোক্।"

রাজা হাসিয়া বলিলেন, "তোর মাথা কি একেবারেই বিগ্‌ড়ে গিয়েছে? এই রকম ক'রে কখন ভাত রাঁধা হয়? তুই মাটিতে উনন কেটে আগুন জ্বেলেছিস্, আর পঞ্চাশ হাত ওপরে বাঁশের ডগায় হাঁড়ি টাঙ্গিয়ে ভাত চড়িয়েছিস্—এ তোর কি রকম পাগ্‌লামী, চাল সেদ্ধ হ'বে কি ক'রে?"

গোপাল আবার জোড় হাত করিয়া বলিল, "এ বিদ্যে মহারাজের কাছেই শিখেছি। এক শ' হাত ওপরে আলো থাক্‌লে, দীঘির জলে ব'সে যদি সেই আলোতে আগুন পোহান যায়, তবে পঞ্চাশ হাত তফাৎ থেকে আমার হাঁড়ির চাল সেদ্ধ হ'বে না কেন?"

রাজা চাটুকারদিগের কুমন্ত্রণা বুঝিতে পারিলেন; গরীব ব্রাহ্মণকে তৎক্ষণাৎ হাজার টাকা দিবার হুকুম হইল। সে টাকা পাইয়া গোপালকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

—দীনেন্দ্রকুমার রায়

লাইট্-হাউসে

ভালো ক'রে ভোর হ'বার আগেই আমাদের জাহাজ থেকে মওমুলেনের লাইট্-হাউস্ দেখ্‌তে পাওয়া গেল। চারিধারে অকূল সমুদ্র——তারই মাঝখানে সমুদ্রের বিশাল প্রহরীর মত মেঘ-লোক পর্য্যন্ত মাথা তুলে লাইট্-হাউস্‌টি দাঁড়িয়ে আছে।

সমুদ্রের মাঝখানে এম্‌নি নিঃসঙ্গ লাইট্-হাউস্ দেখ্‌লেই মনে কেমন একটা অদ্ভুত ভাবের উদয় হয়। ওখানে যারা দিনের পর দিন আলো জ্বেলে সমুদ্রের জাহাজদের পথ দেখাবার জন্য বাস করে, তাদের সঙ্গহীনতার কথা ভেবে অবাক্ হ'য়ে যেতে হয়। পৃথিবীর কারুর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই। কোথাও মাসে একবার, কোথাও দু'মাসে একবার তাদের খাবার-দাবার জিনিষপত্র নিয়ে একটি 'বোট' যায়। মানুষের সংসারের সঙ্গে এইটুকুই তাদের যোগ। তারপর আবার দিনের পর দিন ওই লাইট্-হাউসেই তাদের কাটাতে হয়। দূর থেকে তারা দেখ্‌তে পায়, অসংখ্য

মানুষ ভর্ত্তি হ'য়ে দেশ-বিদেশে জাহাজ যাচ্ছে, কিন্তু তারা সেই এক জায়গাতেই বন্দী হ'য়ে থাকে—একেবারে নির্ব্বাসিত।

কিন্তু মণ্ডমুলেনের এই লাইট্-হাউস্‌টি দেখ্‌বামাত্র এ-সব ভাবনা ছাপিয়ে ভয়ে বুক দুর্ দুর্ করে উঠ্‌ল।

জাহাজ থামান হ'য়েছে, ওদিকে খালাসীরা আমাদের বোট নামাচ্ছে। আর অল্পক্ষণ বাদেই ডাক্তার বাবু ও একজন পুলিস কর্ম্মচারীর সঙ্গে জাহাজ ছেড়ে ওইখানে আমাদের যেতে হবে ভাব্‌তেই গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল।

আগের দিন ডাক্তার বাবুর জরুরি টেলিগ্রাম পেয়েছি। সাইগনে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রেছি বিকেলে ; এবং তার খানিক বাদেই জাহাজে চ'ড়ে ডাক্তার বাবুর সঙ্গে রওয়ানা হ'য়েছি।

জাহাজে ওঠ্‌বার আগে পর্য্যন্ত কেন যে এত জরুরী তার ক'রে আমায় ডাক্তার বাবু আনালেন, কোথায় যে আমরা চ'লেছি, তা তিনি কিছুই জানান নি। আমিও জিজ্ঞাসা ক'র্‌বার সময় পাই নি।

জাহাজ ছাড়্‌বার পর রাত্রে তাঁর কেবিনে পুলিশ-অফিসারের সামনে ডাক্তার বাবু সমস্ত কথা আমায় খুলে বল্লেন। ভীতু আমি সাধারণতঃ নই ; তা'হলে ডাক্তার বাবুর সঙ্গে আমার আলাপই হ'তে পার্‌ত না! কারণ, কম্বোজের জঙ্গলে শিকার ক'র্‌তে গিয়েই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। কিন্তু ডাক্তার বাবুর কাছে আমাদের অভিযানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য শোনবার পর বুক একেবারে কাঁপে নি বল্লে মিথ্যা বলা হ'বে।

ডাক্তার বাবু যা বল্লেন, তা সংক্ষেপে এই—

দিন পোনেরো আগে জাপানী কোমাগাতো মারু লাইনের একটি জাহাজ হঙ্‌কঙ্‌ হ'য়ে কল্‌কাতা যাচ্ছিল। পথে রেঙ্গুনে গিয়ে সে জাহাজের কাপ্তেন খবর দেয় যে, কম্বোজের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে ঝড়ে তাকে বিশেষ বিপদে প'ড়্‌তে হ'য়েছিল। বিশেষতঃ, সেখানকার মণ্ডমুলেনের লাইট্-হাউস্ থেকে আলোর সঙ্কেত না পাওয়ার দরুণ ডুবো পাহাড়ে বানচাল হ'তে হ'তে সে কোন রকমে রক্ষা পেয়েছে।

লাইট্-হাউস্‌টি ফরাসীসরকারের অধিকারে। এ খবর তাদের কাছে পৌঁছোয়, কিন্তু এ নিয়ে বিশেষ মাথা, বোধ হয়, কেউ ঘামায় না। সমুদ্রে যে সব জায়গা বিপদ্‌সঙ্কুল সেইখানেই লাইট্-হাউস্ সাধারণতঃ থাকে। এ লাইট্-হাউস্‌টি যে জায়গায় আছে, সেখানটা আবার বিশেষ খারাপ ; কিছুদিন আগেই সেখানে একটি

জাহাজ লাইট্‌-হাউসের আলো থাকা সত্ত্বেও ঝড়ের রাত্রে ডুবো পাহাড়ে লেগে ডুবে যায়। সুতরাং জাপানী জাহাজের সেখানে বিপন্ন হওয়া কিছু বিচিত্র নয় মনে ক'রে, ফরাসী-সরকার এ বিষয়ে বিশেষ কিছু তদন্ত করে নি। লাইট্‌-হাউস্‌ থেকে আলো না পাওয়াটার খবরটা একরকম চাপা-ই প'ড়ে যায়। কিন্তু এর কয়েক দিন বাদে, আর একটি মার্কিণ জাহাজও যখন ঐ লাইট্‌-হাউস্‌ থেকে আলো না দেখ্‌তে পাওয়ার অভিযোগ করে, তখন হঠাৎ ফরাসী-গভর্ণমেণ্টের টনক্‌ নড়ে। সাইগন থেকে একটি ফরাসী যুদ্ধ-জাহাজ রাত্রে তদন্ত ক'রে ফিরে এসে জানায় যে, সত্যিই লাইট্‌-হাউস্‌ থেকে আলো দেখা যাচ্ছে না। এ রকম অদ্ভুত ব্যাপার এর আগে কখনও হয় নি। তারপর দিন যখন একটি 'লঞ্চ' এই লাইট্‌-হাউসে খোঁজ ক'র্‌তে পাঠান হ'ল এবং সে লঞ্চ যখন ফিরে এসে জানালে যে, লাইট্‌-হাউসের কর্ম্মচারী, স্ত্রী-পুত্র, গৃহপালিত পশু ইত্যাদি সমেত একেবারে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে লোপ পেয়েছে, তখন সকলের বিস্ময়ের অবধি রইল না। সমুদ্রের মাঝখান থেকে ভোজবাজীর মত এতগুলো মানুষ কোথায় উধাও হ'য়ে গেল? এবং কেমন ক'রেই বা এ সম্ভব হ'ল?

যাই হোক্‌, রহস্যের সমাধান হোক্‌ বা না হোক্‌, লাইট্‌-হাউসের আলো জ্বাল্‌বার বন্দোবস্ত তো ক'র্‌তে হ'বে! আবার নতুন একজন লোক সে ভার নিয়ে গেল। কিন্তু দিন তিনেক বাদে যখন আবার লাইট্‌-হাউসের আলো জ্বল্‌ছে না সংবাদ পাওয়া গেল, তখন ফরাসী-সরকার সত্যিই ফাঁপরে প'ড়্‌লেন। এবার আর অন্তর্দ্ধান-রহস্যের কিনারা না ক'র্‌লে চলে না। তাই বেছে বেছে সাইগনের সরকারী ডাক্তার সুরেন বাবু ও সেখানকার জল-পুলিশের বড় কর্ম্মচারী মিঃ বার্ণের ওপর ভার দেওয়া হ'ল, এ ব্যাপারের তদন্ত ক'র্‌বার। ডাক্তার বাবুকে ডাকা হ'য়েছিল শুধু এই ভেবে যে, যদি কোন রকম উৎকট রোগে লাইট্‌-হাউসের বাসিন্দারা মারা প'ড়ে থাকে, তা'হলে ডাক্তার বাবু বুঝতে পার্‌বেন। কিন্তু ডাক্তার বাবুর ধারণা তা' নয়। তিনি বল্লেন, "রোগে ম'র্‌লে তাঁদের মৃতদেহগুলো যাবে কোথায়?" এর ভেতর আরো কিছু গভীর রহস্য আছে সন্দেহ ক'রে তিনি আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, আমার মত লোকের সহায়তা তাঁর দরকার হ'তে পারে।

কিন্তু আপাততঃ অদূরে অকূল সমুদ্রের মাঝখানে এই রহস্যময় লাইট্‌-হাউস্‌টিকে দেখে, আমি যে ডাক্তার বাবুর কি সাহায্যে আস্‌তে পারি, ভেবে পেলাম না। অতি বিনয়ের প্রয়োজন নেই—মাটির ওপর বন্দুক নিয়ে দাঁড়ালে কোন শিকার আমার হাতে কখনও ফস্‌কায় না সত্যি, কিন্তু তাগ আমার যত বেশীই

হোক্, এই লাইট্-হাউসের ভৌতিক সমস্যা শুধু বন্দুকের তাগ দিয়ে কেমন ক'রে সমাধান হ'বে, ভেবে পেলাম না। তবু ডাক্তার বাবুর কথামত শিকারের সমস্ত সরঞ্জাম নিয়েই এসেছিলাম। সেগুলো এখন বোটে তোলা হ'চ্ছিল।

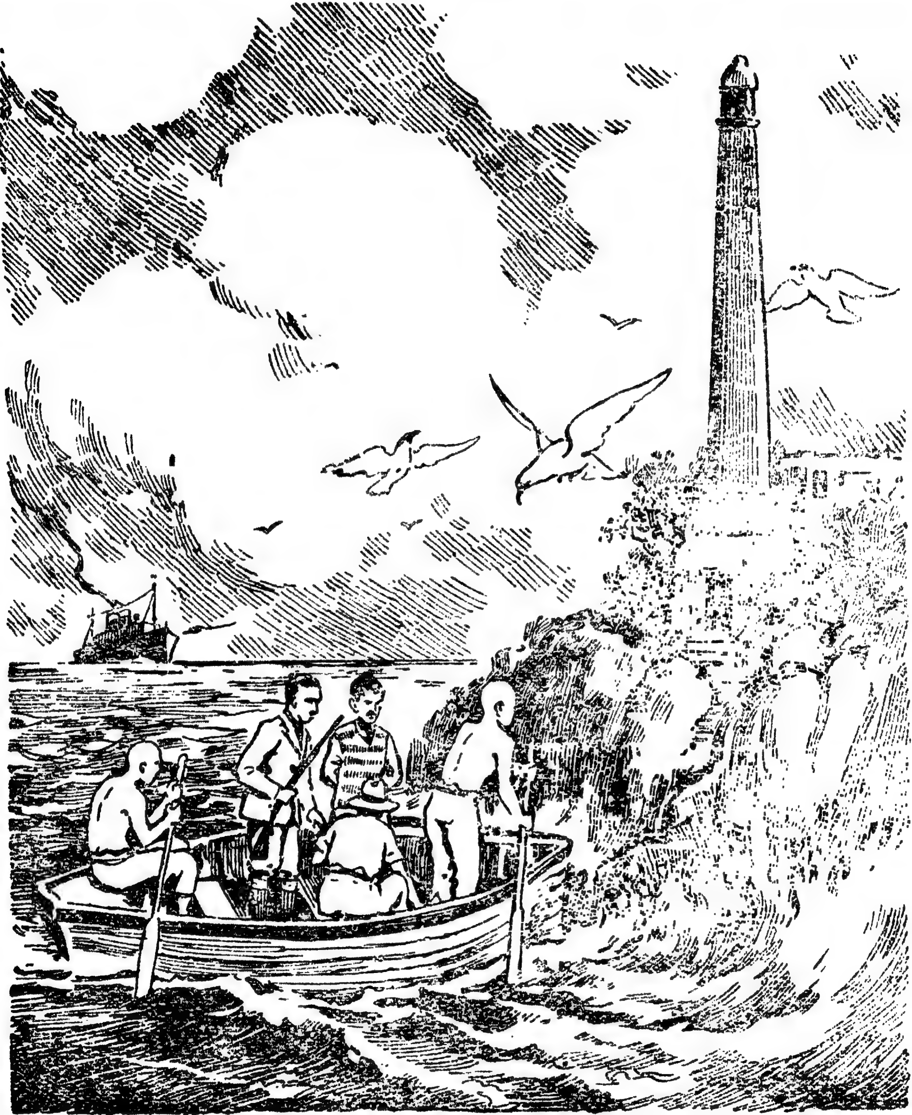
খানিক বাদেই বোট প্রস্তুত হ'ল। মাত্র দু'জন চীনে মাঝি নিয়ে আমরা তিনজনে বোটটিতে চেপে ব'স্‌লাম। দেখ্‌তে দেখ্‌তে যে জাহাজে আমরা এসেছিলাম, সেটা ধীরে ধীরে দূরে সরে গেল। দু'দিন বাদে আমাদের তদন্ত শেষ হ'লে আবার আমাদের এখান থেকে তুলে নিতে জাহাজটি আস্‌বে। এ দু'দিন আমাদের এই ভয়ঙ্কর লাইট্-হাউসে, সমস্ত পৃথিবী থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে বাস ক'র্‌তে হ'বে। যেখানে জাহাজ আমাদের ছেড়ে দিয়ে গেল, সেখান থেকে লাইট্-হাউস্‌টি মাত্র আধ মাইল। কিন্তু সেটুকু যেতে না যেতেই জাহাজ দূরে দিক্‌চক্রবালের কাছে একটি ছোট রেখার মত অস্পষ্ট হ'য়ে গেল। আর সকলের কথা জানি না, কিন্তু মণ্ডমুলেনের এই ভীষণ লাইট্-হাউসের রহস্যের কথা ভেবে আমার সত্যি এইবার আফ্‌শোষ হ'চ্ছিল। মনে হ'চ্ছিল, ডাক্তার বাবু ও মিঃ বার্ণ না হয় চাক্‌রী বজায় রাখ্‌তে এসেছেন কিন্তু আমার ঘরের খেয়ে এমন বনের মোষ তাড়াবার কি দরকার ছিল? যাই হোক্, তখন আর উপায় নেই।

সমুদ্রের ভেতর থেকে একটা ছোট পাহাড় মাথা ঠেলে উঠেছে, তারই ওপরে লাইট্-হাউস্‌টি তৈরী। আমরা যেদিকে গিয়ে নৌকো লাগালাম, সেদিক্ ছাড়া আর কোন দিকে নৌকো ভেড়াবার জায়গা নেই। এদিকের ঘাটটিও পাহাড় কেটে অতি কষ্টে তৈরী ক'র্‌তে হ'য়েছে। নৌকো থেকে নাম্‌তেই গোটা-কতক সামুদ্রিক পাখী চীৎকার ক'র্‌তে ক'র্‌তে আমাদের চারিপাশ দিয়ে উড়ে গেল। তাদের সেই কর্কশ চীৎকারে মনে হ'ল, যেন তারা আমাদের নাম্‌তে নিষেধ ক'র্‌ছে। তারা যেন কি ভয়ঙ্কর একটা বিপদের সম্ভাবনা সেই চীৎকারের দ্বারা জানিয়ে গেল।

লাইট্-হাউসের পাশেই ছোট একটি বাড়ী। ডাক্তারবাবুকে সাম্‌নে ক'রে আমরা বাকী চারজন সেখানে ঢুক্‌লাম। ঘর-দোর সব খা খাঁ ক'রছে, কোথাও কারো সাড়া-শব্দ নেই। শোবার ঘরে বিছানাটি পরিপাটি ক'রে পাতা, রান্নার ঘরে চারিধারে রান্নার আয়োজন ছড়ান, দেখ্‌লে মনে হয়, এই মাত্র যেন কে এ সব রেখে বাইরে গেছে, এখুনি আস্‌বে। কিন্তু তা সত্ত্বেও লাইট্-হাউসের কর্ম্মচারীটির কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না।

বাড়ীটির ভেতর ও বার ভালো ক'রে খুঁজে দেখ্‌বার পর আমাদের পরামর্শ-

সভা বস্‌ল। ডাক্তারবাবু বল্লেন—"যত রহস্যজনকই মনে হোক্, পৃথিবীর সব ব্যাপারেরই একটা সঙ্গত কারণ শেষ পর্য্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়। এই এতগুলো



আমরা যেদিকে গিয়ে নৌকো লাগালাম, সেদিক্ ছাড়া আর কোন দিকে নৌকো ভেড়াবার জায়গা নেই—১৭৪ পৃষ্ঠা

লোক যে অন্তর্হিত হ'য়ে গেছে, এটা কোন ভৌতিক ব্যাপার নয়। এর অত্যন্ত স্থূল একটা কারণ আছে—সেটা আমাদের খুঁজে বার ক'র্‌তেই হ'বে।"

ডাক্তারবাবুর কথায় আমার মন সে-সময় সম্পূর্ণ সায় দিয়েছিল, এ কথা বল্লে মিথ্যে বলা হ'বে। চীনে মাঝি দু'জন ত এর মধ্যেই ভয়ে একেবারে কাঠ হ'য়ে গেছল। মনে হ'ল, মিঃ বার্ণও যেন একটু হতভম্ব হ'য়ে গেছেন।

ডাক্তারবাবু তার পর বল্লেন, "এখনো লাইট্-হাউসের ওপরটা আমাদের খুঁজে দেখা হয় নি। সেখানে এ রহস্যের কোন সূত্র যদি খুঁজে না পাওয়া যায়, তখন আবার ব'সে আমরা ভবিষ্যৎ-কর্ত্তব্য ঠিক ক'র্‌ব।"

এবার মাঝি দু'জনকে নীচে রেখে আমরা তিনজনে লাইট্-হাউসের ভেতরে ঢুক্‌লাম। মনুমেণ্টের মত লাইট্-হাউসের চারিধারের দেয়াল ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হ'য়ে ওপরে উঠে গেছে, কিন্তু তার ওপরে ওঠার সিঁড়িটি মনুমেণ্টের মত সুবিধাজনক নয়। মাত্র একটি সরু লোহার সিঁড়ি খাড়া ভাবে সব ওপরের ঘর পর্য্যন্ত লাগান। সে সিঁড়ি দিয়ে অতি সন্তর্পণে এক একজন ক'রে ছাড়া ওঠা যায় না। হাত বা পা একবার ফস্‌কালেই একেবারে মৃত্যু। সেই সিঁড়ি দিয়ে পরের পর আমরা তিনজনে টর্চ্চ জ্বেলে ওপরে যে কি ভয়ে ভয়ে উঠলাম, ব'ল্‌তে পারি না। কোথায় যে কি ধরণের বিপদ্ অপেক্ষা ক'রে আছে, কিছুই জানি না। আমাদের আগে যারা এখানে প্রাণ হারিয়েছে, তাদের কথা স্মরণ ক'রে আমার অন্ততঃ প্রতি পদে হাত পা কাঁপ্‌ছিল। শেষ পর্য্যন্ত নিরাপদেই ওপরের ঘরে পৌঁছুলাম। ছোট্ট ঘর, তার চারিধারে বিরাট সার্চ্চলাইট্ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সমুদ্রের ওপর আলো ফেল্‌বার সরঞ্জাম। কিন্তু সে ঘরে কোন মানুষের কোন চিহ্ন নেই। ডাক্তারবাবু একটা সুইচ্ টিপ্‌তেই সার্চ্চ-লাইটের আলো জ্বলে উঠ্‌ল। আলোটা আবার সুইচ্ টিপে নিভিয়ে ডাক্তার বাবু বল্লেন, "না, সার্চ্চলাইট্ কিছু খারাপ হয় নি, শুধু জ্বাল্‌বার লোকের অভাবেই এতদিন আলো দেখা যায় নি।" সে ঘরে খানিক ঘুরে ফিরে কিছু না পেয়ে আমাদের নীচে নাম্‌তেই হ'ল। রহস্যটা ক্রমশঃ ঘনীভূত হ'য়ে উঠ্‌ছিল। নীচে নেই ওপরে নেই, তা'হলে এতগুলো লোক গেল কোথায়? তাদের অন্তর্দ্ধানের কারণ বুঝ্‌তে না পেরে ভয় আমাদের আরো বেশী বেড়ে যাচ্ছিল।

সমস্ত দিনের ভেতর ডাক্তার বাবু কোন কথাই আর বল্লেন না। মিঃ বার্ণ ও আমি ছোট পাহাড়টি কতবার যে মিছেমিছি প্রদক্ষিণ ক'র্‌লাম, তা ব'ল্‌তে পারি না। দু'জনের মনে একই চিন্তা, কিন্তু কেউ সে সম্বন্ধে কোন কথাই কারুকে ব'ল্‌তে পার্‌লাম না। সন্ধ্যের সময়েই খাওয়া-দাওয়া সেরে নেওয়া হ'ল। ডাক্তারবাবুর আদেশ— সন্ধ্যের পর ঘরের বাইরে কেউ বেরুতে পার্‌বে না। আমরা যে বেরুবার জন্যে বিশেষ ব্যগ্র ছিলাম, তাও নয়।

একটি ঘরে আমাদের তিনজনের ও তার পাশের ঘরে মাঝি দু'জনের শোবার আয়োজন হ'য়েছে ; মাঝের দরজা খোলাই আছে।

ডাক্তার বাবু ঘরের মধ্যে পায়চারী ক'রে বেড়াচ্ছেন। আমি আমার বন্দুকটা পরিষ্কার ক'র্‌তে ক'র্‌তে মিঃ বার্ণকে কম্বোজের বনের শিকারের গল্প ক'র্‌ছি। হঠাৎ ডাক্তার বাবু পায়চারী থামিয়ে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন—"মিঃ বার্ণ, তোমার সঙ্গে এই লাইট্-হাউস্ সংক্রান্ত সব কাগজপত্র এনেছ ত?"

মিঃ বার্ণ হঠাৎ এ প্রশ্নের কোন কারণ না বুঝ্‌তে পেরে একটু অবাক্ হ'য়ে বল্লেন—"হ্যাঁ, এনেছি, কিন্তু তা'তে কি হ'বে?"

ডাক্তারবাবু বল্লেন, "বার কর দেখি, একটু দেখ্‌ব!"

আমি ও বার্ণ পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'র্‌লাম! দু'জনেরই মনে হ'ল—'লোকটার, বোধ হয়, ভয়ে দুর্ভাবনায় মাথা খারাপ হয়ে গেছে। নইলে এত রাত্রে কাগজ-পত্র দেখে কি ক'র্‌বে?'

যাই হোক্, মিঃ বার্ণ তাঁর ব্যাগ খুলে কাগজপত্র বার ক'রে দিলেন। ডাক্তার বাবু তাঁর বিছানায় ব'সে সেগুলোর ওপর ঝুঁকে প'ড়ে তন্ময় হ'য়ে কি যে দেখ্‌লেন, বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। খানিক বাদে কিন্তু কাগজপত্র ফিরিয়ে দিয়ে তিনি বল্লেন, "মিঃ বার্ণ, শোবার আগে রিভল্‌ভারটা কাছে নিয়ে যেন শুতে ভুলো না।"

"সে আমার বালিশের তলায় আছে।"

ব্যস্, এর পর আর কোন কথা হ'ল না।

অনেক রাত পর্য্যন্ত শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাব্‌তে ভাব্‌তে মনের নিদারুণ ভয় সত্ত্বেও কখন্ যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, জানি না। হঠাৎ এক সময়ে খুট্ ক'রে কি একটা শব্দ শুনে জেগে উঠ্‌লাম। ঘরের ভেতর মিট্ মিট্ ক'রে আলো জ্বল্‌ছে, সেই আলোয় যা দেখ্‌লাম, তা'তে বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। চীনে মাঝিদের ঘরের একটি জানালা ডাক্তার বাবু নিঃশব্দে খুলে দিলেন। তারপর আমাদের ঘরের বাইরে যেতে বারণ করা সত্ত্বেও নিজে দরজা খুলে বাইরে বেরুলেন ; হাতে তাঁর একটা রিভল্‌ভার। অত্যন্ত সন্তর্পণে তিনি দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমিও বিছানায় উঠে বসলাম। এবার আমার ঠিক ধারণা হ'ল, তিনি ভয়ে-ভাবনায় পাগল হ'য়ে গেছেন। এই রাত্রে বাইরে গিয়ে তিনি কি কাণ্ড ক'রে বস্‌বেন, কে জানে? তাড়াতাড়ি পোষাক প'রে নিয়ে বন্দুকটা সঙ্গে ক'রে আমিও তাঁর খোঁজে বেরিয়ে প'ড়্‌লাম। বাইরের

অস্পষ্ট অন্ধকারে দেখ্‌লাম, তিনি লাইট্‌-হাউসের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। এই উন্মত্ত অবস্থায় তাঁকে দেখা দিলে হয়ত তিনি আমাকেই গুলি ক'রে ব'স্‌তে পারেন ভেবে, আমি সন্তর্পণে গা ঢাকা দিয়ে এমন এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালাম, যেখান থেকে আমি তাঁকে দেখ্‌তে পেলেও তিনি আমায় দেখ্‌তে পান না। খানিকক্ষণ এই ভাবে দাঁড়াবার পর তিনি আমাদের বাড়ীটার পেছন দিকে চল্‌তে সুরু ক'র্‌লে, আমিও দূর থেকে তাঁর পিছু নিলাম। একবার মনে হ'ল যে, মিঃ বার্ণকে জাগিয়ে সঙ্গে নিলে ভালো হ'ত—ছু'জনে মিলে এই উন্মাদের হাত থেকে রিভল্‌ভারটা সরিয়ে ফেলে তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনা যেত। একা আমি তা ক'রতে পার্‌ব, কি না, সন্দেহ। কিন্তু তখন মিঃ বার্ণকে জাগাবার আর সময় নেই।

হঠাৎ আমাদের বাড়ীর ভেতর থেকে একটা চাপা আর্ত্তনাদ শুন্‌তে পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার বাবুর রিভল্‌ভারের আওয়াজ। ছুটো আওয়াজ এম্‌নি ভাবে এক সঙ্গে হ'ল যে, কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে, তা পর্য্যন্ত আমি নির্ণয় কর্‌তে প'ার্‌লাম না। কিন্তু তখন আর দ্বিধা ক'রবার সময় নেই। ডাক্তার বাবু যে ক্ষেপে গেছেন, এ বিষয়ে তখন আমি একেবারে নিঃসন্দেহ। মনে হ'ল, তিনি হয়ত এর পর নিজের গায়েই গুলি ক'র্‌তে পারেন। সমস্ত ভয়-টয় বিসর্জ্জন দিয়ে দৌড়ে গিয়ে হাতের বন্দুকটা ফেলে তাকে পেছন থেকে দুহাত-শুদ্ধ জড়িয়ে ধর্‌লাম—রিভল্‌ভার যা'তে তিনি আর না ছুঁড়্‌তে পারেন। ডাক্তার বাবু প্রথমটা চম্‌কে উঠে বল্লেন, "কে ?" এবং পর মুহূর্ত্তেই হাত ছাড়াবার প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে বল্লেন, "ছাড়ো, ছাড়ো, পাগল না কি তুমি, পালিয়ে গেল যে !"

আমি তাঁকে আরো জোরে জড়িয়ে ধ'রে বল্লাম, "আপনি পাগল হ'য়েছেন, রিভল্‌ভার না ফেল্লে আপনাকে ছাড়্‌ব না।"

কিন্তু ডাক্তার বাবু বিপুল ধ্বস্তাধ্বস্তি ক'র্‌তে ক'র্‌তে ভয়ানক রেগে উঠে বল্লেন, "মুখ্যু উজ্‌বুক কোথাকার, পালিয়ে গেল যে, ছাড়ো।"

কিন্তু পাগলের কথা শুন্‌তে আমি রাজী নই, বল্লাম, "কেউ পালায় নি, শুধু আপনার মাথা খারাপ হ'য়েছে, রিভল্‌ভার ফেলে ঘরে চলুন !"

ডাক্তার বাবু কিন্তু এবার একটা প্রকাণ্ড ঝট্‌কানিতে আমায় মাটিতে ফেলে দিয়ে, প্রবল বেগে সাম্‌নে দৌড়ে গেলেন। আমি মাটিতে কাৎ হ'য়ে প'ড়ে গিয়েছিলাম, উঠে তাড়াতাড়ি বন্দুকটা তুলে নিয়ে আবার তাঁর পিছু পিছু দৌড়োলাম। কিন্তু বেশী দূর যেতে হ'ল না ; ডাক্তার বাবু কিছু দূরেই দাঁড়িয়ে সাম্‌নের দিকে পরের

পর রিভল্ভার ছুঁড়্ছেন। সেখানে পৌঁছোতেই ডাক্তার বাবুকে ধরার চিন্তা আমার মাথা থেকে কর্পূরের মত উবে গেল।

আমিও তখন দেখ্তে পেয়েছি। বন্দুকটা বাগিয়ে ধ'রে ডাক্তার বাবুর সঙ্গে গুলি ক'র্লাম......

বন্দুকের শব্দে তখন মিঃ বার্ণ জেগে বেরিয়ে এসেছেন, তাঁর পেছনে, তু'জন চীনে খালাসী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপ্ছে। ডাক্তার বাবুর সঙ্গে আমি নিঃশব্দে এসে ঘরে ঢুক্লাম। ডাক্তার বাবুকে পাগল ভেবে ধর্বার জন্যে লজ্জায় তখন আমি মাথা তুল্তে পার্ছি না। ডাক্তার বাবু নিজে থেকেই আমার পিঠ চাপ্ড়ে বল্লেন, "তোমার দোষ নেই, তবে আর একটু হ'লে সব মাটি হ'য়ে যেত।"

মিঃ বার্ণ তখনও কিছু বুঝ্তে পারেন নি; কৌতূহলী হ'য়ে ডাক্তার বাবুর মুখের দিকে তাকাতেই তিনি বল্লেন—"এবার থেকে মণ্ডমুলেনের লাইট্-হাউসের আলো আর কখনও নিভ্বে না!"

"কিন্তু ব্যাপার কি?" মিঃ বার্ণ জিজ্ঞাসা ক'রলেন।

চীনে মাঝিদের আলো সঙ্গে নিতে ব'লে ডাক্তার বাবু বল্লেন, "চলুন, দেখাচ্ছি।" সেখানে গিয়ে পৌঁছোতেই চীনে মাঝিদের সঙ্গে মিঃ বার্ণও অস্ফুট চীৎকার ক'রে উঠ্লেন। সাম্নে বিশালকায় বোড়া-সাপটার মৃতদেহ কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে। তার মাথাটা বন্দুক ও রিভলভারের গুলিতে একেবারে ছিন্ন-ভিন্ন হ'য়ে গেছে। ডাক্তার বাবু সেই দিকে দেখিয়ে বল্লেন—"এরি পেটে মণ্ডমুলেনের লাইট্-হাউসের গুটি আষ্টেক প্রাণীর দেহ হজম হ'য়ে গেছে! এত বড় বোড়া-সাপ কোন মিউজিয়মেও আছে কিনা সন্দেহ;—আমি দেখি নি।"

ঘরে ফিরে এসে আমাদের প্রশ্নের উত্তরে ডাক্তার বাবু সব ব্যাপার খুলে বল্লেন।

বল্লেন, "কেন তোমার কাছে লাইট্-হাউস্ সংক্রান্ত কাগজ দেখ্তে চেয়েছিলাম, জান? তোমরা জান বোধ হয় যে, এ সমস্ত ব্যাপার ঘট্বার আগেই একটি জাহাজ এখানে ঝড়ে ডুবে যায়—সেই জাহাজ-ডুবির পরেই যে সব ঘটনা ঘটেছে, সেগুলির সঙ্গে জাহাজ-ডুবির কোন একটা সম্পর্ক আছে ব'লে আমার সন্দেহ হয়। তোমার কাছে কাগজ-পত্র চেয়ে নিয়ে প'ড়ে আমার সে সন্দেহ দূর হয়। তোমার কাগজ-পত্র প'ড়ে জান্তে পার্লাম, যে জাহাজটি ডুবে যায়, সেটি 'হু' বন্দর থেকে লণ্ডনের চিড়িয়াখানার জন্যে কম্বোজের জঙ্গলের কয়েকটি জ্যান্ত প্রাণী নিয়ে যাচ্ছিল। তালিকার ভেতর ছোট খাট কয়েকটি জানোয়ার, একটি চিতা, একটি

বড় বোড়া-সাপ ইত্যাদি ছিল। এটা প'ড়েই আমার সন্দেহ হয় যে, সেই বোড়া-সাপটি সেই জাহাজের সঙ্গে ডোবে নি, কোন রকমে সাঁত্‌রে এই পাহাড়ে এসে উঠেছে এবং ক্ষুধার জ্বালায় শেষ পর্য্যন্ত এখানকার অধিবাসীদের গ্রাস ক'রেছে। আর কোন জানোয়ারের হাতে ম'র্‌লে মানুষগুলোর হাড়-মাংসের কিছু চিহ্ন পাওয়া যেত, কিন্তু বোড়া-সাপ সমস্তটাই গিলে খায়,—চিহ্ন রাখে না। যাই হোক্, এ আমার তখন সন্দেহ হয় মাত্র। এ সন্দেহ ঠিক্ কি না, না জান্‌তে পারা পর্য্যন্ত



সাম্‌নে বিশালকায় বোড়া-সাপটার মৃতদেহ কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে।

তোমাদের জানাতে সাহস করি না, ভয় হয় তোমরা পাছে মনে মনে হাস। আমরা আসার পর বোড়া-সাপটি একবার আক্রমণ ক'র্‌তে আস্‌বেন জেনেই, আমি কাউকে না জানিয়ে রাত্তিরে একলা পাহারা দিতে বেরোই, এবং সাপটিকে লোভ দেখাবার জন্যে নিজে থেকে চীনে মাঝিদের একটা জানালা যাবার আগে খুলে রেখে যাই। চীনে মাঝি সেই জানালায় সাপের মাথাটা গলাতে দেখেই ভয়ে চীৎকার ক'রে ওঠে। কিন্তু আমি সেই সুযোগটির জন্যেই কাছে অপেক্ষা ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলাম—সেই মুহূর্ত্তেই অমনি গুলি করি। আমায় পাগল ভেবে সুরেশ জড়িয়ে না ধ'র্‌লে সেই-

খানেই আমি ওটাকে শেষ ক'র্‌তে পার্‌তাম। সুরেশ যে রকম জোরে আমায় জাপ্‌টে ধ'রেছিল, আর কিছুক্ষণ সে রকম ধ'রে রাখতে পারলেই সাপটা বেমালুম সরে প'ড়ত। এই পাহাড়ে এত গোপন ফোকর আছে যে, তার পর আর তাকে খুঁজে পাওয়া এক রকম অসম্ভব হ'ত।"

আমি লজ্জিত হ'য়ে বল্লাম—"আমি বুঝতে পারি নি।" ডাক্তার বাবু হেসে আমার পিঠ চাপ্‌ড়ে বল্লেন, "যাক্, তুমি শেষ রক্ষা ক'রেছ, তোমার অব্যর্থ গুলিতেই সাপটার মাথা ফুটো হ'য়ে গেছে।"

—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

পুণ্যের হিসাব

রাজা বিক্রমাদিত্য একদিন সভায় বসিয়া সকলকে এই প্রশ্ন করিলেন, "আমি কোন্ পুণ্যফলে পৃথিবীর রাজা হইয়াছি?" রাজমন্ত্রী, উজীর, নাজির কেহই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। এমন কি, রাজার নবরত্নের পণ্ডিতেরাও চুপ করিয়া রহিলেন। তখন রাজা দেশ-বিদেশে ঢেঁড়া পিটাইয়া দিলেন যে, 'যে এই কথার উত্তর দিতে পারিবে, তাহাকে আমি পঞ্চাশ হাজার মোহর পুরস্কার দিব।' কিন্তু সপ্তাহ গেল, মাস গেল, বছরও যায় যায়, তবুও রাজা তাঁহার প্রশ্নের কোন উত্তর পাইলেন না।

সেই দেশে এক গরীব ব্রাহ্মণ ছিল ; ভিক্ষা করিয়া কোনমতে সে দিন কাটাইত। ব্রাহ্মণ আর তাহার স্ত্রী, পরিবারে এই দু'টিমাত্র প্রাণী—তাহারা বড় দুঃখী। রাজার ঘোষণার কথা ব্রাহ্মণীও শুনিয়াছিল। সে একদিন তাহার স্বামীকে বলিল, "ওগো! আর ত আধপেটা খেয়ে খেয়ে দিন চলে না,—যাও না একবার রাজ-বাড়ীতে। গিয়ে বল যে, তুমি রাজার প্রশ্নের উত্তর দিতে পার্‌বে।" ব্রাহ্মণ বলিল, "ব্রাহ্মণি! তুমি কি ক্ষেপেছ? কত মহা মহা পণ্ডিত যে কথার উত্তর দিতে পার্‌লেন না, আমি মূর্খ ব্রাহ্মণ কি ক'রে উত্তর দেব!"

ব্রাহ্মণী বলিল, "আচ্ছা, একবার গিয়ে বলই না যে, তুমি পার্‌বে। তারপর সাত দিনের সময় চেয়ে নিও। বোলো যে, 'মহারাজ, আমি নিতান্ত গরীব, খেতে পাই না। যাতে এই সাতদিন পেটে খেয়ে বেঁচে থাকি, তার ব্যবস্থা করুন'। রাজা

নিশ্চয়ই তোমাকে বিশ্বাস ক'রে টাকা দেবেন, আমরাও ক'দিন সুখে কাটাতে পার্‌বো। তার পর যা হয় দেখা যাবে।"

ব্রাহ্মণীর পরামর্শমত ব্রাহ্মণ বিক্রমাদিত্যের সভায় গিয়া সব কথা বলিল। রাজা তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া সাত দিনের সময় দিলেন, কিছু টাকাও দিলেন। টাকা লইয়া ব্রাহ্মণ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে ব্রাহ্মণী ত মহা খুসী! ব্রাহ্মণের কিন্তু বড়ই ভাবনা হইল। সাত দিনের সময় লইয়া টাকা আনিয়াছে, এখন ত আর ফাঁকি দিলে চলিবে না! ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মণ গৃহ ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল। এখানে সেখানে ঘুরিয়া একদিন দুপুর রৌদ্রে সে এক মাঠে গিয়া উপস্থিত। বেজায় গরম, বাতাসের লেশমাত্র নাই—গাছের একটি পাতাও নড়ে না। শ্রান্ত-ক্লান্ত ব্রাহ্মণ মাঠের মাঝখানে একটা বটগাছ দেখিতে পাইয়া তাহার ছায়ায় গিয়া বসিল। সেখানে বসিয়াও তাহার ভাবনা গেল না। উপরের দিকে চাহিয়া ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ দেখিতে পাইল যে, গাছের একটা উঁচু ডালের তিনটি পাতা খুব নড়িতেছে। চারিদিকে কোথাও কিছু নড়ে না, সব স্থির, শুধু ঐ একটা ডালের তিনটি পাতা নড়িতেছে—এটা কেমনতর কথা! ব্রাহ্মণের সন্দেহ হইল। তখন খুব মন দিয়া লক্ষ্য করিতে করিতে সে দেখিল যে, তিন জন বিকটাকৃতি মানুষ সেই তিনটি পাতার উপর বসিয়া আছে।

গরীব হইলেও ব্রাহ্মণের সাহস ছিল খুব বেশী। সে তখনই জিজ্ঞাসা করিল—"তোমরা কে হে বাপু?" তাহাদের একজন বলিল—"আমরা যমদূত।" ব্রাহ্মণ—"ওখানে ব'সে কি ক'র্‌ছ?"

বটগাছের কাছেই একটা লোক ক্ষেতে হাল দিতেছিল; তাহাকে দেখাইয়া অপর একজন বলিল—"ঐ লোকটাকে নিতে এসেছি।"

ব্রাহ্মণ। সুস্থ সবল লোকটা ক্ষেতে হাল দিচ্ছে, তাকে নিতে এসেছ কি রকম? সে ত মরে নি!

যমদূত। আরে ঠাকুর, ব্যস্ত হও কেন? দেখ্‌বে অখন। লোকটা যখন হাল চালিয়ে ক্ষেতের এ পাশে আস্‌বে, তখনই ধাঁ ক'রে আমাদের একজন তার সাম্‌নে বেণাবন হ'য়ে প'ড়্‌বে এবং আর একজন কেউটে সাপ হ'য়ে সেই বন থেকে বেরিয়েই তাকে কামড়াবে। তখন আমি তার আত্মাটা নিয়ে যমরাজের কাছে চলে যাব। দূতের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের ত চক্ষুস্থির!

তার পর চাষা যখন হাল চালাইয়া ক্রমে ক্ষেতের এ পাশে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন সত্য সত্যই তাহার সম্মুখে একটা বেণাবন দেখা দিল। সেই বন হইতে

একটা কেউটে সাপ বাহির হইয়াই কৃষকের পায়ে এক ছোবল্ আর তখনই তাহার মৃত্যু!

তৃতীয় যমদূত চাষার আত্মাটা লইয়া যখন যমরাজের কাছে চলিল, তখন ব্রাহ্মণ যোড়হস্তে অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া বলিল, "ভাই, আমার একটি অনুরোধ—দোহাই তোমার! যমরাজকে জিজ্ঞেস কোরো, তিনি যদি দয়া ক'রে আমাকে একবার যমপুরীতে যাবার অনুমতি দেন! আমি তাঁকে শুধু একটিমাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞেস ক'রেই চ'লে আস্‌ব।" ব্রাহ্মণের কথায় রাজী হইয়া দূত চাষার আত্মা লইয়া চলিয়া গেল।

দূত যমপুরীতে গিয়া ব্রাহ্মণের অনুরোধ জানাইবামাত্র যমরাজ মহা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,—"রক্ষে কর, বাবা! এখানে আর জ্যান্ত মানুষ এনে কাজ নেই। জ্যান্ত মানুষ এনে একবার যা নাকালটা হয়েছিলাম, সে কথা জন্মেও আমি ভুল্‌ব না—অমন আহাম্মুকি আর কি করি!"

একথা শুনিয়া দূত বলিল, "কেন মহারাজ! ব্যাপারটা কি হ'য়েছিল? কই, আমি ত কিছু শুনি নি!"

যমরাজ। আরে বাপু, সে অনেক কালের কথা, তখন তুমি আমার কাজে বহাল হও নি। ব্যাপারটা কি হ'য়েছিল, জান? অনেক দিন আগে একবার আমার মা পৃথিবীতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে দেখ্‌লেন, রাস্তা দিয়ে একটা হাতী যাচ্ছে। হাতীটা চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে যখনই দুষ্টুমি ক'র্‌ছিল, তখনই মাহুতের অঙ্কুশের এক ঘা; আর ঘা খেয়েই সে যেন নেহাৎ ভালমানুষটি! সেই দেখে মা বল্লেন, 'আরে বোকা হাতী! পাহাড়ের মত তোর দেহটা,আর তোর গায়ে এত জোর—তবু কি না তুই সামান্য একটা মানুষের ভয়ে কাতর হ'স্!' মায়ের কথা শুনে হাতী ব'ল্‌লে, 'আরে যমের মা বুড়ী! মানুষকে তুমি সামান্য বল্‌বে বৈ কি, তোমার ছেলে কি না মরা মানুষ নিয়ে কারবার করে! একবার জ্যান্ত মানুষের পাল্লায় প'ড়্‌লে মজাটা টের পেতে!'

হাতীর কথা শুনে মা বড় অপমান বোধ ক'র্‌লেন এবং আমার কাছে এসে নালিশ ক'র্‌লেন। আমি তাঁকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে বল্লাম, 'আচ্ছা মা! একটা জ্যান্ত মানুষ যমপুরীতে এনে একবার দেখ্‌ব, তাকে জব্দ ক'র্‌তে পারি, কি না।' এই ব'লে তখনই কয়েকজন বাছা বাছা সর্দ্দারকে হুকুম ক'র্‌লাম, 'যাও ত, একটা জ্যান্ত মানুষ ধ'রে নিয়ে এস।'

তারা ত বেরিয়ে প'ড়্‌লো, কিন্তু পৃথিবীতে গিয়ে বেচারাদের নাকালের একশেষ! হাটে, মাঠে, বাজারে যেখানে লোকের সঙ্গে দেখা, আমার হুকুমের

কথা ব'ল্‌বামাত্র, সেইখানেই তাদের ভাগ্যে বেদম প্রহার! সবাই বলে, 'হতভাগা ব্যাটারা! মরি নি, তবু যমপুরীতে যেতে ব'ল্‌ছে!' মার খেতে খেতে তাদের হাড় নড়ে গেল, গায়ে ব্যথা ধ'র্‌লো। তখন একজন ব'ল্‌লে, 'চুলোয় যাক্ গিয়ে জ্যান্ত মানুষ! যত সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড! মরা নিয়ে যাদের কারবার, তাদের কেন জ্যান্ত মানুষ নেওয়া পোষাবে? চল ভাই, আর কাজ নেই, ঢের গুঁতো খেয়েছি, এখন ফিরে চল!'

ফেরবার পথে তারা দেখ্‌লে, এক কৃষক তার বাড়ীর সাম্‌নে একটা গাছের ছায়ায় খাটিয়া পেতে শুয়ে, নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। আর বলা-কওয়া নেই, তখনই ধরাধরি ক'রে খাটিয়া-শুদ্ধ কৃষককে নিয়ে রওনা।

খানিক পরে ঝাঁকানির চোটে লোকটার গেল ঘুম ভেঙ্গে। সে জিজ্ঞেস্ ক'র্‌লে, 'কে রে তোরা? আমাকে কোথা নিয়ে যাচ্ছিস্?' সর্দ্দার ব'ল্‌লে, 'চটো কেন, দাদা? যমরাজ একটা জ্যান্ত মানুষ দেখ্‌তে চান, তাই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। তা তোমার যদি সেখানে যেতে আপত্তি থাকে, বল?'

কৃষক। যেতে আমার বিশেষ কিছু আপত্তি নেই, তবে কি না যমরাজ যখন সিংহাসন ছেড়ে বাড়ীর ভেতরে যাবেন, ঠিক সেই সময় তোমরা আমাকে পুরীর ভেতর নিয়ে যাবে—এইটি যদি প্রতিজ্ঞা ক'রে বলো, তবেই আমি যেতে রাজী আছি।

এতটা সহজে কৃষক যে সম্মত হবে, কেউ তা স্বপ্নেও ভাবে নি! সুতরাং তারা তখনই প্রতিজ্ঞা ক'রে বস্‌লো।

তার-পর যে সময় আমি বাড়ীর ভেতর বিশ্রাম করি, তারা ঠিক সেই সময় কৃষককে নিয়ে যমপুরীতে উপস্থিত হ'ল। ভেতরে ঢুকে কৃষক যেই দেখ্‌লে সিংহাসন শূন্য, অমনি চক্ষের পলকে এক লাফে ঠিক তার ওপরে! সিংহাসনে যে চড়ে, সে-ই রাজা; তখন সকলেই তার হুকুম মান্‌তে বাধ্য। কৃষক রাজা হ'য়েই হুকুম ক'র্‌লে, 'কে আছিস্, নিয়ে আয় পাপ-পুণ্যের হিসেবের খাতা!' হুকুম মাত্র এক সর্দ্দার খাতা নিয়ে হাজির। খাতার মধ্যে কৃষক নিজের হাতে তার নাম লিখে, সেই নামের পাশে বড় বড় অক্ষরে পৃথিবীর সমস্ত পুণ্যকাজের লিষ্টি লিখ্‌লে। তার পর হুকুম ক'র্‌লে, 'নিয়ে আয় যমকে হাত-পা বেঁধে।'

বাইরে এত সব ব্যাপার, আমি কিছুই টের পাই নি। একজন সর্দ্দার কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে আমাকে গিয়ে ব'ল্‌লে, 'মহারাজ, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। একটা জ্যান্ত মানুষ ধরে এনেছিলাম, সে ত এসে শূন্য সিংহাসন দেখেই তার ওপর চ'ড়ে ব'সে রাজা হ'য়ে হুকুম চালাতে আরম্ভ ক'রেছে! পাপ-পুণ্যের খাতা আনিয়ে তাতে নিজের

নাম লিখে, তার পাশে এই বড় পুণ্যের ফর্দ্দ! শুধু তাই নয়, এখন আবার হুকুম ক'রেছে—নিয়ে আয় যমকে বেঁধে। মহারাজ, কি উপায় হবে?'

উপায়—মাথা আর মুণ্ডু! সংবাদ পেয়ে ভয়ে আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। আমি এক ছুটে পিতামহ ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত হ'লাম। হাঁপাতে হাঁপাতে বিপদের কথা সব জানিয়ে, তাঁর পা জড়িয়ে ধ'রে বল্লাম, 'দোহাই, পিতামহ ঠাকুর! যমপুরীতে জ্যান্ত মানুষ এনে বোকামী ক'রেছি, এখন এ বিপদ্ থেকে উদ্ধার করুন!



কৃষক নিজের হাতে......পুণ্যকাজের লিষ্টি লিখ্‌লে

আমার কথা শুনে ব্রহ্মার মুখ গম্ভীর হ'য়ে গেল; বল্লেন,—'তাই ত, এখন উপায়? আমার দ্বারা ত এর কোন প্রতিকার হবে না—শীগ্‌গির চল, বিষ্ণুর কাছে যাই।'

ব্রহ্মা আমাকে নিয়ে বিষ্ণুর কাছে গেলেন। সমস্ত ঘটনা শুনে বিষ্ণু বল্লেন,—'বিপদ্ ত নেহাৎ সহজ নয় দেখ্‌ছি! লোকটা শিবের ভক্ত, ও কি সহজে আমার কথা শুন্‌বে? চল তা হ'লে একবার শিবের কাছে যাই।'

সেখানে গেলে শিব ত চ'টেই লাল! আমাকে খুব গালাগালি দিয়ে বল্লেন,—'কেন হে বাপু! তোমার দুর্ব্বুদ্ধি হ'ল কেন? মরা মানুষের সঙ্গে তোমার কারবার, তুমি কেন আবার জ্যান্ত মানুষ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি ক'র্‌তে গিয়েছিলে? তোমার যেমন কাজ, এখন তার ফল ভোগ কর।'

তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু দুই জনে মিলে শিবকে অনেক স্তুতি-মিনতি ক'র্‌লে পর, শিব বল্লেন—'আচ্ছা, তবে চল যাই, দেখি এর কোন উপায় ক'র্‌তে পারি কি না?'

পথে যেতে যেতে মহাদেব আমাকে বল্লেন,—'দেখ যম, তুমি এক কাজ ক'রো। আমরা যমপুরীতে গেলেই কৃষক আমাদের দেখে সিংহাসন ছেড়ে এসে মাটিতে লম্বা হ'য়ে প্রণাম ক'র্‌বে। সেই মুহূর্ত্তে তুমি চট্ ক'রে গিয়ে সিংহাসনে ব'সে প'ড়ো। সাবধান! ভুলে যদি যাও, তবে কিন্তু আর উপায় নেই!'

এর পর আমরা যেই পুরীতে উপস্থিত হ'য়েছি, অমনি কৃষক তাড়াতাড়ি উঠে এসে সাষ্টাঙ্গে এক প্রণাম। এমন সুযোগ কে ছাড়ে! আমিও সেই মুহূর্ত্তে সিংহাসন দখল ক'রে ব'স্‌লাম। ব্যাপার দেখে কৃষকের মুখখানা একেবারে চূণ।

আমি মহাদেবকে জিজ্ঞেস্ ক'র্‌লাম—'এ লোকটা পাপ-পুণ্যের খাতায় নিজের নাম লিখে, সেই নামের পাশে মস্ত বড় পুণ্যের লিষ্টি লিখে রেখেছে এর কি উপায় হবে?'

মহাদেব ব'ল্লেন—'উপায় আর কি? সে যখন তার নামের পাশে পুণ্যের লিষ্টি লিখেছে, তখন সে লিষ্টি পূরণ ক'রে দিতেই হবে। এক কাজ করা যাক্—আমার কিছু পুণ্য আমি দেব, ব্রহ্মা, বিষ্ণুও তাঁদের পুণ্যের কিছু কিছু ভাগ দিন। আর যমরাজ, তুমিও তোমার কিছু পুণ্য দাও। এইরূপে কৃষকের লিষ্টি পূরণ কর—তা ছাড়া আর উপায় নেই।'

শিবের কথা অমান্য করে কার সাধ্য! কাজেই, সেই রূপে কৃষকের পুণ্যের লিষ্টি পূরণ ক'রে দেওয়া হ'ল। এখন বুঝ্‌তে পার্‌লে ত, কেন আমি জ্যান্ত মানুষ যমপুরীতে আনার নামে এতটা আপত্তি ক'র্‌ছি?

গল্পটি শুনিয়া দূত বলিল,—"মহারাজ, এ ক্ষেত্রে সে রকম ভয়ের কোন কারণ নেই। ব্রাহ্মণ এসে আপনাকে কেবল একটিমাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞেস্ ক'রবে, তার পরই আমি তাকে রেখে আস্‌বো। দোহাই মহারাজ! ব্রাহ্মণের অনুরোধ রক্ষে করুন। এর জন্যে আমি দায়ী রইলাম।"

যমরাজ দেখিলেন, দূত কিছুতেই ছাড়ে না। বলিলেন, "আচ্ছা, তাকে নিয়ে এস, কিন্তু খবরদার! আমি যখন সিংহাসনে ব'সে থাক্‌বো, ঠিক সেই সময়ে আন্‌তে হবে!"

"যে আজ্ঞে মহারাজ!" বলিয়া দূত তখনই চলিয়া গেল। খানিক পরেই সে ব্রাহ্মণকে লইয়া উপস্থিত। যমরাজকে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণ বলিল, "প্রভু! রাজা বিক্রমাদিত্য কোন্ পুণ্যফলে পৃথিবীর রাজা হয়েছেন, অনুগ্রহ ক'রে এর উত্তর ব'লে দিন?"

যমরাজ বলিলেন,—"আমি ত বাপু এ প্রশ্নের উত্তর তোমায় বল্‌তে পারি না। তবে কি না যে এর উত্তর জানে, আমি তোমাকে তার সন্ধান বলে দিচ্ছি।—রাজবাড়ীর নিকটেই এক কলু থাকে, তার ঘানিতে একটা কাণা গরু আছে। বিক্রমাদিত্য যদি রাত দুপুরের সময় সেই গরুকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস্ করেন, তা হ'লেই ঠিক উত্তর পাবেন।"

ইহার পর দূত ব্রাহ্মণকে আবার সেই বটগাছের নীচে রাখিয়া আসিল।

ব্রাহ্মণ তখনই চলিল বিক্রমাদিত্যের সভায়। এদিকে সাত দিন পার হইয়া গিয়াছে, তবুও ব্রাহ্মণের উদ্দেশ নাই দেখিয়া রাজা ভাবিতেছিলেন, "তাই ত! লোকটা কি তবে ফাঁকি দিল!" এমন সময় হঠাৎ ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে দেখিয়া রাজা ভারী খুসি হইয়া বলিলেন,—"কি ঠাকুর! আমার প্রশ্নের উত্তর কই?" ব্রাহ্মণ বলিল, "মহারাজ! সাতদিন পার হ'য়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু আমি প্রশ্নের উত্তর ঠিক ক'রে এসেছি। রাজবাড়ীর পাশেই যে কলু থাকে, আজ রাত দুপুরের সময় তার বাড়ীতে গিয়ে আপনি তার ঘানির কাণা গরুটাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস্ ক'র্‌বেন, তা হ'লেই উত্তর পাবেন।"

দুপুর রাত্রে বিক্রমাদিত্য কলুর বাড়ী গিয়া গরুটাকে প্রশ্ন করিবামাত্র সে ত ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। খুব খানিকক্ষণ কাঁদিয়া বলিল,—"মহারাজ! আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পার্‌বো না। রাজবাড়ীর সাম্‌নে প্রায় এক মাইল দূরে একটা বটগাছ আছে, সেই গাছের ডালে মাথা নীচের দিকে ক'রে একটা পেত্নী ঝুলে থাকে। সন্ধ্যার পর সেখানে গিয়ে সেই পেত্নীকে জিজ্ঞেস্ ক'রলেই আপনার প্রশ্নের উত্তর পাবেন।"

পরদিন সন্ধ্যার পর বিক্রমাদিত্য সেই বটগাছের তলায় গিয়া দেখিলেন, বাস্তবিকই একটা পেত্নী মাথা নীচের দিকে করিয়া ঝুলিয়া আছে। রাজা তাহাকে প্রশ্ন করিলে, সে বলিল,—"মহারাজ! আমি জানি বটে, কিন্তু ব'ল্‌তে পার্‌বো না। আপনার সভায় বররুচি নামে যে পণ্ডিত আছেন, তাঁর ছোট মেয়েকে গিয়ে জিজ্ঞেস্ করুন, সে-ই ঠিক উত্তর দেবে।"

রাজা বাড়ী ফিরিয়া বররুচিকে সব কথা বলিলেন! রাজার কথা শুনিয়া

পণ্ডিতের বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইল। তাঁহার মেয়ে যে প্রশ্নের উত্তর জানে, সেটা তাঁহার বিশ্বাসই হইল না। যাহা হউক, বাড়ীতে গিয়া মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিলে পর সে বলিল'—"হ্যাঁ বাবা! রাজা ঠিক কথাই বলেছেন—আমি তাঁর প্রশ্নের উত্তর জানি। আচ্ছা, চলুন তবে রাজার কাছে গিয়েই সব কথা খুলে বল্‌ছি।"

বররুচি মেয়েকে রাজার নিকট লইয়া গেলে পর, রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হ্যাঁ মা, তুমি না কি আমার প্রশ্নের উত্তর জান?" মেয়েটি বলিল,—"জানি মহারাজ! তবে শুনুন—

"অনেক দিন আগে খুব গরীব এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রাহ্মণ, তাঁর স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূ—এই চারজন নিয়ে তাঁর পরিবার। প্রতিদিন ব'ল্‌তে গেলে এক রকম অনাহারেই তাঁদের দিন কাট্‌তো। ভিক্ষে ক'রে প্রায়ই কিছু পেতেন না, যদি বা কখনো কিছু পেতেন, তাও এত সামান্য যে, তাতে ভাল করে তাঁদের খিদেই দূর হ'তো না। এক সময়ে তাঁদের এমনি দুরবস্থা হ'লো যে, ক্রমাগত পাঁচ দিন উপোস ক'রে রইলেন, একমুঠো চালও সংগ্রহ ক'র্‌তে পার্‌লেন না। ষষ্ঠ দিনে ভগবানের কৃপায় কিছু খাদ্যের যোগাড় হ'লো। ব্রাহ্মণী রান্না ক'রে ভাত চার ভাগ কর্‌লেন। তারপর সকলে খেতে বস্‌বেন, এমন সময় হঠাৎ এক অতিথি এসে উপস্থিত। অতিথি সাত দিন অনাহারে, গা তার ঠক্‌ঠক্‌ ক'রে কাঁপ্‌ছে, মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। অতিথি অতি কষ্টে অনেক মিনতি ক'রে বল্‌লে,—'দোহাই বাবা! আমি সাত দিন খেতে পাই নি, দয়া ক'রে আমাকে দুটি খেতে দেও।'

অতিথির কষ্ট দেখে ব্রাহ্মণের দয়া হ'লো। তিনি ব্রাহ্মণীকে বল্লেন,—'আমরা পাঁচ দিন খাই নি আর এই বেচারি সাত দিন ধরে উপবাসী। শুধু আমার ভাগ দিলে ওর কিছুই হবে না। ব্রাহ্মণি! তোমার ভাগটাও দেও। দুজনের ভাগ খেলে লোকটা বেঁচে যাবে।'

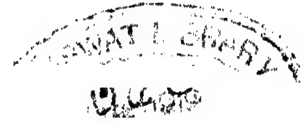
ব্রাহ্মণী গেলেন চটে! বল্লেন,—'পাঁচ দিন পরে এক মুঠো খেতে বস্‌ছি, তাও বল্‌ছ কি না অতিথিকে দেও! দিতে হয়, তোমার ভাগ দেও গিয়ে, আমার ভাগ আমি দেব না। অতিথি মরে মরুক্—নিজের প্রাণটা ত আগে বাঁচাই।' এই ব'লে ব্রাহ্মণী খেতে আরম্ভ করলেন। ব্রাহ্মণ পুত্রের ভাগ চাইলেন, কিন্তু সেও তা দিতে অস্বীকার কর্‌লে। তখন নিরুপায় হ'য়ে পুত্রবধূকে বল্লেন,—'মা! তা হ'লে তোমার ভাগটাই দেও।'

পুত্রবধূ নিতান্ত ছেলেমানুষ ছিল বটে, কিন্তু অতিথি সৎকার না ক'র্‌লে শ্বশুরের পাপ হবে, এটা বেশ জান্‌তো। তাই, সে খুসী হ'য়ে তার ভাগটা দিলে। ব্রাহ্মণ

তাঁর নিজের ভাগ আর পুত্রবধূর ভাগ দিয়ে অতিথিকে পেট ভ'রে খাওয়ালেন।"

গল্পটি শেষ করিয়া বররুচির কন্যা বলিল, "মহারাজ! সেই ব্রাহ্মণ হচ্ছেন আপনি—নিজে উপবাসী থেকে অতিথি-সৎকার ক'রে যে পুণ্যসঞ্চয় করেছিলেন, সেই পুণ্যের বলে এখন আপনি পৃথিবীর রাজা বিক্রমাদিত্য হয়েছেন। বট-গাছের পেত্নী হচ্ছে—আপনার স্ত্রী সেই ব্রাহ্মণী। কলুর একচক্ষু গরুটি হচ্ছে—আপনার পুত্র। আর আমি হচ্ছি আপনার পূর্ব্বজন্মের সেই পুত্রবধূ।"

—কুলদারঞ্জন রায়



ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়

বৃটিশ শাসন তখনও দেশে বদ্ধমূল হয় নাই। যাতায়াতের পথ সকল ঘোর বিপদ্-সঙ্কুল ও বর্গী, ঠ্যাঙাড়ে, জলদস্যু প্রভৃতিতে ভর্ত্তি থাকিত। এই ডাকাতের দল প্রায়ই গোয়ালা, বাগ্দী, বাউরী শ্রেণীর লোক। তাহারা অত্যন্ত বলবান্—লাঠি এবং সড়্‌কী চালানোতে সুনিপুণ ছিল। বহু গ্রামের নিভৃত প্রান্তে ইহাদের স্থাপিত ডাকাতে-কালীর মন্দিরের চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে! দিনমানে ইহারা ভালমানুষ সাজিয়া বেড়াইত, রাত্রে কালীপূজা দিয়া দূর পল্লীতে গৃহস্থ-বাড়ী লুট করিতে বাহির হইত। তখনকার কালে অনেক সমৃদ্ধিশালী গৃহস্থও ডাকাতি করিয়া অর্থ-সঞ্চয় করিতেন। বাংলা দেশে বহু জমিদার ও অবস্থাপন্ন গৃহস্থের অর্থের মূলভিত্তি যে এই পূর্ব্বপুরুষসঞ্চিত লুণ্ঠিত ধনরত্ন, যাঁহারাই প্রাচীন বাংলার কথা জানেন, তাঁহারা ইহাও জানেন।

বিষ্ণুরাম রায়ের পুত্র বীরু রায়ের এরূপ অখ্যাতি ছিল। তাঁহার অধীনে বেতনভোগী ঠ্যাঙাড়ে থাকিত। নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের উত্তরে যে কাঁচা সড়ক ওদিকে চুয়াডাঙ্গা হইতে আসিয়া নবাবগঞ্জ হইয়া টাকী চলিয়া গিয়াছে, ওই সড়কের ধারে দিগন্তবিস্তৃত বিশাল সোনাডাঙার মাঠের মধ্যে, ঠাকুরঝি পুকুর নামক সেখানকার এক বড় পুকুরের ধারে ছিল ঠ্যাঙাড়েদের আড্ডা। পুকুর-ধারে প্রকাণ্ড বটগাছের তলে তাহারা লুকাইয়া থাকিত—এবং নিরীহ পথিককে মারিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিত। ঠ্যাঙাড়েদের কার্য্য-প্রণালী ছিল অদ্ভুত ধরণের। পথ-চল্‌তি লোকের মাথায়

লাঠির আঘাত করিয়া আগেই তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া তবে তাহারা তাহার কাছে অর্থান্বেষণ করিত—মারিয়া ফেলিবার পর এরূপ ঘটনাও বিচিত্র ছিল না যে, দেখা গেল, নিহত ব্যক্তির কাছে সিকি পয়সাও নাই। লাস পুকুরের মধ্যে গুঁজিয়া রাখিয়া ঠ্যাঙাড়েরা পরবর্ত্তী শিকারের উপর দিয়া এ বৃথা শ্রমটুকু পোষাইয়া লইবার আশায় নিরীহ মুখে পুকুরপাড়ের গাছতলায় ফিরিয়া যাইত। গ্রামের উত্তরে এই বিশাল মাঠের মধ্যে এই বটগাছ আজও আছে ও সড়কের ধারের একটা অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিকে আজও ঠাকুরঝি পুকুর বলে। পুকুরের বিশেষ চিহ্ন নাই, চৌদ্দ আনা ভরাট হইয়া গিয়াছে—ধান-আবাদ করিবার সময়ে চাষাদের লাঙলের ফালে সেই নাবাল জমিটুকু হইতে আজও মাঝে মাঝে নরমুণ্ড উঠিয়া থাকে।

শোনা যায়, পূর্ব্বদেশীয় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বালক পুত্রকে সঙ্গে করিয়া কালীগঞ্জ হইতে টাকী-শ্রীপুরের ওদিকে নিজের দেশে ফিরিতেছিলেন। সময়টা কার্ত্তিক মাসের শেষ, কন্যার বিবাহের অর্থ সংগ্রহের জন্য ব্রাহ্মণ বিদেশে বাহির হইয়াছিলেন, সঙ্গে কিছু অর্থ ও জিনিষপত্র ছিল। হরিদাসপুরের বাজারে চটিতে রন্ধন আহারাদি করিয়া তাঁহারা দুপুরের কিছু পরে পুনরায় পথে বাহির হইয়া পড়িলেন ; ইচ্ছা রহিল যে, সম্মুখে পাঁচক্রোশ দূরের নবাবগঞ্জের বাজারে চটিতে রাত্রি-যাপন করিবেন। পথের বিপদ্ তাঁহাদের অবিদিত ছিল না কিন্তু আন্দাজ করিতে কিরূপ ভুল হইয়াছিল —কার্ত্তিক মাসের ছোট দিন, নবাবগঞ্জের বাজারে পৌঁছিবার অনেক পূর্ব্বে সোনাডাঙা মাঠের মধ্যে সূর্য্যকে ডুবু ডুবু দেখিয়া তাঁহারা দ্রুতপদে হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন। ঠাকুরঝি পুকুরের ধারে আসিতেই তাঁহারা ঠ্যাঙাড়েদের হাতে পড়েন। দস্যুরা প্রথম ব্রাহ্মণের মাথায় এক ঘা লাঠি বসাইয়া দিতেই তিনি প্রাণ-ভয়ে চীৎকার করিতে করিতে পথ ছাড়িয়া মাঠের দিকে ছুটিলেন, ছেলেও বাবার পিছু পিছু ছুটিল, কিন্তু একজন বৃদ্ধ, অপরে বালক,—ঠ্যাঙাড়েদের সঙ্গে কতক্ষণ দৌড়-পাল্লা দিবে ? অল্পক্ষণেই তাহারা আসিয়া শিকারের নাগাল ধরিয়া ঘেরাও করিয়া ফেলিল। নিরুপায় ব্রাহ্মণ না কি প্রস্তাব করেন যে, তাঁহাকে মারা হয় ক্ষতি নাই, কিন্তু তাঁহার পুত্রের জীবনদান—বংশের একমাত্র পুত্র—পিণ্ডলোপ ইত্যাদি। ঘটনাক্রমে বীরু রায়ও না কি সেদিন দলের মধ্যে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্মণ বলিয়া চিনিতে পারিয়া প্রাণ-ভয়ার্ত্ত বৃদ্ধ তাঁহার হাতে পায়ে পড়িয়া অন্ততঃ পুত্রটির প্রাণরক্ষার জন্য বহু কাকুতি-মিনতি করেন, কিন্তু সরল ব্রাহ্মণ বুঝেন নাই, তাঁহার বংশের পিণ্ডলোপের আশঙ্কায় অপরের মাথা ব্যথা হইবার কথা নহে বরং তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে ঠ্যাঙাড়ে দলের অনুরূপ আশঙ্কার কারণ আছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে হতভাগ্য পিতা-পুত্রের মৃতদেহ একসঙ্গে

ঠাণ্ডা হেমন্ত রাতে ঠাকুরঝি পুকুরের জলে টোকা পানা ও শ্যামাঘাসের দামের মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিয়া বীরু রায় বাটী চলিয়া আসিলেন।



একজন বৃদ্ধ, অপরে বালক, ঠ্যাঙাড়েদের সঙ্গে কতক্ষণ দৌড়-পাল্লা দিবে—১৯০ পৃষ্ঠা

এই ঘটনার বেশী দিন পরে নয়, ঠিক পর বৎসর পূজার সময়। বাঙ্গালা ১২৩৮ সাল। বীরু রায় সপরিবারে নৌকা-যোগে তাঁহার শ্বশুরবাড়ী হলুদবেড়ে

হইতে ফিরিতেছিলেন। নকীপুরের নীচের বড় নোনা গাঙ্ পার হইয়া মধুমতীতে পড়িবার পর দুই দিনের জোয়ার খাইয়া তবে আসিয়া দক্ষিণ শ্রীপুরের কাছে ইছা-মতীতে পড়িতে হইত। সেখান হইতে আর দিন চারেকের পথ আসিলেই স্বগ্রাম।

সারাদিন বাহিয়া আসিয়া অপরাহ্ণে টাকীর ঘাটে নৌকা লাগিল। বাড়ীতে পূজা হইত। টাকীর বাজার হইতে পূজার দ্রব্যাদি কিনিয়া রাত্রিতে সেখানে অবস্থান করিবার পর প্রত্যূষে নৌকা ছাড়িয়া সকলে দেশের দিকে রওনা হইলেন। দুই দিন পরে সন্ধ্যার দিকে ধলচিতের বড় খাল ও ইছামতীর মোহানায় একটা নির্জ্জন চরে জোয়ারের অপেক্ষায় নৌকা লাগাইয়া রন্ধনের জোগাড় হইতে লাগিল। বড় চর, মাঝে মাঝে কাশঝোপ ছাড়া অন্য গাছপালা নাই। এক স্থানে মাঝিরা ও অন্য স্থানে বীরু রায়ের স্ত্রী রন্ধন চড়াইয়াছিলেন। সকলেরই মন প্রফুল্ল, দুই দিন পরেই দেশে পৌঁছানো যাইবে। বিশেষতঃ পূজা নিকটে, সে আনন্দ তো আছেই।

জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল। নোনা গাঙের জল চক্ চক্ করিতেছিল। হু হু হাওয়ায় চরের কাশফুলের রাশি, আকাশ জ্যোৎস্না মোহানার জল একাকার করিয়া উড়িতেছিল। হঠাৎ কিসের শব্দ শুনিয়া দু'একজন মাঝি রন্ধন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। কাশঝোপের আড়ালে যেন একটা হুট্‌পাট্ শব্দ, একটা ভয়ার্ত্ত কণ্ঠ একবার অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিয়াই তখনি থামিয়া যাইবার শব্দ। কৌতূহলী মাঝিরা ব্যাপার কি দেখিবার জন্য কাশঝোপের আড়ালটা পার হইতে না হইতে কি যেন একটা হুড়ুম করিয়া চর হইতে জলে গিয়া ডুব দিল। চরের সেদিক্‌টা জনহীন—কিছুই কাহারো চোখে পড়িল না।

কি ব্যাপার ঘটিয়াছে, কি হইল, বুঝিবার পূর্ব্বেই বাকি দাঁড়ি-মাঝি সেখানে আসিয়া পৌঁছিল! গোলমাল শুনিয়া বীরু রায় আসিলেন, তাঁহার চাকর আসিল। বীরু রায়ের একমাত্র পুত্র নৌকাতে ছিল। সে কই? জানা গেল, রন্ধনের বিলম্ব দেখিয়া সে খানিকক্ষণ আগে জ্যোৎস্নায় চরের মধ্যে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। দাঁড়ি-মাঝিদের মুখ শুকাইয়া গেল; এদেশের নোনা গাঙ সমূহের অভিজ্ঞতায় তাহারা বুঝিতে পারিল—কাশবনের আড়ালে বালির চরে বৃহৎ কুমীর শুইয়া ওৎ পাতিয়া ছিল—ডাঙ্গা হইতে বীরু রায়ের পুত্রকে লইয়া গিয়াছে।

তাহার পর অবশ্য যাহা হয়, হইল। নৌকার লগি লইয়া এদিকে ওদিকে খোঁজা-খুঁজি করা হইল, নৌকা ছাড়িয়া মাঝনদীতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত সকলে সন্ধান করিয়া বেড়াইল—তাহার পর কান্নাকাটি, হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি। গত বৎসর দেশের

ঠাকুরঝি পুকুরের মাঠে প্রায় এই সময়ে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, যেন এক অদৃশ্য বিচারক এ বৎসর ইছামতীর নির্জ্জন চরে তাহার বিচার নিষ্পন্ন করিলেন। মূর্খ বীরু রায় ঠকিয়া শিখিলেন যে, সে অদৃশ্য ধর্ম্মাধিকরণের দণ্ডকে ঠাকুরঝি পুকুরের শ্যামাঘাসের দামে প্রতারিত করিতে পারে না ; অন্ধকারেও তাহা আপন পথ চিনিয়া লয়।

বাড়ী আসিয়া বীরু রায় আর বেশী দিন বাঁচেন নাই।

—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জয়-পরাজয়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বোর্ডিং হইতে বাহির হইয়া, আমি ও রমানাথ একজন চেনা মুদীর দোকানে জিনিষপত্র রাখিয়া, গড়ের মাঠের দিকে চলিলাম। রাগে, দুঃখে ও অপমানে তখন আমাদের মন এত উত্তেজিত ছিল যে, ভবিষ্যতে কি করিব, কোথায় যাইব, সে কথা আমাদের মনেই আসিল না! গড়ের মাঠে নির্ম্মল বায়ু-সেবনে শরীর ও মন কতক শীতল হইলে, একটা গাছতলায় বসিয়া আমাদের ভবিষ্যৎ কার্য্য-কলাপের বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলাম। রমানাথ জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ী গিয়ে তোমার মাকে এ সব কথা বল্‌বে না কি ?" রমানাথের প্রশ্ন শুনিয়া হঠাৎ মা'র কথা আমার মনে হইল। তাঁহার সেই মলিন মুখ, সেই চোখের জল, সেই স্নেহ-ভরা আদর, সেই সুমধুর উপদেশ—একে একে সকল কথাই আমার মনে পড়িতে লাগিল। আমি বলিলাম, "ভাই, কোন্ মুখে আর মা'র কাছে যাব! এ সব কথা শুন্‌লে তিনি বিষ খেয়ে ম'র্‌বেন!"

রমানাথ বলিল, "আচ্ছা, এখন তবে বরিশালে চল ; সেখানে আমার কাকা থাকেন।"

আমার কাছে টাকা-কড়ি যাহা ছিল, তাহাতে পাঁচ ছয় মাস বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাইতে পারিতাম। কিন্তু কলিকাতায় থাকিতে আমার ইচ্ছা ছিল না এবং বাড়ীতে যাইতেও সাহস হইল না। সুতরাং রমানাথের সহিত বরিশালে

যাওয়াই স্থির করিলাম। তার পর রাত্রি আন্দাজ দশটার সময় সেই মুদীর দোকানে ফিরিয়া আসিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া তুই জনে শয়ন করিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমার বেশ তন্দ্রা আসিয়াছে, এমন সময়, রমানাথ আমার গা টিপিয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কাছে কত টাকা আছে? সাবধানে রেখেছ ত?"

"আমার মানিব্যাগে নোটে ও টাকায় মিলিয়ে প্রায় দেড় শ' টাকা আছে।" —এই বলিতে বলিতে পাশ ফিরিয়া শুইয়া আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিন সকালে উঠিয়া দেখি, রমানাথ নাই। মুদীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল, "তিনি একটু আগে বাহিরে গেছেন।" তখন পকেটে হাত দিয়া দেখি, আমার মানিব্যাগটি নাই! আমি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। কি সর্ব্বনাশ! রমানাথ শেষে এই করিল! এই জন্যই বুঝি কাল রাত্রে টাকার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল? ওঃ, কি ভয়ানক!—আমি একেবারে অস্থির হইয়া নানা বিপদের আশঙ্কা করিতে লাগিলাম। ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ সোনার ঘড়ি ও চেনের কথা মনে পড়িল। সেগুলি আমার বাক্সের মধ্যে ছিল। তাড়াতাড়ি বাক্স খুলিয়া দেখিলাম, ঘড়ি ও চেন লইতে পারে নাই।

আমি তখনই আবার বাক্স বন্ধ করিয়া, রমানাথের অন্বেষণে বাহির হইলাম। বেলা প্রায় বারটা পর্য্যন্ত নানা স্থানে খুঁজিলাম, কোথাও তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। পকেটে কয়েক আনা পয়সা ছিল। একটা হোটেলে কিছু খাইয়া, আবার রমানাথের অন্বেষণে বাহির হইলাম। এইরূপে তুই তিন দিন ধরিয়া ক্রমাগত নানা স্থানে খুঁজিলাম, তবুও তাহার সন্ধান করিতে পারিলাম না। ক্রমে পকেটের পয়সা কয়টিও ফুরাইয়া আসিল, আমি মহা বিপদে পড়িয়া গেলাম। বাড়ী যাইতে সাহায্য করা দূরে থাক, এক বেলা খাইতে দিবে, এমন আত্মীয়ও আমার কেহ ছিল না। শেষে অনাহারে মরিতে হইবে ভাবিয়া, আমি চারিদিক্ যেন অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। এই সময়ে একদিন সন্ধ্যাকালে হঠাৎ পঞ্চাননের সহিত আমার দেখা হইল। আমাকে দেখিতে পাইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে মোহনলাল, তুমি এখনও বাড়ী যাও নি? হেড্‌মাষ্টার মশাই তোমার মাকে চিঠি লিখেছিলেন। শুন্‌লাম, তিনি খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে শুধু প'ড়ে প'ড়ে কাঁদ্‌ছেন।"

কয়েক দিন পূর্ব্বে যে পঞ্চাননের উপর নানা অত্যাচার করিয়াছি, তাহার এরূপ ভদ্র ব্যবহারে, লজ্জা ও অনুতাপে আমার মস্তক নত হইয়া পড়িল। আমি মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলাম। আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া, পঞ্চানন বলিল, "মোহনলাল, তোমার মুখ দেখে বেশ বুঝ্‌তে পারছি যে, লজ্জায় তুমি

কথা বল্‌তে পার্‌ছ না। কিন্তু সত্যি বল্‌ছি, তোমার উপর আমার এক বিন্দুও রাগ নেই। দুষ্টু লোকের কুপরামর্শে চ'ল্‌লে, মানুষ অনেক সময় পশুর চেয়েও হীন হ'য়ে পড়ে। যা হ'ক, সেদিনকার কথা ভুলে যাও।" পঞ্চাননের মিষ্ট কথায় আমি আরও লজ্জিত হইলাম এবং চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বলিলাম, "ভাই, যা হ'বার হ'য়ে গেছে, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।"—এই বলিয়া বোর্ডিং ছাড়িবার পর হইতে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, একে একে সকল কথা তাহাকে বলিলাম। রমানাথ আমার দেড়শত টাকা ফাঁকি দিয়াছে শুনিয়া, রাগে পঞ্চাননের চক্ষু লাল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "রমানাথের প্রকৃতি যে অতি নীচ, তা' আমি আগেই জান্‌তাম ; কিন্তু সে যে এত বড় পাকা চোর, তা আমার জানা ছিল না! যা হ'ক, এখন আর দুঃখ করা মিছে। আমি তোমাকে পাঁচটি টাকা দিচ্ছি, তুমি আজই বাড়ী চলে যাও।" পঞ্চাননের এই অনুগ্রহের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া, আমি তাহার নিকট হইতে পাঁচটি টাকা লইলাম এবং সেই রাত্রেই বাড়ী যাইবার জন্য ট্রেণে উঠিলাম। ট্রেণে উঠিয়া তাহার মহত্ত্বের কথা ভাবিতে ভাবিতে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। ঘুমাইবার পূর্ব্বে ঘড়ি ও চেন সাবধানে বাক্সের ভিতরে তুলিয়া রাখিতে ভুলি নাই। তার পর, কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম জানি না, হঠাৎ বোধ হইল, যেন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির ফোঁটা আমার মুখে আসিয়া পড়িতেছে। উঠিয়া দরজা জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু উঠি উঠি করিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টির বড় বড় কয়েকটা ফোঁটা মুখে আসিয়া পড়ায়, আবার আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম। তখন আমার সহযাত্রিগণের মধ্যে প্রায় সকলেই নামিয়া গিয়াছিল। সমস্ত গাড়ীখানিতে আর দুই জন মাত্র যাত্রী ছিল। ক্ষীণ আলোকে তাহাদিগকে ভাল করিয়া দেখিবার সুবিধা হইল না বটে, কিন্তু আমার ভয় হইতে লাগিল, কি জানি, যদি তাহাদের মনে কোন কু-অভিসন্ধি থাকে! যদি আমার ঘড়ি-চেনের সন্ধান পাইয়াই তাহারা আসিয়া থাকে! তাহা হইলে কি উপায়ে সেইগুলি রক্ষা করিব ; আর কি উপায়েই বা প্রাণ বাঁচাইব! আমি এইরূপ নানা কথা ভাবিতেছি, এমন সময় তাহাদের একজন বলিয়া উঠিল, "আর দেরী কেন ? তুমি ক্লোরোফর্‌মের শিশি বের কর।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি। লোকটা অজ্ঞান হ'লেই কাজ শেষ ক'র্‌তে হবে। সাবধান, ও যেন দড়ি ধরে ঘণ্টা টান্‌তে না পারে!

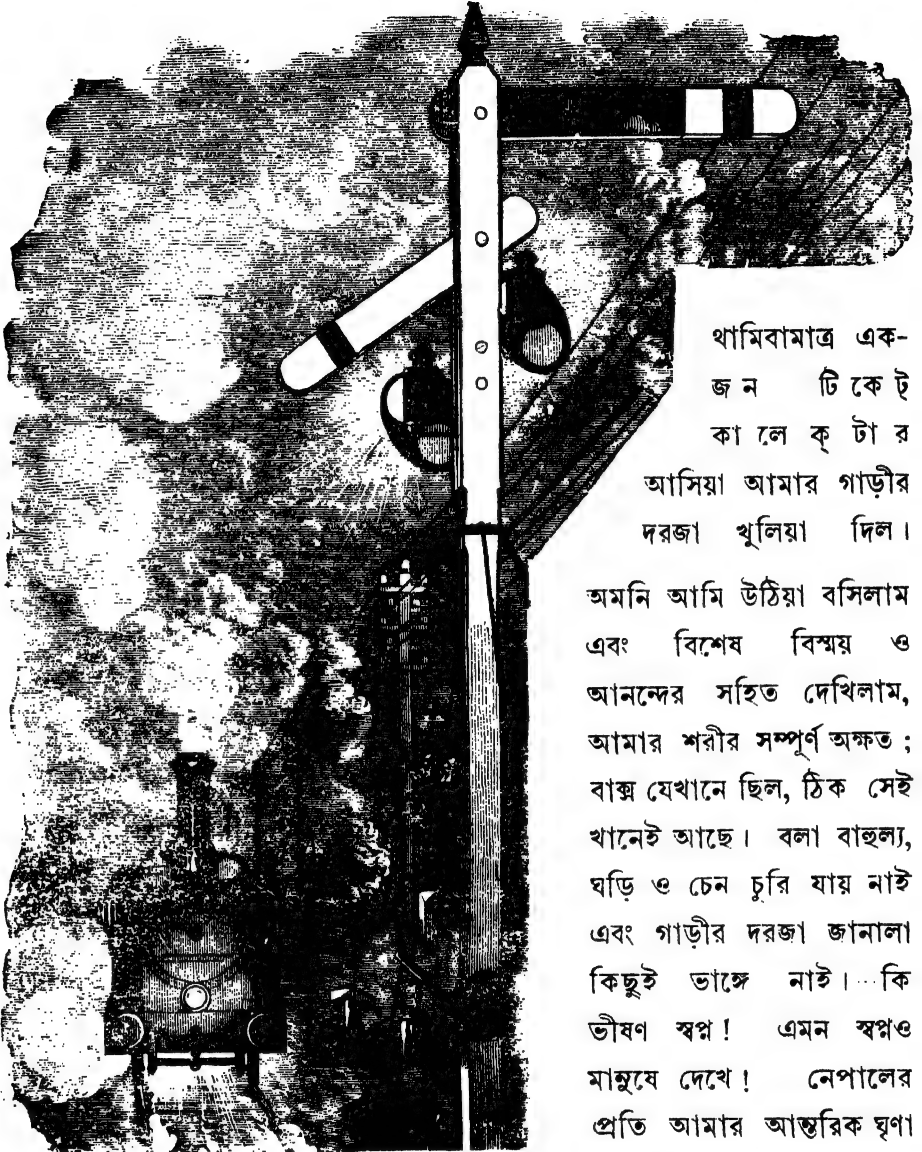
এইরূপ আলাপ করিতে করিতে তাহারা আমার কাছে আসিয়া বসিল। তখন রাগে ও ঘৃণায় আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল! দেখিলাম, দস্যু দু'জন আর কেহ

নয়—আমার চিরশত্রু নেপাল ও গোপীনাথ! কি, ইহারা আমার সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছে! এত বড় বুকের পাটা! আমার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল! আমি কর্কশস্বরে বলিলাম, "তোমাদের এই কাজ! ভদ্দরলোকের ছেলের ডাকাতি ব্যবসা! তোমাদের কি লজ্জা নেই!"

নেপাল। মিছে গোলযোগ ক'রো না। যদি বাঁচ্‌বার সাধ থাকে, বাক্সটি ছেড়ে দাও তা না হ'লে, ঘড়ি-চেন ত যাবেই, এমন কি, তোমার প্রাণও যেতে পারে! পিস্তল দেখ্‌ছ ত? আমাদের কাছে ছোরাও আছে।

নেপালের কথা শুনিয়া ভয়ের পরিবর্ত্তে আমার মন সাহসে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। আমি উত্তেজিতভাবে বলিলাম, "প্রাণ থাক্‌তে বাক্স ছাড়্‌বো না; আগে আমাকে খুন্ না ক'র্‌লে এক কপর্দ্দকও পাবার আশা ক'রো না।" এই কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া আমি ঘণ্টা টানিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু নেপাল লৌহমুষ্টির আঘাতে আমাকে বেঞ্চের উপর ফেলিয়া দিল। ঠিক সেই সময় গোপীনাথ তূলাতে ক্লোরোফর্‌ম মাখাইয়া আমার নাকের কাছে ধরিল। সমুদয় গাড়ী দুর্গন্ধে পূর্ণ হইয়া গেল। দস্যুরা পূর্ব্বে দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। আমি গোপীনাথের হাত হইতে শিশিটা কাড়িয়া লইয়া, জানালার গ্লাসের উপর ছুড়িয়া দিলাম। ঝন্‌-ঝন্ করিয়া গ্লাস ভাঙ্গিয়া পড়িল। তখন প্রাণপণ চেষ্টায় আমি জানালার ধারে ছুটিয়া গেলাম এবং ভাঙ্গা কাচের ভিতর দিয়া গলা বাড়াইয়া,—"খুন্ কর্‌ল, খুন্ কর্‌ল"—বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম। পরমুহূর্ত্তেই দস্যুরা আমাকে টানিয়া ভিতরে আনিয়া ফেলিল এবং খুব জোরে আমার মুখ চাপিয়া ধরিল। আমি পুনরায় চীৎকার করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কণ্ঠের স্বর ফুটিল না। ক্রমে গলা শুকাইয়া আসিল, তার পর মনে হইল, যেন তাহারা আমাকে বাঁধিতেছে। তার পর আর কি হইল, আমার মনে নাই।

কতক্ষণ এই ভাবে কাটিল, বলিতে পারি না। শেষে অল্প চেতনা হইলে দেখিলাম, গাড়ী খুব জোরে ছুটিতেছে। আমি বসিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই উঠিতে পারিলাম না। চীৎকার করিতে চেষ্টা করিলাম, আওয়াজ ফুটিল না। আস্তে আস্তে হাত সরাইয়া টিনের বাক্সটি খুঁজিলাম, সেটিও পাওয়া গেল না। মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, ডাকাতেরাও পলায়ন করিয়াছে। আমার সমুদয় শরীর রক্তারক্তি হইতেছিল, সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছিল। এই সময় আমি হঠাৎ কি যেন আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। অল্প পরেই গাড়ীর গতি একটু একটু করিয়া কমিতে লাগিল। তার পর—"বগুলা, বগুলা"—এই শব্দ শুনিতে পাইলাম। ষ্টেশনে গাড়ী



থামিবামাত্র একজন টিকেট্ কালেক্টার আসিয়া আমার গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল। অমনি আমি উঠিয়া বসিলাম এবং বিশেষ বিস্ময় ও আনন্দের সহিত দেখিলাম, আমার শরীর সম্পূর্ণ অক্ষত; বাক্স যেখানে ছিল, ঠিক সেই খানেই আছে। বলা বাহুল্য, ঘড়ি ও চেন চুরি যায় নাই এবং গাড়ীর দরজা জানালা কিছুই ভাঙ্গে নাই।...কি ভীষণ স্বপ্ন! এমন স্বপ্নও মানুষে দেখে! নেপালের প্রতি আমার আন্তরিক ঘৃণা ছিল; সেই ঘৃণা হইতেই যে এই স্বপ্নের উৎপত্তি, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আমি জিনিষপত্র লইয়া ষ্টেশনে নামিয়া পড়িলাম এবং সেই অদ্ভুত স্বপ্নের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে একখানি গাড়ী করিয়া বাড়ী রওনা হইলাম।

*   *   *   *   *

দশ বৎসর পরের কথা বলিতেছি। এই দশ বৎসরে আমাদের গ্রামে কয়েকটি বিষয়ে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল; তাহার মধ্যে এখানে কেবলমাত্র দুইটি ঘটনা

বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম—আমার মামার হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে, সুযোগ পাইয়া এক দুর্দ্দান্ত জ্ঞাতি ফাঁকি দিয়া আমাদের সমুদয় বিষয়-সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন; মা ও আমি পথের ভিখারী হইয়া পড়ি। দ্বিতীয়—আমার চিরশত্রু নেপালচন্দ্র কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে বি-এ, বি-এল, পাশ করিয়া ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করে।

নেপাল ওকালতী আরম্ভ করিয়া, সর্ব্বপ্রথমেই গ্রামস্থ বালকগণের জন্য নিজ বাড়ীতে একটি পুস্তকালয় স্থাপন করিল। সপ্তাহে সপ্তাহে সেখানে নানা সদ্বিষয়ের আলোচনা হইতে লাগিল। আমার পূর্ব্বসঙ্গিগণের অনেকেই নেপালের বশীভূত হইয়া তাহার দলে গিয়া যোগ দিল। কেবল কতকগুলা ওঁচা ছেলে আমার দলেই রহিল। আমি 'বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা'র ন্যায় তাহাদের উপর আধিপত্য করিতে লাগিলাম। আমার ন্যায় তাহাদের কাহারও ঘরে অন্নের সংস্থান ছিল না। কিন্তু আমার দেখাদেখি সকলেই তেল কুচ্‌কুচে চুলে আলবার্ট কাটিয়া নদীর ধারে বেড়াইতে শিখিয়াছিল। আমরা কয়েকজনে মিলিয়া পূর্ব্ব হইতেই একটি কনসার্টের দল গঠন করিয়াছিলাম। আমাদের বেহালা ও বাঁশীর ক্যাঁ-কোঁ রবে এবং ঢোলকের দুম্-দাম্ শব্দে পাড়ার লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

নেপাল যখন পুস্তকালয় স্থাপন করিয়া, পাড়ার ছেলেদের লইয়া নানা সদ্বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল এবং একে একে আমার দলের ছেলেদের টানিতে লাগিল, তখন আমিও তাহার কার্য্যে বাধা দিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ইহাতে দুই দলের মধ্যে শীঘ্রই আবার পূর্ব্বের ন্যায় শত্রুতা বাধিয়া উঠিল।

এইরূপে কিছুদিন যায়, একদিন বৈকালে উচ্চতানে আমাদের কন্‌সার্ট চলিতেছে, এমন সময় আমাদের বাড়ীর নিকটে জেলে-পাড়ায় একটা হৈ হৈ শব্দ উঠিল। আমি দলের একজনকে কারণ অনুসন্ধানে পাঠাইয়া দিলাম। সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "জেলেপাড়ায় আগুন লেগেছে। শ্রীমন্ত আর দুলের ঘর-দোর জিনিষ-পত্র দাউ দাউ ক'রে জ্বল্‌ছে।"

"নিভাবার কোন চেষ্টা হচ্চে না?"

"হ্যাঁ, বহু লোক জড় হয়েছে। নেপালের দলও সেখানে গেছে। তারা সকলে প্রাণপণে কল্‌সী কল্‌সী জল তুলে আগুনে ঢাল্‌ছে।

নেপালের দল সেখানে গিয়াছে শুনিয়াই, আমার পরোপকার-প্রবৃত্তি নিভিয়া গেল। আমি বলিলাম, "সেই সাধুরাই তবে নাম জাহির করুক্—আমাদের যাওয়ার কোন দরকার নেই। এস, আমরা বাজাই।" পুনরায় আমাদের কন্‌সার্ট চলিতে লাগিল।

খানিক পরে গোলমাল থামিয়া গেল। নেপালের দল আগুন নিভাইয়া ভিজা কাপড়ে আসিয়া আমাদের আড্ডার মধ্যে প্রবেশ করিল। নেপাল সকলের আগে ছিল; নিতান্ত বিরক্তির স্বরে বলিল—"তোমরা মানুষ, না কি? পাড়ায় আগুন লেগে ছারখার হ'য়ে গেল, আর তোমরা স্বচ্ছন্দে কন্‌সার্ট বাজাচ্ছ? একেবারে অধঃপাতে গেলে! ছি!"

নেপালকে সকলেই মান্য করিয়া চলিত, সুতরাং কেহ তাহার কথায় জবাব দিতে সাহস করিল না; কিন্তু আমি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বলিলাম, "মুখ সাম্‌লে কথা কও! ফের যা তা ব'ল্‌বে তো টের পাবে! আমি কাউকে 'কেয়ার' করি না।"

গোপীনাথ বলিল, "কি হে মোহনলাল, এত চটো কেন? আমাদের কি বোর্ডিংএর মাষ্টার পেয়েছ যে, ভয় দেখাচ্ছ?"

আমার আঁতে ঘা দিয়া গোপীনাথ কথা বলাতে, রাগে আত্মহারা হইলাম এবং "ছাখ্‌ গুপে, আমার সঙ্গে চালাকি করিস্‌ নে"—বলিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে গেলাম। গোপীনাথও ঘুসী বাগাইয়া ছুটিয়া আসিল। আমি হাতের কাছে আর কিছু না পাইয়া, একটা লোহার হাতুড়ী উঠাইয়া তাহার দিকে খুব জোরে ছুড়িয়া দিলাম। সে নিমেষের মধ্যে একটু সরিয়া দাঁড়াইল, আর মনে করিতে এখনও গা কাঁপে, সেই হাতুড়ী ঠিক নেপালের কপালে গিয়া লাগিল। নেপাল চীৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। রক্তে তাহার নাক, মুখ, কাপড়-চোপড় একেবারে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। মা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে, বাড়ীর ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিয়া, ক্ষতস্থানে কাপড় ভিজাইয়া জল দিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে অনেক লোক জড় হইল এবং নানাপ্রকার আশঙ্কা করিতে লাগিল। কেহ বলিল, "নেপাল বাঁচ্‌বে না।" কেহ বলিল, "মোহনলালের ফাঁসি হবে।" আমি দেখিয়া শুনিয়া একেবারে স্তম্ভিত। কি সর্ব্বনাশ—ফাঁসী হইবে! আমার পা ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, বুকের ভিতর গুর্‌ গুর্‌ করিতে লাগিল, মুখ শুকাইয়া উঠিতে লাগিল। গোপীনাথ বজ্রমুষ্টিতে আমার হাত ধরিয়াছিল, আমি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না, দেওয়ালে ঠেস্‌ দিয়া বসিয়া পড়িলাম।

নেপালের সঙ্গীদের ইচ্ছা, আমাকে পুলিসে দেয়, কেবল নেপালের অনুমতির জন্য তাহারা অপেক্ষা করিতে লাগিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে নেপাল চেতনালাভ করিলে, তাহার দলস্থ কয়েকটি বালক পুলিসে যাইবার উপক্রম করিল। মা আবার চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। কিন্তু নেপাল কিছুতেই আমাকে পুলিসে দিতে

সম্মত হইল না। সে বলিল, "রাগের বশে মোহনলাল একটা অন্যায় কাজ ক'রে ব'সেছে! তা ব'লে কি পুলিসে দিতে হবে? কখনই না! তোমরা ওকে ছেড়ে দাও।"

বাল্যাবধি অন্যায় কার্য্য করিতে করিতে আমার স্বভাব এতদূর বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে, নেপালের এই মহৎ ক্ষমাগুণকেও আমি শ্রদ্ধা ও ভক্তির চক্ষে দেখিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, আমাকে পুলিসে না দিবার মধ্যে নিশ্চয়ই নেপালের কোন মতলব আছে। তাহা না হইলে, সে এত বাগে পাইয়াও আমাকে ছাড়িয়া দিবে কেন?

ইহার কিছুদিন পরে আর এক বিপদ্ উপস্থিত হইল। তখন আষাঢ় মাস। আমাদের বাড়ী হইতে দুই ক্রোশ দূরে একটি পল্লীতে রথের বড়ই ধুম। তাহাতে



রক্তে তাহার নাক, মুখ, কাপড়-চোপড় ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

দেশ-বিদেশের বহু লোকসমাগম হইয়া থাকে। রথের পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময় তিনটি পথিক আমাদের বাড়ীতে অতিথি হইলেন। পরদিন সকালে আমি বাহিরে আসিলে, তাঁহারা বলিলেন, "মশাই, আপনি আমাদের চেনেন না, কিন্তু আপনার মামার সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট আত্মীয়তা ছিল। তিনি বেঁচে থাক্‌তে আমরা কতবার এ বাড়ীতে এসেছি, দায়ে-অদায়ে কতবার তাঁর সাহায্য পেয়ে কৃতার্থ হয়েছি। সেই ভরসায় একটা অনুরোধ ক'র্‌তে সাহস কচ্ছি।—আমরা মেলায় যাবো; সঙ্গে কিছু টাকাকড়ি আছে, তা আপনার কাছে রেখে যেতে চাই। অজানা যায়গায়—বিশেষ মেলার

মধ্যে—এত টাকা নিয়ে যেতে আমাদের সাহস হয় না।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কত টাকা ?”

পথিকগণ। আজ্ঞে, জমিদারী খাজনা দেবার জন্যে বহু কষ্টে আমরা ১২০০৲ যোগাড় ক’রেছি, সেই সব টাকাই রেখে যেতে চাই।

এতগুলি টাকা গচ্ছিত রাখিতে আমার ভয় হইল। বলিলাম, “আমাকে মাপ ক’র্‌বেন ; এত টাকা রাখ্‌তে পার্‌বো না।”

পথিকগণ। দেখুন, অন্য কোন উপায় থাক্‌লে, আপনাকে কষ্ট দিতাম না। আপনার অনুগ্রহে কাল আশ্রয় পেয়েছি, আজ কিছুক্ষণের জন্যে টাকাগুলি রেখে আমাদের নিশ্চিন্ত করুন।

এই বলিয়া তাঁহারা টাকাগুলি গুণিয়া দিয়া একখানা রসিদ লইলেন। রসিদে এইরূপ লেখা থাকিল যে, পথিকেরা তিন জনে এক সঙ্গে আসিয়া সমুদয় টাকা লইবেন। তিন জনে একত্র না আসিলে, আমি গচ্ছিত টাকা যেন হস্তান্তর না করি।

রসিদখানা কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া পথিকেরা মেলাদর্শনে বাহির হইলেন। আমিও বাড়ীর ভিতর গেলাম। তার পর সবেমাত্র লোহার সিন্দুক খুলিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় বয়োজ্যেষ্ঠ পথিকটি ফিরিয়া আসিয়া আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, “মশাই, তাড়াতাড়িতে একটা ভুল হয়ে গেছে। নম্বরী নোটের নম্বরগুলি আমরা টুকে রাখ্‌তে চাই। আপনি অনুগ্রহ ক’রে টাকাগুলি নিয়ে একবার বাইরে আসুন।”

পথিকের কথায় বিশ্বাস করিয়া, থলিটি তাঁহার হাতে দিয়া বলিলাম, “নম্বর টুক্‌তে থাকুন, আমি আস্‌ছি।”

চতুর পথিক যে সুযোগ খুঁজিতেছিল, আপনা হইতেই তাহা উপস্থিত হইল। আমি বাহিরে আসিবার পূর্ব্বেই সে টাকার থলি লইয়া চম্পট্ দিল। বাহিরে আসিয়া কাহাকেও না দেখিয়া, আমি ভয়ে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলাম এবং আসন্ন বিপদের কথা ভাবিয়া শিরে করাঘাত করিতে লাগিলাম। সারাদিন আমার যে কি ভাবে কাটিল, তাহা বলিতে পারি না। সন্ধ্যার সময় অপর দুইজন পথিক উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের গচ্ছিত টাকা প্রার্থনা করিলেন।

আমার মাথা ঠিক ছিল না। বিরক্তির সহিত বলিলাম, “টাকা ত তখনি আপনাদের তৃতীয় সঙ্গী নিয়ে গেছেন ! আবার কিসের টাকা ?”

পথিকগণ। সে কি কথা ! তাকে টাকা দিলেন কোন্ হিসেবে ? রসিদে কি লেখা আছে, তা কি আপনার মনে নেই ? এখন ও সব বাজে কথা রেখে, আমাদের টাকাগুলি ফিরিয়ে দিন্।

"কেন মিছে জ্বালাতন করেন ?"

"আচ্ছা, সহজে না দেন আমরা আদায় ক'রে তবে ছাড়্বো"—এই বলিতে বলিতে পথিক দুইজন কোথায় চলিয়া গেলেন।

এই ঘটনার তিন চারিদিন পরে, আদালতের একজন পেয়াদা আসিয়া আমাকে শমন দিয়া গেল। তার পর যথাসময়ে মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। আমার নামে অতি গুরুতর অভিযোগ। যথাবিহিত মোকদ্দমার বন্দোবস্ত করিতে আমি চেষ্টা করিলাম, কিন্তু আর্থিক অভাববশতঃ কোন অভিজ্ঞ উকিলের সাহায্য পাইলাম না। কেবল একজন বৃদ্ধ মোক্তার দয়াপরবশ হইয়া আমার পক্ষ অবলম্বন করিলেন; এবং সাধ্যমত যত্নে মোকদ্দমা চালাইতে লাগিলেন। ফরিয়াদী দুইজনের পক্ষে দুইজন অভিজ্ঞ উকিল নিযুক্ত হইলেন।

প্রথম চারিদিন ধরিয়া ফরিয়াদী পক্ষের উকিলগণ নানা যুক্তিতর্কের সাহায্যে মোকদ্দমাটি বেশ সুন্দর করিয়া দাঁড় করাইলেন। তাঁহাদের পঞ্চম দিনের সুদীর্ঘ বক্তৃতা শুনিয়া মোকদ্দমার ফলাফল বুঝিতে আর কাহারও বাকী থাকিল না। সকলেই বুঝিলেন, আমাকে কঠিন শাস্তি পাইতে হইবে।

মোকদ্দমার ষষ্ঠ দিন উপস্থিত হইল। মোক্তার মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সাধ্যমত যত্নে গুছাইয়া গুছাইয়া দুই চারিটি কথা বলিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু ফরিয়াদী পক্ষের উকিলের তাড়ায় তাঁহার অর্দ্ধেক কথা মুখেই রহিয়া গেল। যেটুকু বলিলেন তাহাতে মোকদ্দমার গতি ফিরিবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। মোক্তারের বক্তৃতা প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় এক আকস্মিক ঘটনা ঘটিল। আদালতের চাপরাশী একখানি কার্ড আনিয়া বিচারকের হাতে দিয়া, তাহার উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। বিচারক কার্ডখানি পড়িয়া কি লিখিয়া দিলেন, চাপরাশী বাহিরে চলিয়া গেল। একটু পরে উকিলের সাজপরা আমার চিরশত্রু নেপাল আসিয়া সম্মুখের আসনে উপবেশন করিল।

আদালতের মধ্যে নেপালকে দেখিয়া আমার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। এ কি! নেপালের এখানে আসিবার কি প্রয়োজন! এখানেও সে শত্রুতা করিতে আসিল! ছিঃ, নেপাল এত নীচ! আমি এইরূপ নানা কথা ভাবিতেছি, এমন সময় নেপাল উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিচারককে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "হুজুর, আপনার অনুমতি পাইলে, আমি আসামীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া, এখানে কিছু বলিতে চাই।"

বিচারক সম্মতি প্রদান করিলেন। আমি স্থিরনেত্রে অবাক্ হইয়া নেপালের দিকে চাহিয়া রহিলাম। নেপাল বলিতে লাগিল, "আমি যতদূর বুঝিয়াছি, এই

মোকদ্দমায় আসামীর পক্ষে বলিবার বিশেষ কিছুই নাই। আসামীর কাছে টাকা যে গচ্ছিত ছিল তাহার রসিদ্ রহিয়াছে। এখন সেই টাকা ফিরাইয়া দিলেই সব গোলযোগ মিটিয়া যায়। কিন্তু টাকা দেওয়া যায় কাহাকে ? রসিদে লেখা রহিয়াছে,—তিন জনে একত্র টাকা লইতে না আসিলে, মোহনলাল বাবু গচ্ছিত টাকা যেন হস্তান্তর না করেন—অথচ এখানে কেবলমাত্র দুইজনে টাকার দাবী করিতেছেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তৃতীয় ব্যক্তিটি উপস্থিত হন, ততক্ষণ টাকার দাবী করিবার ইহাদের কোনই অধিকার নাই !”

এইটুকু বলিয়াই নেপাল বসিয়া পড়িল। বিচারক মৃদু হাসিতে হাসিতে কাগজপত্র উল্টাইতে লাগিলেন। সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল ভাবিয়া ফরিয়াদী পক্ষের উকিল দণ্ডায়মান হইয়া, নেপালের কথাগুলি যে অর্থহীন, তাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু বিচারক তাঁহার কথায় কাণ দিলেন না ; মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইয়া গেল।

সহস্র ভার নিমেষমধ্যে যেন আমার বক্ষ হইতে নামিয়া গেল ! আমি জাগ্রত কি নিদ্রিত, ঠিক করিতে পারিলাম না ! বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় ছুটিয়া গিয়া, নেপালের পায়ে জড়াইয়া পড়িলাম ! আমার বাক্যরোধ হইয়া আসিল ; সহস্র চেষ্টাতেও তাহাকে আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়া জানাইতে পারিলাম না। এতদিনের এত চেষ্টায় যাহা হয় নাই, আজ এই ঘটনায় তাহা সম্পন্ন হইল। দেবত্বের কাছে পশুত্ব পরাজিত হইল।

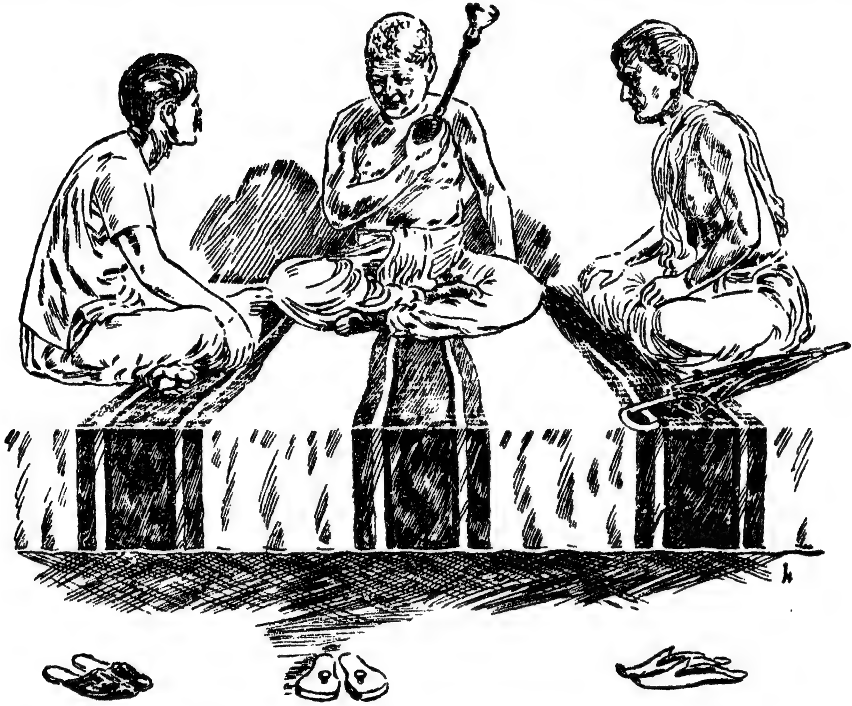
—যোগীন্দ্রনাথ সরকার

মাষ্টার মহাশয়

(১)

কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে, বর্দ্ধমান সহর হইতে ষোল ক্রোশ দূরে, দামোদর নদের অপর পারে, নন্দীপুর ও গোঁসাইগঞ্জ নামক পাশাপাশি দুইটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল এবং উভয় গ্রামের সীমা রেখার উপর একটি প্রাচীন সুবৃহৎ বটবৃক্ষ দণ্ডায়মান ছিল। এখন সে গ্রাম দু'খানিও নাই, বটবৃক্ষটিও অদৃশ্য—দামোদরের বন্যা সে সমস্ত ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে।

ফাল্গুনমাস, এক প্রহর বেলা হইয়াছে। গোঁসাইগঞ্জের মাতব্বর প্রজা এবং গ্রামের অভিভাবক-স্থানীয় কায়স্থ-সন্তান শ্রীযুক্ত হীরালাল দাস দত্ত মহাশয় হুঁকা হাতে করিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। প্রতিবেশী শ্যামাপদ মুখুয্যে ও কেনারাম মল্লিক (ইঁহারাও বড় প্রজা) নিকটে বসিয়া, এ-বৎসর চৈত্র মাসে বারোয়ারী অন্নপূর্ণা পূজা কিরূপ ভাবে নির্ব্বাহ করিতে হইবে, তাহারই পরামর্শ করিতেছিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী নন্দীগ্রামেও প্রতিবৎসর চাঁদা করিয়া ধূমধামের সহিত অন্নপূর্ণা পূজা হইয়া



শ্রীযুক্ত হীরালাল দাস দত্ত মহাশয় হুঁকা হাতে করিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। প্রতিবেশী শ্যামাপদ মুখুয্যে ও কেনারাম মল্লিক……পূজা কিরূপ ভাবে নির্ব্বাহ করিতে হইবে, তাহারই পরামর্শ করিতেছিলেন।

থাকে। এ-বৎসর গুজব শুনা যাইতেছে, উহারা অন্যান্য বৎসরের মত যাত্রা ত আনিবেই অধিকন্তু কলিকাতার কোনও ঢপওয়ালীকেও বায়না দিয়া আসিয়াছে। ঢপ-সঙ্গীত এ অঞ্চলে ইতিপূর্ব্বে কখনও শুনা যায় নাই। এ গুজব যদি সত্য হয়, তবে গোঁসাইগঞ্জেরও শুধু যাত্রা আনিলে চলিবে না, ঢপ আনিতে হইবে। উহারা কোন্ ঢপওয়ালীকে বায়না দিয়াছে, সেই গোপন সংবাদটুকু সংগ্রহ করিবার জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত হইয়াছে। তাহার নামটি 'সঠিক' জানিতে পারিলে, বর্দ্ধমানে অথবা

কলিকাতায় গিয়া খবর লইতে হইবে সেই ঢপওয়ালী অপেক্ষা কোন্ ঢপওয়ালী সমধিক খ্যাতিসম্পন্না এবং সেই বিখ্যাত ঢপওয়ালীকে গাওনা করিবার বায়না দিতে হইবে,—ইহাতে যতটাকা লাগে লাগুক। কারণ গোঁসাইগঞ্জ-বাসিগণের একবাক্যে ইহাই মত যে, তিনপুরুষ ধরিয়া গোঁসাইগঞ্জ কোনও বিষয়েই নন্দীপুরের নিকট হটে নাই—এবং আজিও হটিবে না।

আগামী বারোয়ারী পূজা-সম্বন্ধে যখন গ্রামস্থ তিনজন প্রধান প্রধান ব্যক্তির মধ্যে উল্লিখিত প্রকার গভীর ও গূঢ় আলোচনা চলিতেছিল, সেই সময় রামচরণ মণ্ডল হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেইখানে আসিয়া পৌঁছিল এবং হাতের লাঠিটা আছ্ড়াইয়া ধপাস্ করিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। তাহার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া হীরু দত্ত সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে মোড়লের পো, অমন ক'রে ব'সে পড়লে কেন? কি হয়েছে?"

রামচরণ দুইচক্ষু কপালে তুলিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করছেন দত্তজা, কি হ'তে আর বাকী আছে? হায় হায় হায়—কার্ত্তিক মাসে যখন আমার জ্বরবিকার হয়েছিল, তখনই আমি গেলাম না কেন? এই দেখবার জন্যে কি আমায় বাঁচিয়ে রেখেছিলি, হা—রে বিধেতা, তোর পোড়া কপাল!"

শ্যামাপদ ও কেনারামও ঘোর দুশ্চিন্তায় রামচরণের পানে চাহিয়া রহিলেন। দত্তজা বলিলেন, "কি হয়েছে, কি হয়েছে? সব কথা খুলে বল। এখন আসছ কোথা থেকে?"

দীর্ঘশ্বাসজড়িত স্বরে রামচরণ উত্তর করিল, "নন্দীপুর থেকে। হায় হায়, শেষকালে নন্দীপুরের কাছে মাথা হেঁট্ হয়ে গেল। হা—রে কপাল!"—বলিয়া রামচরণ সজোরে নিজ ললাটে করাঘাত করিল।

দত্তজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, কেন? নন্দীপুরওয়ালা কি করেছে?"

"বলছি। বলবার জন্যেই এসেছি। এই রোদ্দুরে মশাই, এক কোশ পথ ছুটতে ছুটতে এসেছি। গলাটা শুকিয়ে গেছে, মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। এক ঘটী জল—"

দত্তজার আদেশে অবিলম্বে একঘড়া জল এবং একটি ঘটী আসিল। রামচরণ উঠিয়া রোয়াকের প্রান্তে বসিয়া, সেই জলে হাত পা মুখ ধুইয়া ফেলিল; কিঞ্চিৎ পানও করিল! তারপর হাত মুখ মুছিতে মুছিতে নিকটে আসিয়া বসিয়া, গভীর বিষাদে মাথাটি ঝুঁকাইয়া রহিল।

হীরু দত্ত বলিলেন, "এবার বল কি হয়েছে, আর দ'ম্বে মেরো না বাপু!"

রামচরণ বলিল, "কি হয়েছে? যা হবার নয় তাই হয়েছে। বড় বড় সহরে যা হয় না, নন্দীপুরে তাই হয়েছে। এ সব পাড়াগাঁয়ে কেউ কখনও যা স্বপ্নেও ভাবে নি, তাই হয়েছে। তারা হুস্কুল বসিয়েছে।"

তিনজনেই সমবেত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি আবার? হুস্কুল কি?"

রামচরণ বলিল, "আরে ছাই! আমি কি জানতাম আগে হুস্কুল কার নাম? আজ না শুনলাম! ইঞ্জিরি পড়ার পাঠশালাকে হুস্কুল বলে।"

দত্তজা বলিলেন, "ওঃ—ইস্কুল খুলেছে বুঝি?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ—তাই খুলেছে। একজন ম্যাষ্টার নিয়ে এসেছে। ইঞ্জিরি পাঠশালের গুরু-মশায়কে নাকি ম্যাষ্টার বলে। দাশু ঘোষের চণ্ডীমণ্ডপে হুস্কুল বসেছে। স্বচক্ষে দেখে এলাম ম্যাষ্টার ব'সে দশ বার জন ছেলেকে ইঞ্জিরি পড়াচ্ছে।"

হীরু দত্ত একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া, গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাষ্টার কোথা থেকে এনেছে, তা কিছু শুনলে?"

"সব খবরই নিয়ে এসেছি। বর্দ্ধমান থেকে এনেছে। বামুণের ছেলে—হারাণ চক্রবর্ত্তী। পনের টাকা মাইনে, বাসা, খোরাক। সব খবরই নিয়ে এসেছি।"

বাহিরে এই সময়ে একটা কোলাহল শুনা গেল। পরক্ষণেই দেখা গেল, পিল্ পিল্ করিয়া লোক সদর দরজা দিয়া প্রবেশ করিতেছে। রামচরণ পথে আসিতে আসিতে, নন্দীপুরের হস্তে গোঁসাইগঞ্জের এই অভূতপূর্ব্ব পরাভব-সংবাদ প্রচার করিয়া আসিয়াছিল। সকলে আসিয়া চীৎকার করিয়া নানা ছন্দে বলিতে লাগিল, "এ কি সর্ব্বনাশ হ'ল! নন্দীপুরের হাতে এই অপমান! আমাদের ইস্কুল খোলবার এখন কি উপায় হবে?"

হীরু দত্ত সেই রোয়াকের বারান্দায় দাঁড়াইয়া উঠিয়া হাত নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন—

"ভাই সকল! তোমরা কি মনে করেছ, তিন পুরুষ পরে আজ গোঁসাইগঞ্জ নন্দীপুরের কাছে হ'টে যাবে? কখনই না। এ দেহে প্রাণ থাকতে নয়। আমরাও ইস্কুল খুলবো। ওরা বা কি ইস্কুল খুলেছে, আমরা তার চতুর্গুণ ভাল ইস্কুল খুলবো। তোমরা শান্ত হয়ে ঘরে যাও। আজই খাওয়া-দাওয়া ক'রে আমি বেরুচ্চি। কলকাতা যাবার রেল খুলেছে, আর ত কোনও ভাবনা নেই। আমি

কলকাতা গিয়ে ওদের চেয়েও ভাল মাষ্টার নিয়ে আসবো। ওরা পনেরো দিয়ে মাষ্টার এনেছে! আমরা পঁচিশ মাইনে দেবো। ওদের মাষ্টারকে পড়াতে পারে, এমন মাষ্টার আমি নিয়ে আসবো। আজ থেকে একহপ্তার মধ্যে, আমার এই চণ্ডীমণ্ডপে ইস্কুল বসাবো বসাবো বসাবো—তিন সত্য করলাম। এখন যাও, তোমরা বাড়ী যাও, স্নানাহার কর গে।"

"জয়, গোঁসাইগঞ্জের জয়! জয়, হীরু দত্তের জয়!"—সোল্লাসে চীৎকার করিতে করিতে তখন সেই জনতা প্রস্থান করিল।

(২)

কলিকাতা হইতে মাষ্টার নিযুক্ত করিয়া হীরু দত্ত চতুর্থ দিবসে গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

মাষ্টার মহাশয়ের নাম ব্রজগোপাল মিত্র। বয়স ত্রিশ বৎসর, খর্ব্বাকার কৃশকায় ব্যক্তি, বড় মিষ্টভাষী। ইংরাজী বলিতে কহিতে লিখিতে পড়িতে তিনি নাকি ভারি ওস্তাদ। ইংরাজিটা তাঁহার এতই বেশী অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে মাঝে মাঝে ইংরাজি কথা মিশাইয়া ফেলেন—অজ্ঞ লোকের সুবিধার্থ আবার তাহা বাংলা করিয়া বুঝাইয়াও দেন। বলেন, পূর্ব্বে পিতার জীবিত কালে, একদিন কলিকাতার গঙ্গার ধারে মাষ্টার মহাশয় নাকি বেড়াইতে-ছিলেন, তথায় এক সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা হয়। সাহেব তাঁহার ইংরাজি শুনিয়া লাট সাহেবের নিকট সে গল্প করিয়াছিলেন। লাট সাহেব মাষ্টার মহাশয়কে ডাকিয়া পাঠাইয়া, ডেপুটী কালেক্টারি পদ তাঁহাকে দিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তখন তিনি বাপের ব্যাটা, সংসারের চিন্তা ছিল না। সেই প্রস্তাব তিনি বিনীত-ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। আজ অভাবে পড়িয়া এই পঁচিশ টাকার চাকরি তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল! পুরুষস্য ভাগ্যং!—মাষ্টার মহাশয়ের মুখে এইরূপ কথাবার্ত্তা শুনিয়া এবং তাঁহার ইংরাজিয়ানা চাল চলন দেখিয়া গ্রামের লোক একেবারে মোহিত হইয়া গেল।

হীরু দত্তের প্রতিজ্ঞা-অনুসারে পরদিনই ইস্কুল খুলিল। পনের ষোলটি ছাত্র লইয়া মাষ্টার মহাশয় অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। কলিকাতা হইতে (দত্তজার ব্যয়ে) তিনি প্রচুর পরিমাণে সেলেট, পেন্সিল ও মারে-সাহেবেব 'স্পেলিং বুক' পুস্তক খরিদ করিয়া আনিয়াছিলেন, ছাত্রগণের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ সেগুলি তাহাদিগকে বিনা-মূল্যেই দেওয়া হইতে লাগিল।

গোঁসাইগঞ্জের লোকের সঙ্গে নন্দীপুরের লোকের পথে-ঘাটে দেখা হইলে,

উভয় গ্রামের মাষ্টার সম্বন্ধে আলোচনা হইত। গোঁসাইগঞ্জ বলিত—"বর্দ্ধমানের মাষ্টার, ও জানেই বা কি, আর পড়াবেই বা কি!" নন্দীপুর বলিত—"হ'লেই বা আমাদের মাষ্টারের বর্দ্ধমানে বাড়ী ; তিনিও ত কলকাতাতেই লেখাপড়া শিখেছেন। ওঁরা যখন পড়তেন, তখন কি বর্দ্ধমানে ইংরিজি ইস্কুল ছিল? কলকাতায় গিয়ে ইংরিজি পড়তে হ'ত।"

যথাসময়ে উভয় গ্রামের বারোয়ারী পূজার উৎসব আরম্ভ হইল। উভয় গ্রামই উভয় গ্রামের লোকদিগকে প্রতিমা-দর্শন, প্রসাদ-ভক্ষণ, যাত্রা ও ঢপ সঙ্গীত শ্রবণের নিমন্ত্রণ করিল। এই উপলক্ষে উভয় মাষ্টারের দেখা-সাক্ষাৎ হইয়া গেল এবং সভাস্থলে প্রকাশ পাইল, উভয়ে পূর্ব্বাবধি পরিচিত।

পূজান্তে গোঁসাইগঞ্জ একটা কথা শুনিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। নন্দীপুরের মাষ্টার নাকি বলিয়াছেন—"ঐ বেজা বুঝি ওদের মাষ্টার হয়ে এসেছে, তা এদ্দিন জানতাম না! ওটা ত মহামুর্খ! ছেলেবেলায় কলকেতায় আমরা এক কেলাসে পড়তাম কি না। আমরা যখন সেকেন বুক পড়ি, সেই সময়েই ও ইস্কুল ছেড়ে দেয়। তারপর আর ত ও ইংরেজি পড়ে নি। বড়বাজারে এক মহাজনের আড়তে খাতা লিখত, মাইনে ছিল সাত টাকা। গেল বছরও ত কলকেতায় ওর সঙ্গে আমার দেখা হয় ; তখনও ত ঐ চাকরি করছে!"

গোঁসাইগঞ্জবাসীরা ব্রজ মাষ্টারকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি শুনছি?"

ব্রজ মাষ্টার এ প্রশ্ন শুনিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন ; বলিলেন, "একেই বলে কলিকাল। সেকেন বুক পড়ার সময় আমি ইস্কুল ছেড়ে দিয়েছিলাম, না ও-ই ছেড়ে দিয়েছিল? হয়েছিল কি জান না বুঝি? মাষ্টার কেলাসে রোজ পড়া জিজ্ঞাসা করতো, ও একদিনও বলতে পারতো না। মাষ্টার একদিন ওকে একটা কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করলে, ও এন্‌সার করতে পারলে না। আমায় জিজ্ঞাসা করতেই আমি বল্লাম। মাষ্টার আমায় বল্লে, 'দাও ওর কান মলে।' আমি কান ম'লে দিতেই ওর মুখ চোখ রাঙা হয়ে গেল। ও বলতে লাগলো, "আমি হলাম বামুনের ছেলে, ও কায়েত হয়ে কি না আমার কানে হাত দেয়!" সেই অপমানে ও-ই ত ইস্কুল ছেড়ে ছিলে। আমি তার পর পাঁচ-ছ' বছর সেই ইস্কুলে প'ড়ে একেবারে লায়েক হয়ে তবে বেরুলাম।"

অতঃপর গোঁসাইগঞ্জের লোক, নন্দীপুর কর্ত্তৃক ব্যক্ত ঐ অপবাদের প্রতিবাদ করিতে লাগিল। অবশেষে হারাণ মাষ্টার বলিল, "আমরা ইস্কুলে যে মাষ্টারের কাছে পড়তাম, তিনি আজও বেঁচে আছেন। গোঁসাইগঞ্জ থেকে তোমরা দু'জন

মাতব্বর লোক আমার সঙ্গে চল তাঁর কাছে ; তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ, কার কথা সত্যি, কার কথা মিথ্যে।"

এ কথা শুনিয়া ব্রজ মাষ্টার হা হা করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "অ্যা! এই কথা বলেছে? ওসব ত বিলকুল ফল্‌সো—মিথ্যে কথা। সেই মাষ্টারের কাছে নিয়ে গিয়ে ভজিয়ে দেবে? তিনি কি আর বেঁচে আছেন? গেল বছরের আগের



"হয়েছিল কি জান না বুঝি? মাষ্টার কেলাসে রোজ পড়া জিজ্ঞাসা করতো, ও একদিনও বলতে পারতো না।……লায়েক হয়ে তবে বেরুলাম"—২০৮ পৃষ্ঠা।

বছর, তিনি যে হেভেন—স্বর্গে গেলেন। তাঁর শ্রাদ্ধে আমি ইন্‌ভাইট—নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছি বেশ মনে আছে। আমাকে বড্ড ভালবাসতেন যে! একেবারে সন্ ইকোয়েল—পুত্রতুল্য। তাঁর ছেলেরা আজও আমায় বেজো দাদা বলতে ইগ্‌নোরেণ্ট—অজ্ঞান।"

উভয় মাষ্টারের পরস্পরের প্রতি এই তীব্র অপবাদ-প্রয়োগের ফল এই হইল, উভয় গ্রামেই স্ব স্ব মাষ্টারের অসাধারণ পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিল।

অবশেষে স্থির হইল, কোনও প্রকাশ্য স্থানে দুই জনের মধ্যে বিচার হউক, কে কাহাকে পরাস্ত করিতে পারে দেখা যাউক।

উভয় গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া পরামর্শ করিলেন, উভয় গ্রামের সীমা-রেখার উপর যে প্রাচীন বটবৃক্ষ আছে, তাহারই নিম্নে বিচার-সভা বসিবে। কিন্তু উভয় গ্রামের লোকেই ইংরাজিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সুতরাং যাহাতে জয়-পরাজয় সম্বন্ধে কাহারও মনে কিছুমাত্র সংশয় না থাকে, এমন একটি সরল বিচার-প্রণালী স্থির করা আবশ্যক। উভয় গ্রামের সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, মাষ্টারেরা পরস্পরকে একটি ইংরাজি কথার মানে জিজ্ঞাসা করিবে, অপরকে তাহার মানে বলিতে হইবে। যদি উভয়েই বলিতে পারেন, তবে উভয়ে তুল্যমূল্য। একজন অন্যকে ঠকাইতে পারিলে, তিনিই জয়পত্র পাইবেন।

বিচারের দিন স্থির হইল—আগামী বৈশাখী পূর্ণিমা ; স্থান—উপরি-উক্ত বট বৃক্ষ-তল ; সময়—সূর্য্যাস্ত।

(৩)

ধার্য্যদিনে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই গোঁসাইগঞ্জের মাতব্বর ব্যক্তিগণ ব্রজ মাষ্টারকে সঙ্গে লইয়া বটবৃক্ষ-অভিমুখে শোভাযাত্রা করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে ঢাক ঢোল কাড়া নাগারা প্রভৃতি বাদ্যকরগণ আছে এবং এক ব্যক্তি একটা বৃহৎ রামশিঙ্গা লইয়া চলিয়াছে—ঈশ্বরেচ্ছায় যদি জয় হয়, তবে ঢাক ঢোল বাজাইয়া আনন্দ করিতে করিতে গ্রামে ফিরিয়া আসিতে হইবে। পথে যাইতে যাইতে ব্রজ মাষ্টারের পার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তিগণ বলিতে লাগিলেন, "কি হে মাষ্টার, মুখ রাখতে পারবে ত? বেছে বেছে খুব শক্ত একটা কিছু ঠিক ক'রে রাখ, হারাণ মাষ্টার যেন কিছুতেই তার মানে বলতে না পারে।" ব্রজবাবু বলিলেন, "আপনারা ভাবছেন কেন? দেখুন না কি করি। এমন কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করব যে, তা শুনেই হারাণ মাষ্টারের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে—মানে বলা ত দূরের কথা।" দত্তজা বলিলেন, "দেখো ভায়া, আজ যদি মুখ রাখতে পার, তবে তোমায় পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেবো।"—কেহ স্পষ্ট না বলিলেও ব্রজ মাষ্টার ইহা বিলক্ষণ জানিতেন যে, আজ যদি তাঁহার পরাজয় ঘটে, তবে এ গ্রাম কালই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই গোঁসাইগঞ্জের দল বটবৃক্ষ-তলে উপনীত হইল। শপ্, মাদুর, শতরঞ্চি প্রভৃতি বাহকেরা তৎপূর্ব্বেই আনিয়া নিজ গ্রামের সীমা-রেখার নিকট সেগুলি বিছাইয়া

রাখিয়াছে। দূরে পঙ্গ-পালের মত নন্দীপুরবাসিগণ আসিতেছে, দেখা গেল। তাহাদের সঙ্গেও শপ্, মাদুর প্রভৃতি ও ঢাক ঢোল ইত্যাদি আসিতেছে।

ক্রমে নন্দীপুর আসিয়া নিজ সীমানার নিকট শপ্, মাদুর বিছাইয়া বসিয়া গেল। উভয় গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সম্মুখে বসিয়াছেন, মধ্যে দুই তিন হাত মাত্র খালি জমি।

এখন প্রশ্ন উঠিল কোন্ মাষ্টার প্রথমে মানে জিজ্ঞাসা করিবেন ? উভয় গ্রামই প্রথম জিজ্ঞাসার অধিকার দাবী করিল। কোনও পক্ষই নিজ দাবী ত্যাগ করিতে সম্মত নহে। অবশেষে বৃদ্ধগণ মীমাংসা করিয়া দিলেন, হীরু দত্ত মহাশয় একটা ছড়ি ঘুরাইয়া ঊর্দ্ধে ছুড়িয়া দিউন, ছড়ি যে গ্রামের অভিমুখে মাথা করিয়া পড়িবে, সেই গ্রামের মাষ্টার প্রথমে মানে জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার পাইবেন।

"আমার ছড়ি লউন—আমার ছড়ি লউন"বলিয়া উভয় গ্রামের অনেকেই ছুটিয়া আসিল। হাতের কাছে যে ছড়িটি পাইলেন, তাহা লইয়া হীরু দত্ত সজোরে ঘুরাইয়া ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিলেন।

ক্রমে ছড়ি আসিয়া ভূমিতে পতিত হইল। সকলে দেখিল, তাহার মাথাটি নন্দীপুরের দিকে হেলিয়া রহিয়াছে।

নন্দীপুর ইহা দেখিয়া উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল ; গোঁসাইগঞ্জের মুখটি চূণ হইয়া গেল। সকলে সাগ্রহে বিচার-ফলের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

নন্দীপুরের হারাণ মাষ্টার তখন বুক ফুলাইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রজ মাষ্টারও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বুকটি দুরু দুরু করিতে লাগিল ; কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় মুখে সে ভাবকে তিনি প্রকাশ পাইতে দিলেন না।

হারাণ মাষ্টার তখন বলিলেন, "আচ্ছা, বল দেখি, এর মানে কি—

Horns of a dilemma"

সৌভাগ্যক্রমে ব্রজ মাষ্টার এই কূটপ্রশ্নের অর্থ অবগত ছিলেন। তিনি বুক ফুলাইয়া সহাস্য-বদনে বলিলেন, "এর মানে—

উভয়-সঙ্কট

—কেমন কি না ?"

"পেরেছে—পেরেছে—আমাদের মাষ্টার পেরেছে"—বলিয়া গোঁসাইগঞ্জ তুমুল কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিল। দলপতিগণ অনেক কষ্টে তাহাদের থামাইলেন। এখন ব্রজ মাষ্টারের প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পালা আসিল।

ব্রজ মাষ্টার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—

"শোন হারাণবাবু, আমি তোমায় কোন কঠিন প্রশ্ন করতে চাইনে, বরং খুব সহজ দেখেই একটা জিজ্ঞাসা করব। এ অঞ্চলে, মনে কর, তুমি আর আমি এই দু'জন যা ইংরেজি-নবীশ আছি। একটা শক্ত কথার মানে জিজ্ঞাসা ক'রে তোমায় ঠকিয়ে দেবো, সেটা আমার মনঃপূত নয়। এতে হয়ত গোঁসাইগঞ্জ রাগ করতে পারেন কিন্তু আমি নিজে একজন ইংরেজি-নবীশ হয়ে, আর একজন ইংরেজি-নবীশের প্রকাশ্য সভায় অপমান ত করতে পারিনে! আচ্ছা, খুব সহজ একটা কথার মানে জিজ্ঞাসা করি—বেশ হেঁকে উত্তর দাও, যাতে দুই গ্রামের সকলে শুনতে পায়। আচ্ছা, এর মানে কি বল দেখি—তুমি জান নিশ্চয়ই—আচ্ছা, এর মানে বল—

I don't know."

হারাণ মাষ্টার উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—

"আমি জানি না।"

শ্রবণমাত্র নন্দীপুরের সকলের মুখ একেবারে পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। সেই মুহূর্ত্তে গোঁসাইগঞ্জের দল এক সঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বিপুল বেগে নৃত্য ও চীৎকার করিতে লাগিল—"হো হো, জানে না—নন্দীপুর জানে না—হেরে গেল, দুও দুও।"

হারাণ মাষ্টার মহা বিপন্নভাবে সকলকে কি বলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে গোঁসাইগঞ্জের ঢাক-ঢোল কাড়া-নাগারা ও রামশিঙ্গা সমবেত ভাবে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। তাঁহার কথা আর কাহারও শ্রুতিগোচর হইবার সম্ভাবনা রহিল না।

গোঁসাইগঞ্জ-নিবাসী কয়েকজন বলশালী লোক আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া আসিল এবং তন্মধ্যে একজন ব্রজ মাষ্টারকে স্কন্ধের উপর তুলিয়া লইয়া গ্রামাভিমুখে চলিল। সকলে তাহাকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতে করিতে বাদ্য-ভাণ্ডের সহিত গ্রামে ফিরিয়া আসিল।

পরদিন শুনা গেল, হারাণ মাষ্টার নন্দীপুর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তথায় স্কুলটি বন্ধ হইয়া গেল। গোঁসাইগঞ্জে ব্রজ মাষ্টার অপ্রতিহত-প্রভাবে মাষ্টারি এবং অপত্য-নির্ব্বিশেষে গ্রামস্থ সকলের ক্ষীর ননী ছানা ভোজন করিতে লাগিলেন।

—প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়

কাবুলিওয়ালা

আমার পাঁচ বছর বয়সের ছোটো মেয়ে মিনি এক দণ্ড কথা না কহিয়া থাকিতে পারে না। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভাষা শিক্ষা করিতে সে কেবল একটি বৎসর কাল ব্যয় করিয়াছিল, তাহার পর হইতে যতক্ষণ সে জাগিয়া থাকে এক মুহূর্ত্ত মৌনভাবে নষ্ট করে না।

তাহার মা অনেক সময় ধমক দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু আমি তাহা পারি না। মিনি চুপ করিয়া থাকিলে এমনি অস্বাভাবিক দেখিতে হয় যে, সে আমার বেশীক্ষণ সহ্য হয় না। এইজন্য আমার সঙ্গে তাহার কথোপকথনটা কিছু উৎসাহের সহিত চলে।

সকাল বেলায় আমার নভেলের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে হাত দিয়াছি, এমন সময় মিনি আসিয়াই আরম্ভ করিয়া দিল, "বাবা, রামদয়াল দরোয়ান কাককে কৌয়া ব'ল্‌ছিল, সে কিচ্ছু জানে না। না?

আমি পৃথিবীতে ভাষার বিভিন্নতা সম্বন্ধে তাহাকে জ্ঞানদান করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই, সে দ্বিতীয় প্রসঙ্গে উপনীত হইল। "দেখো বাবা, ভোলা ব'ল্‌ছিল, আকাশে হাতী শুঁড় দিয়ে জল ফেলে, তাই বৃষ্টি হয়। মাগো, ভোলা এত মিছিমিছি বক্‌তে পারে? কেবলি বকে, দিন-রাত বকে।"

এ সম্বন্ধে আমার মতামতের জন্য কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "বাবা, মা তোমার কে হয়?"

আমি কহিলাম, "মিনি তুই ভোলার সঙ্গে খেলা ক'র্‌গে যা। আমার এখন কাজ আছে।"

সে তখন আমার লিখিবার টেবিলের পার্শ্বে আমার পায়ের কাছে বসিয়া নিজের দুই হাঁটু এবং হাত লইয়া অতি দ্রুত উচ্চারণে আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম খেলতে আরম্ভ করিয়া দিল।

আমার ঘর পথের ধারে। হঠাৎ মিনি আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম খেলা রাখিয়া জানালার ধারে ছুটিয়া গেল এবং চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা!"

ময়লা-ঢিলা-কাপড়-পরা, পাগ্‌ড়ি-মাথায় ঝুলি-ঘাড়ে হাতে গোটা দুইচার আঙ্গুরের বাক্স, এক লম্বা কাবুলিওয়ালা মৃদু-মন্দ গমনে পথ দিয়া যাইতেছিল, তাহাকে

দেখিয়া আমার কন্যারত্নের কিরূপ ভাবোদয় হইল, বলা শক্ত, তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিল। আমি ভাবিলাম, এখনি ঝুলি-ঘাড়ে একটা আপদ্ আসিয়া উপস্থিত হইবে, আমার সপ্তদশ পরিচ্ছেদ আর শেষ হইবে না।

কিন্তু মিনির চীৎকারে যেমনি কাবুলিওয়ালা হাসিয়া মুখ ফিরাইল এবং আমাদের বাড়ীর দিকে আসিতে লাগিল, অমনি সে ঊর্দ্ধশ্বাসে অন্তঃপুরে দৌড় দিল ; তাহার আর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার মনের মধ্যে একটা অন্ধ বিশ্বাসের মতো ছিল যে, ঐ ঝুলিটার ভিতরে সন্ধান করিলে তাহার মতো দুটো চারটে জীবিত মানব-সন্তান পাওয়া যাইতে পারে।

এদিকে কাবুলিওয়ালা আসিয়া সহাস্যে আমাকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল— আমি ভাবিলাম, লোকটাকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া তাহার কাছ হইতে কিছু না কেনাটা ভালো হয় না।

কিছু কেনা গেল। তাহার পর পাঁচটা কথা আসিয়া পড়িল। অবশেষে উঠিয়া যাইবার সময় সে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, তোমার লড়্কী কোথায় গেল ?"

আমি মিনির অমূলক ভয় ভাঙাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া আনিলাম—সে আমার গা ঘেঁসিয়া কাবুলির মুখ এবং ঝুলির দিকে সন্দিগ্ধ-দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাবুলি ঝুলির মধ্য হইতে কিস্‌মিস্ খোবানি বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল, সে কিছুতেই লইল না, দ্বিগুণ সন্দেহের সহিত আমার হাঁটুর কাছে সংলগ্ন হইয়া রহিল। প্রথম পরিচয়টা এমনি ভাবে গেল।

কিছুদিন পরে একদিন সকাল বেলায় আবশ্যক-বশতঃ বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় দেখি, আমার দুহিতাটি দ্বারের সমীপস্থ বেঞ্চির উপর বসিয়া অনর্গল কথা কহিয়া যাইতেছে, কাবুলিওয়ালা তাহার পদতলে বসিয়া সহাস্যমুখে শুনিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে নিজের মতামতও দো-আঁস্‌লা বাংলায় ব্যক্ত করিতেছে। মিনির পঞ্চমবর্ষীয় জীবনের অভিজ্ঞতায় বাবা ছাড়া এমন ধৈর্য্যবান্ শ্রোতা সে কখনও পায় নাই। আবার দেখি, তাহার ক্ষুদ্র অঁাচল বাদাম-কিস্‌মিসে পরিপূর্ণ। আমি কাবুলিওয়ালাকে কহিলাম, "উহাকে এ সব কেন দিয়াছ ? অমন আর দিও না।" বলিয়া পকেট হইতে একটা আধুলি লইয়া তাহাকে দিলাম। সে অসঙ্কোচে আধুলি গ্রহণ করিয়া ঝুলিতে পুরিল।

বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, সেই আধুলিটি লইয়া ষোল-আনা গোলযোগ বাধিয়া গিয়াছে।

প্রতি বৎসর মাঘ মাসের মাঝামাঝি রহমৎ দেশে চলিয়া যায়। এই সময়টা সমস্ত পাওনার টাকা আদায় করিবার জন্য সে বড় ব্যস্ত থাকে। বাড়ী বাড়ী ফিরিতে হয় কিন্তু তবু একবার মিনিকে দর্শন দিয়া যায়। দেখিলে বাস্তবিক মনে হয়, উভয়ের মধ্যে যেন একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে। সকালে যেদিন আসিতে পারে না, সেদিন দেখি সন্ধ্যার সময় আসিয়াছে; অন্ধকার ঘরের কোণে সেই ঢিলেঢালা-জামা-পায়জামা-পরা সেই ঝোলাঝুলিওয়ালা লম্বা লোকটাকে দেখিলে বাস্তবিক হঠাৎ মনের ভিতরে একটা আশঙ্কা উপস্থিত হয়।

কিন্তু যখন দেখি, মিনি "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা" করিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসে এবং দুই অ-সমবয়সী বন্ধুর মধ্যে পুরাতন সরল পরিহাস চলিতে থাকে, তখন সমস্ত হৃদয় প্রসন্ন হইয়া উঠে।

একদিন সকালে আমার ছোট ঘরে বসিয়া প্রুফ শীট সংশোধন করিতেছি। বিদায় লইবার পূর্ব্বে আজ দুই তিন দিন হইতে শীতটা খুব কন্‌কনে হইয়া উঠিয়াছে, চারিদিকে একেবারে হীহীকার পড়িয়া গেছে। জানালা ভেদ করিয়া সকালের রৌদ্রটি টেবিলের নীচে আমার পায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, সেই উত্তাপটুকু বেশ মধুর বোধ হইতেছে। বেলা বোধ করি আটটা হইবে—মাথায় গলাবন্ধ জড়ানো, উষাচরগণ প্রাতঃভ্রমণ সমাধা করিয়া প্রায় ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। এমন সময়, রাস্তায় ভারি একটা গোল শুনা গেল।

চাহিয়া দেখি, আমাদের রহমৎকে দুই পাহারাওয়ালা বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছে—তাহার পশ্চাতে কৌতূহলী ছেলের দল চলিয়াছে। রহমতের গাত্রবস্ত্রে রক্তচিহ্ন এবং একজন পাহারাওয়ালার হাতে রক্তাক্ত ছোরা। আমি দ্বারের বাহিরে গিয়া পাহারাওয়ালাকে দাঁড় করাইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপারটা কী?"

কিয়দংশ তাহার কাছে কিয়দংশ রহমতের কাছে শুনিয়া জানিলাম যে, আমাদের প্রতিবেশী একজন লোক রামপুরী চাদরের জন্য রহমতের কাছে কিঞ্চিৎ ধারিত—মিথ্যা-পূর্ব্বক সেই দেনা সে অস্বীকার করে এবং তাহাই লইয়া বচসা করিতে করিতে রহমৎ তাহাকে এক ছুরি বসাইয়া দিয়াছে।

রহমৎ সেই মিথ্যাবাদীর উদ্দেশ্যে নানারূপ অশ্রাব্য গালি দিতেছে, এমন সময়ে "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা" করিয়া ডাকিতে ডাকিতে মিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রহমতের মুখ মুহূর্ত্তের মধ্যে কৌতুক-হাস্যে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার স্কন্ধে আর ঝুলি ছিল না সুতরাং ঝুলি-সম্বন্ধে তাহাদের অভ্যস্ত আলোচনা

হইতে পারিল না। মিনি একেবারেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি শ্বশুর-বাড়ি যাবে?"

রহমৎ হাসিয়া কহিল, "সেখানেই যাচ্চে!"

দেখিল উত্তরটা মিনির হাস্যজনক হইল না, তখন হাত দেখাইয়া বলিল—"সশুরাকে মারিতাম কিন্তু কী করিব হাত বাঁধা!"



আমাদের রহমৎকে দুই পাহারাওয়ালা বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছে—২১৭ পৃষ্ঠা

সাংঘাতিক আঘাত করা অপরাধে কয়েক বৎসর রহমতের কারাদণ্ড হইল।

তাহার কথা একপ্রকার ভুলিয়া গেলাম। আমরা যখন ঘরে বসিয়া চিরাভ্যস্ত মত নিত্য কাজের মধ্যে দিনের পর দিন কাটাইতাম, তখন একজন স্বাধীন পর্ব্বতচারী পুরুষ কারা-প্রাচীরের মধ্যে যে কেমন করিয়া বর্ষযাপন করিতেছে, তাহা আমাদের মনেও উদয় হইত না।

আর, চঞ্চল-হৃদয়া মিনির আচরণ যে অত্যন্ত লজ্জাজনক, তাহা তাহার বাপকেও স্বীকার করিতে হয়। সে স্বচ্ছন্দে তাহার পুরাতন বন্ধুকে বিস্মৃত হইয়া প্রথমে নবী সহিসের সহিত সখ্য-স্থাপন করিল। পরে ক্রমে যত তাহার বয়স বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, ততই সখার পরিবর্তে একটি একটি করিয়া সখী জুটিতে লাগিল ; এমন কি এখন তাহার বাবার লিখিবার ঘরেও তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি তো তাহার সহিত এক প্রকার আড়ি করিয়াছি !

কত বৎসর কাটিয়া গেল। আর একটি শরৎকাল আসিয়াছে। আমার মিনির বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। পূজার ছুটির মধ্যেই তাহার বিবাহ হইবে। কৈলাস-বাসিনীর সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘরের আনন্দময়ী পিতৃভবন অন্ধকার করিয়া পতিগৃহে যাত্রা করিবে।

প্রভাতটি অতি সুন্দর হইয়া উদয় হইয়াছে। বর্ষার পরে এই শরতের নূতন-ধৌত রৌদ্রে যেন সোহাগায়-গলানো নির্ম্মল সোনার মতো রং ধরিয়াছে। এমন কি, কলিকাতার গলির ভিতরকার ইষ্টকজর্জ্জর অপরিচ্ছন্ন ঘেঁষাঘেঁষি বাড়িগুলার উপরেও এই রৌদ্রের আভা একটি অপরূপ লাবণ্য বিস্তার করিয়াছে।

আমার ঘরে আজ রাত্রিশেষ হইতে না হইতেই সানাই বাজিতেছে। সে বাঁশি যেন আমার বুকের পঞ্জরের হাড়ের মধ্য হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাজিয়া উঠিতেছে। করুণ ভৈরবী রাগিণীতে আমার আসন্ন বিচ্ছেদ-ব্যথাকে শরতের রৌদ্রের সহিত সমস্ত বিশ্বজগৎময় ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে। আজ তাহার বিবাহ।

সকাল হইতে ভারি গোলমাল, লোকজনের আনাগোনা। উঠানে বাঁশ বাঁধিয়া পাল খাটান হইতেছে ; বাড়ির ঘরে ঘরে এবং বারান্দায় ঝাড় টাঙাইবার ঠুংঠাং শব্দ উঠিতেছে, হাঁকডাকের সীমা নাই।

আমি আমার লিখিবার ঘরে বসিয়া হিসাব দেখিতেছি, এমন সময় রহমৎ আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

আমি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। তাহার সে ঝুলি নাই, তাহার সে লম্বা চুল নাই, তাহার শরীরে পূর্ব্বের মতো সে তেজ নাই। অবশেষে তাহার হাসি দেখিয়া তাহাকে চিনিলাম।

কহিলাম, "কিরে রহমৎ, কবে আসিলি ?"

সে কহিল, "কাল সন্ধ্যাবেলা জেল হইতে খালাস পাইয়াছি।"

কথাটা শুনিয়া কেমন কানে খট্‌ করিয়া উঠিল। কোন খুনীকে কখন প্রত্যক্ষ দেখি নাই, ইহাকে দেখিয়া সমস্ত অন্তঃকরণ যেন সঙ্কুচিত হইয়া গেল। আমার ইচ্ছা

করিতে লাগিল, আজিকার এই শুভদিনে এ লোকটা এখান হইতে গেলেই ভাল হয়।

আমি তাহাকে কহিলাম, "আজ আমাদের বাড়ীতে একটা কাজ আছে, আমি কিছু ব্যস্ত আছি, তুমি আজ যাও।—"

কথাটা শুনিয়াই সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, অবশেষে দরজার কাছে গিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "খোঁখীকে একবার দেখিতে পাইব না?"

তাহার মনে বুঝি বিশ্বাস ছিল, মিনি সেই ভাবেই আছে। সে যেন মনে করিয়াছিল, মিনি আবার সেই পূর্ব্বের মতো "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা" করিয়া ছুটিয়া আসিবে, তাহাদের সেই অত্যন্ত কৌতুকাবহ পুরাতন হাস্যালাপের কোনরূপ ব্যত্যয় হইবে না। এমন কি পূর্ব্ববন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া সে এক বাক্স আঙ্গুর এবং কাগজের মোড়কে কিঞ্চিৎ কিস্‌মিস্‌ বাদাম, বোধ করি, কোন স্বদেশীয় বন্ধুর নিকট হইতে চাহিয়া চিন্তিয়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল—তাহার সে নিজের ঝুলিটি আর ছিল না।

আমি কহিলাম—"আজ বাড়ীতে কাজ আছে, আজ আর কাহারো সহিত দেখা হইতে পারিবে না।"

সে যেন কিছু ক্ষুণ্ণ হইল। স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া একবার স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, তার পরে—"বাবু সেলাম" বলিয়া দ্বারের বাহির হইয়া গেল।

আমার মনে কেমন একটু ব্যথা বোধ হইল। মনে করিতেছি তাহাকে ফিরিয়া ডাকিব, এমন সময়ে দেখি সে আপনি ফিরিয়া আসিতেছে।

কাছে আসিয়া কহিল, "এই আঙ্গুর এবং কিস্‌মিস্‌ বাদাম খোঁখীর জন্য আনিয়াছিলাম, তাহাকে দিবেন।"

আমি সেগুলি লইয়া দাম দিতে উদ্যত হইলে সে হঠাৎ আমার হাত চাপিয়া ধরিল,—কহিল—"আপনার বহুত দয়া আমার চিরকাল স্মরণ থাকিবে—আমাকে পয়সা দিবেন না!"

"বাবু, তোমার যেমন একটি লড়্‌কী আছে, তেমনি দেশে আমারও একটি লড়্‌কী আছে। আমি তাহার মুখখানি স্মরণ করিয়া তোমার খোঁখীর জন্য কিছু কিছু মেওয়া হাতে লইয়া আসি, আমি তো সওদা করিতে আসি না।—"

এই বলিয়া সে আপনার মস্ত ঢিলা জামাটার ভিতর হাত চালাইয়া দিয়া বুকের কাছে কোথা হইতে এক টুকরা ময়লা কাগজ বাহির করিল। বহু যত্নে ভাঁজ খুলিয়া দুই হস্তে আমার টেবিলের উপর মেলিয়া ধরিল।

দেখিলাম কাগজের উপর একটি ছোট হাতের ছাপ। ফটোগ্রাফ নহে, তেলের ছবি নহে, হাতে খানিকটা ভুসা মাখাইয়া কাগজের উপরে তাহারই চিহ্ন ধরিয়া লইয়াছে। কন্যার এই স্মরণ-চিহ্নটুকু বুকের কাছে লইয়া রহমৎ প্রতি বৎসর কলিকাতার রাস্তায় মেওয়া বেচিতে আসে—যেন সেই সুকোমল ক্ষুদ্র শিশুহস্তটুকুর স্পর্শখানি তাহার বিরাট বিরহী বক্ষের মধ্যে সুধাসঞ্চার করিয়া রাখে।

দেখিয়া আমার চোখ ছল্ ছল্ করিয়া আসিল। তখন, সে যে একজন কাবুলি মেওয়াওয়ালা, আর আমি যে একজন বাঙালী সম্ভ্রান্তবংশীয়, তাহা ভুলিয়া গেলাম—তখন বুঝিতে পারিলাম, সেও যে আমিও সে, সেও পিতা আমিও পিতা। তাহার পর্ব্বতগৃহবাসিনী ক্ষুদ্র পার্ব্বতীর সেই হস্তচিহ্ন আমারই মিনিকে স্মরণ করাইয়া দিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। অন্তঃপুরে ইহাতে অনেক আপত্তি উঠিয়াছিল। কিন্তু আমি কিছুতেই কর্ণপাত করিলাম না। রাঙা চেলি-পরা কপালে চন্দন আঁকা বধূবেশিনী মিনি সলজ্জভাবে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহাকে দেখিয়া কাবুলিওয়ালা প্রথম থতমত খাইয়া গেল, তাহাদের পুরাতন আলাপ জমাইতে পারিল না। অবশেষে হাসিয়া কহিল—"খোঁখী, তোমি সশুর-বাড়ি যাবিস্ ?"

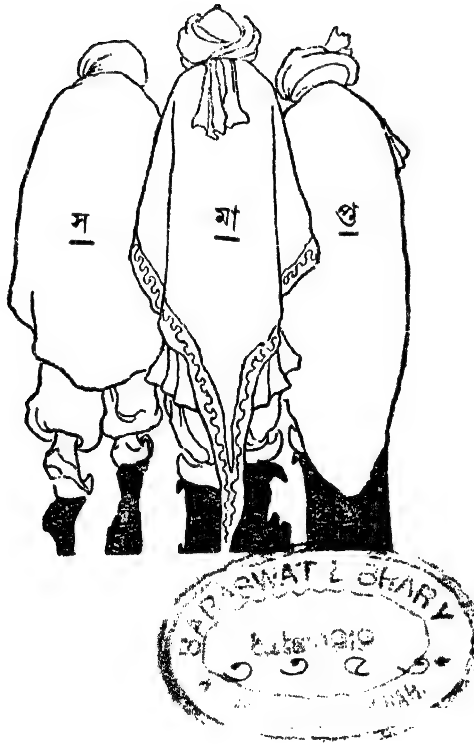
মিনি এখন শ্বশুর-অর্থ বোঝে, এখন আর পূর্ব্বের মতো উত্তর দিতে পারিল না—রহমতের প্রশ্ন শুনিয়া লজ্জায় আরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। কাবুলি-ওয়ালার সহিত মিনির যেদিন প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমার সেই দিনের কথা মনে পড়িল। মনটা কেমন ব্যথিত হইয়া উঠিল।

মিনি চলিয়া গেলে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রহমৎ মাটিতে বসিয়া পড়িল। সে হঠাৎ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, তাহার মেয়েটিও ইতিমধ্যে এইরূপ বড়ো হইয়াছে, তাহার সঙ্গেও আবার নূতন আলাপ করিতে হইবে—তাহাকে ঠিক পূর্ব্বের মতো তেমনটি আর পাইবে না। এ আট বৎসরে তাহার কী হইয়াছে, তাই বা কে জানে! সকাল বেলায় শরতের স্নিগ্ধ রৌদ্র-কিরণের মধ্যে সানাই বাজিতে লাগিল, রহমৎ কলিকাতার এক গলির ভিতরে বসিয়া আফগানিস্থানের এক মরুপর্ব্বতের দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

আমি একখানি নোট লইয়া তাহাকে দিলাম। বলিলাম, "রহমৎ, তুমি দেশে তোমার মেয়ের কাছে ফিরিয়া যাও; তোমাদের মিলন-সুখে আমার মিনির কল্যাণ হোক্।"

এই টাকাটা দান করিয়া, হিসাব হইতে উৎসব-সমারোহের তুটো একটা অঙ্গ ছাঁটিয়া দিতে হইল। যেমন মনে করিয়াছিলাম, তেমন করিয়া ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বালাইতে পারিলাম না, গড়ের বাদ্যও বাদ পড়িল, অন্তঃপুরে মেয়েরা অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মঙ্গল-আলোকে আমার শুভ-উৎসব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



মিনির মা একটা শ্বেত চক্‌চকে গোলাকার পদার্থ লইয়া ভর্ৎসনার স্বরে মিনিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুই এ আধুলি কোথায় পেলি ?"

মিনি বলিতেছে, "কাবুলিওয়ালা দিয়েচে।"

তাহার মা বলিতেছেন, "কাবুলিওয়ালার কাছ হইতে আধুলি তুই কেন নিতে গেলি ?"

মিনি ক্রন্দনের উপক্রম করিয়া কহিল, "আমি চাই নি, সে আপনি দিল।"

আমি মিনিকে তাহার আসন্ন বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়া বাহিরে লইয়া গেলাম।

সংবাদ পাইলাম, কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির এই যে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ তাহা নহে, ইতিমধ্যে সে প্রায় প্রত্যহ আসিয়া পেস্তা বাদাম ঘুস দিয়া মিনির ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু অনেকটা অধিকার করিয়া লইয়াছে।

দেখিলাম, এই দুটি বন্ধুর মধ্যে গুটিকতক বাঁধা কথা এবং ঠাট্টা প্রচলিত আছে—যথা, রহমৎকে দেখিবামাত্র আমার কন্যা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিত, "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা, তোমার ও ঝুলির ভিতরে কী ?"

রহমৎ একটা অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর করিত, "হাঁতি।"

অর্থাৎ, ঝুলির ভিতর যে একটা হস্তী আছে, এইটেই তাহার পরিহাসের সূক্ষ্ম মর্ম্ম।—খুব যে বেশী সূক্ষ্ম, তাহা বলা যায় না, তথাপি এই পরিহাসে উভয়েই বেশ একটু কৌতুক অনুভব করিত—এবং শরৎকালের প্রভাতে একটি বয়স্ক এবং একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর সরল হাস্য দেখিয়া আমারও বেশ লাগিত।

উঁহাদের মধ্যে আরো একটা কথা প্রচলিত ছিল। রহমৎ মিনিকে বলিত, "খোখী, তোমি সশুর-বাড়ি কখুনু যাবে না!"

বাঙালীর ঘরের মেয়ে আজন্মকাল 'শ্বশুর-বাড়ী' শব্দটার সহিত পরিচিত, কিন্তু আমরা কিছু একেলে ধরণের লোক হওয়াতে শিশু মেয়েকে শ্বশুর-বাড়ী সম্বন্ধে সজ্ঞান করিয়া তোলা হয় নাই। এই জন্য রহমতের অনুরোধটা সে পরিষ্কার বুঝিতে পারিত না, অথচ কথাটার একটা কোনো জবাব না দিয়া চুপ করিয়া থাকা নিতান্ত তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ। সে উল্টিয়া জিজ্ঞাসা করিত, "তুমি শ্বশুর-বাড়ি যাবে ?"

রহমৎ কাল্পনিক শ্বশুরের প্রতি প্রকাণ্ড মোটা মুষ্টি আস্ফালন করিয়া বলিত, "হামি সশুরকে মার্‌বে!"

শুনিয়া মিনি শ্বশুর নামক কোনো এক অপরিচিত জীবের দুরবস্থা কল্পনা করিয়া অত্যন্ত হাসিত।

এখন শুভ্র শরৎকাল। প্রাচীনকালে এই সময়েই রাজারা দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন। আমি কলিকাতা ছাড়িয়া কখনো কোথাও যাই নাই, কিন্তু সেই জন্যই আমার মনটা পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়ায়। আমি যেন আমার ঘরের কোণে চিরপ্রবাসী, বাহিরের পৃথিবীর জন্য আমার সর্ব্বদা মন কেমন করে। একটা বিদেশের নাম শুনিলেই অমনি আমার চিত্ত ছুটিয়া যায়, তেমন বিদেশী লোক দেখিলেই অমনি নদী পর্ব্বত অরণ্যের মধ্যে একটা কুটীরের দৃশ্য মনে হয় এবং একটা উল্লাসপূর্ণ জীবনযাত্রার কথা কল্পনায় জাগিয়া উঠে।

এদিকে আবার আমি এমনি উদ্ভিজ্জ-প্রকৃতি যে, আমার কোণটুকু ছাড়িয়া একবার বাহির হইতে গেলে মাথায় বজ্রাঘাত হয়। এই জন্য সকালবেলায় আমার ছোট ঘরে টেবিলের সাম্‌নে বসিয়া এই কাবুলির সঙ্গে গল্প করিয়া আমার অনেকটা ভ্রমণের কাজ হইত। দুইধারে বন্ধুর দুর্গম দগ্ধ রক্তবর্ণ উচ্চ গিরিশ্রেণী, মধ্যে সঙ্কীর্ণ মরুপথ, বোঝাইকরা উষ্ট্রের শ্রেণী চলিয়াছে; পাগ্‌ড়ী-পরা বণিক্ ও পথিকেরা কেহ বা উটের 'পরে, কেহ বা পদব্রজে, কাহারো হাতে বর্শা, কাহারো হাতে সেকেলে চক্‌মকি-ঠোকা বন্দুক; কাবুলি মেঘমন্দ্র-স্বরে ভাঙ্গা বাংলায় স্বদেশের গল্প করিত, আর এই ছবি আমার চোখের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইত।

মিনির মা অত্যন্ত শঙ্কিত স্বভাবের লোক। রাস্তায় একটা শব্দ শুনিলেই তাঁহার মনে হয়, পৃথিবীর সমস্ত মাতাল আমাদের বাড়ীটাই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। এই পৃথিবীটা যে সর্ব্বত্রই চোর-ডাকাত মাতাল সাপ বাঘ ম্যালেরিয়া ও শুঁয়াপোকা আরসোলা এবং গোরার দ্বারা পরিপূর্ণ, এতদিন (খুব বেশী দিন নহে) পৃথিবীতে বাস করিয়াও সে বিভীষিকা তাঁহার মন হইতে দূর হইয়া যায় নাই।

রহমৎ কাবুলিওয়ালা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলেন না। তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য তিনি আমাকে বারবার অনুরোধ করিয়াছেন। আমি তাঁহার সন্দেহ হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলে তিনি পর্য্যায়ক্রমে আমাকে গুটিকতক প্রশ্ন করিলেন—"কখনো কি কাহারো ছেলে চুরি যায় না? কাবুলদেশে কি দাস-ব্যবসায় প্রচলিত নাই? একজন প্রকাণ্ড কাবুলির পক্ষে একটি ছোট ছেলে চুরি করিয়া লইয়া যাওয়া কি একেবারেই অসম্ভব?"

আমাকে মানিতে হইল ব্যাপারটা যে অসম্ভব তাহা নহে, কিন্তু অবিশ্বাস্য। বিশ্বাস করিবার শক্তি সকলের সমান নহে, এই জন্য আমার স্ত্রীর মনে ভয় রহিয়া গেল কিন্তু তাই বলিয়া বিনা দোষে রহমৎকে আমাদের বাড়ীতে আসিতে নিষেধ করিতে পারিলাম না।